মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

ইসলামী শরীয়াতের উৎস

ইসলামী শরীয়াতের উৎস

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১৩-০৩৪২৩০

www.amarboi.org

ইসলামী শরীয়াতের উৎস

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪

৩য় প্রকাশ
অক্টোবরঃ ২০০৬
রমযান ঃ ১৪২৭
কার্তিক ঃ ১৪১৩

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা রশীদুল হাসান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
অফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-41-12

মূল্য ঃ ৮৫.০০ টাকা

www.amarboi.org

পূর্ব কথা

ইসলামী শরীয়াত মুসলিম জীবন-সাধনার এক অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন-পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার নিষ্পত্তি করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত। বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়াত ইসলাম-বহির্ভূত কোন ভিন্নতর শাস্ত্র নয়; বরং এটি ইসলাম-বিশ্বাসেরই এক যৌক্তিক পরিণতি। ইসলামী শরীয়াত ছাড়া কারো পক্ষে ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলামী শরীয়াতকে বলা হয় মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্র। আমরা একে অনায়াসে ইসলামী কর্ম-বিধান রূপেও আখ্যায়িত করতে পারি।

কিন্তু শরীয়াত রূপী এই কর্ম-বিধান বা ব্যবহারশাস্ত্রটি কিভাবে গড়ে উঠেছে? মুসলিম জীবন-সাধনায় এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন ও তর্ক রয়েছে। এমন কি, কেউ কেউ ইসলামী শরীয়াতের যাথার্থ্য সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করছে। এই সব প্রশ্ন, তর্ক ও সন্দেহের মূলে রয়েছে ইসলামী শরীয়াতের গঠন-প্রকৃতি ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতা। মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস' নামক গ্রন্থে এই অজ্ঞতা দূরীভূত করে এতৎ সংক্রান্ত তাবৎ প্রশ্ন, তর্ক ও সন্দেহ নিরসণের চেষ্টা করেছেন সর্ব প্রযত্নে।

এই মূল্যবান গ্রন্থে ইসলামী শরীয়াতের সংজ্ঞা এবং তার দুই প্রধান উৎস—কুরআন ও হাদীসের মৌল বিষয়-বস্তু এবং তার বিন্যাস ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এছাড়া শরীয়াতের অন্য দুই উৎস ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য উপহার দিয়েছেন। সর্বোপরি, ফিকাহর ইমামদের চিন্তা-পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি, পটভূমি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান-গর্ভ বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এদিক থেকে গ্রন্থটিকে ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গ্রন্থকারের একটি অসামান্য অবদান রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আধুনিক ইসলামী সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অন্ততঃ সমকালীন ভাষায় এ ধরনের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ কোন মুল্যবান গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। এটি গ্রন্থকারের মৌল গবেষণা কর্মেরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে পাঠকদের কাছে বিশ্বস্ত, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্যে তাঁর আসাধারণ পরিশ্রমের ছাপ এর পাতায় পাতায় স্পষ্ট।

www.amarboi.org

ইসলামী ধর্মতত্ত্বের উচ্চতর শিক্ষার্থীদের জন্যে গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। এ ছাড়া ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ কৌতূহলী পাঠকদের জন্যেও গ্রন্থটি খুব উপাদেয়। মোটকথা, ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে সাধারণ বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্যে গ্রন্থটি খুবই কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি আশির দশকের গোড়ার দিকে রচিত হলেও নানা কারণে এদ্দিন তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আজকে গ্রন্থটিকে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমরা গ্রন্থটির অঙ্গ-সজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্য উন্নত করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যয় ও কাগজের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থের মূল্য আমরা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রেখেছি।

মহান আল্লাহ গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ঢাকাঃ জুলাই, ১৯৯৪ চেয়ারম্যান,

মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

www.amarboi.org

সূচী

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী শরীয়াতের উৎস

শরীয়াতের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'শরীয়াত' শব্দটি আভিধানিক অর্থে সেই পানি বোঝায়, যেখানে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং একত্রিত হয়ে তা পান করে। তার ব্যবহারিক অর্থঃ

اَلطَّرِيْقَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الَّتِيْ يُفِيْدُ مِنْهَا الْمُتَمَسِّكُوْنَ بِهَا هِدَايَةً وَتَوْفِيْقًا.

এক সুদৃঢ় ঋজুপথ, যদ্দ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হেদায়েত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।' এদু'টি জিনিসই মানুষের পিপাসা নিবৃত্ত করে বলে এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য স্পষ্ট।

ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে 'শরীয়াত' বলতে বুঝায় সে সব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারী করেছেন। জারী করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে তদনুযায়ী আমল করবে এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করবে। এই আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে কতকগুলো কাজ পর্যায়ের, হতে পারে আকীদা-বিশ্বাস পর্যায়ের এবং চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের। এ আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ সমন্বিত বিধান অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠু ভিত্তিক। হৃদয়-মন, জীবন ও বিবেক-বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এ-ই হচ্ছে একমাত্র পথ।

শরীয়াত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলঃ

اِخْرَاجُ النَّاسِ مِنْ دَوَاعِي الْهَوٰى وَالشَّهَوَاتِ اِلٰى دَائِرَةِ الْاَنْصَافِ وَالْحَقِّ حَتّٰى تَتَحَقَّقَ خِلَافَةُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيْحِ.

বিশ্ব-মানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে।' কেননা এ বিধান অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও

www.amarboi.org

ঋজু। তাতে বক্রতা বলতে কিছু নেই; তা অবলম্বন করে চললে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকেনা। স্বাধীন, সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের এটাই একমাত্র পথ।

আল্লাহ্ তা'আলা এই শরীয়াতসহ তাঁর নবী ও রসূলগণকে দুনিয়ার মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন। যদিও শরীয়াতের বিধান গ্রহণ ও অনুসরণে আল্লাহ্র দিক থেকে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই, তা সত্ত্বেও তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে বহু মানুষ হেদায়াত লাভ করেছে। আবার অনেকে তা অগ্রাহ্য করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। গ্রহণ ও বর্জনের এ স্বাধীনতা থাকলেও উভয়ের পরিণতি অভিন্ন নয়। যারা তা গ্রহণ ও অনুসরণ করবে, তারা পরকালীন মুক্তি ও সওয়াবের অধিকারী হবে; আল্লাহ্র ক্রোধ-অসন্তোষ ও আযাব থেকে রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে যারা তা অগ্রাহ্য ও অমান্য করবে, তারা নিজেদেরকে দুনিয়ায় তার কুফল প্রত্যক্ষ করতে ও মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য করবে এবং পরকালেও নিজদেরকে আল্লাহ্র ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বানিয়ে ছাড়বে। উভয় দিক দিয়ে বর্ণিত পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। তার ব্যতিক্রম হতে পারে না কখনও।

খোদায়ী শরীয়াতের অপরিহার্যতা

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে-করতে বাধ্য। এজন্য তাদের এমন একটি বিধানের অবশ্য প্রয়োজন, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দেবে। প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন দুষ্কর হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর, আত্মপূজারী। নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড় করে দেখা প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। তা যদি বাঁধা-বন্ধনমুক্ত থাকে, আইনের ধারাবলে সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পারস্পরিক জুলুম-নির্যাতন-নিষ্পেষণ, অধিকার হরণ এবং সামাজিক বিপর্যয় হবে অনিবার্য পরিণতি। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। প্রতাপশালী ও ষড়যন্ত্রকারীরাই সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে মানব প্রকৃতি এমন একটা ব্যবস্থা ও বিধান লাভের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেছে চিরকাল, যা সমাজ ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্থান ও অধিকার চিহ্নিত ও নিশ্চয়তাপূর্ণ করবে, প্রত্যেকের জন্য কর্মসীমা নির্দিষ্ট করে দেবে ও অধিকার আদায়ের নিয়ম বেঁধে দেবে, যেন কেউ কারো অধিকার হরণ করতে না পারে, কেউই তার নিজের সীমা লংঘন করে অন্যের সীমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না

www.amarboi.org

পারে। বস্তুতঃ এরূপ একটা সুষ্ঠু, সর্বাত্মক ও সর্বব্যপক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন সম্ভবপর হতে পারে না। একারণেই আল্লাহ্‌র নাজিল করা শরীয়াতের বিধান তাঁর অন্যান্য অগণিত অফুরন্ত নিয়ামতের ন্যায় বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমাত হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ভিত্তিতেই হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান, তাদের পারস্পরিক বিরোধ-বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি। উপরন্তু মানুষ যে পাঁচটি নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের মুখাপেক্ষী, তার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানও এরই ভিত্তিতে সম্ভব। সে পাঁচটি জিনিস হচ্ছেঃ দ্বীন, প্রাণ, বংশ, ধন-মাল ও বিবেক-বুদ্ধির স্বাধীনতা সংরক্ষণ। কেননা এ পাঁচটি জিনিসের ভিত্তিতেই ব্যক্তি তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া জীবন ও রিজিক-এর যথার্থ শোকর আদায় করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শরীয়াতই হচ্ছে তাঁর বান্দাহদের পরস্পরে সুবিচার ও ন্যায়পরতা স্থাপনের যথার্থ বিধান, আপন সৃষ্টির প্রতি এ তাঁর বিরাট রহমাতের দান এবং মানবতার প্রতি এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। অন্যকথায়, পৃথিবীর উপর এটা তাঁর ছায়া বিশেষ এবং সে ছায়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ব্যাপক, সর্বাত্মক ও নির্বিশেষ; পরম শান্তি ও স্বস্তির একমাত্র নিয়ামক।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণকে আপন জীবন সংগঠন ও উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বা তারই মুখাপেক্ষী বানিয়ে ছেড়ে দেন নি; বরং তা থেকে তাদেরকে অনেকটা মুক্ত করেছেন শরীয়াতের এ বিধান উপস্থাপিত করে। কেননা মানব রচিত কোন বিধানই তাদের স্বেচ্ছাচার ও লালসা-কামনার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র একমাত্র আল্লাহ্‌র শরীয়াতের এই বিধান। কেননা আল্লাহ্ নিজেই এই বিধানের রচয়িতা, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই সৃষ্টি। তিনি এ বিধান রচনা করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তা নিজেদের জীবনে পালন করে চলবে। আল্লাহ্ নিজে সব রকমের পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তাঁর বান্দাহ। এদিক দিয়ে সবাই তাঁর নিকট সমান। কেউ তাঁর আপন নয়, কেউ নয় পর। প্রত্যেকেরই অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর জানা। সমগ্র সৃষ্টি লোকের প্রকৃত অবস্থা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। কোন মানুষেরই এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকতে পারে না। কারো জ্ঞানই অতটা ব্যাপক নয়। সকলের স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা একই সময় সমানভাবে কারো গোচরীভূত থাকা সম্ভব নয়। ফলে মানুষের রচিত বিধান খামখেয়ালী স্বার্থপরতার ও

www.amarboi.org

পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হলেও তা কখনই ক্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা এবং ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ ও প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তা যদি হত তাহলে তাদের পরস্পরে এত মতভেদ কখনই হতে পারত না। তারা যে বহু লোক একত্র হলেই মতবিরোধে লিপ্ত হয় তা-ই নয়, শুধু এক ব্যক্তিও যদি বিধান রচনার জন্য দায়িত্বশীল হয়, তবু সেই ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও রুচি-প্রবণতার মাঝে বিরোধ দেখা দেবে অনিবার্যভাবে। উপরন্তু মানুষ সব দিক চিন্তা-বিবেচনা করে আজ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পরবর্তী দিন তা-ই বদলে দিতে বাধ্য হয়। কেননা পরবর্তীকালে চিন্তার এমন এক নতুন দিগন্ত তার নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়-সমস্যাটি এমন রূপ পরিগ্রহ করে, যা পূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তার জীবন ও মানস লোকে কখনো বর্তমান ছিল না।

www.amarboi.org

ইসলামী শরীয়াতের সাধারণ রূপ

'শরীয়াত' শব্দের তাৎপর্য-ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখনে 'ইসলাম' শব্দের তাৎপর্য স্মর্তব্য। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'অনুগত হওয়া বা আনুগত্য স্বীকার করা'। বিনয় ও নতিস্বীকার অর্থেও শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআন মজীদে হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রচারিত দ্বীনকে 'ইসলাম' বলা হয়েছে, সে আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের কথা। তিনিই হলেন খোদায়ী শরীয়াতের সর্বশেষ বাহক। তাঁর উপর যে শরীয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিখিল মানবতার প্রতি তা-ই সর্বশেষ শরীয়াত। অতঃপর আর কোন শরীয়াত দুনিয়ায় নাজিল হবে না। দুনিয়ার মানুষের নবতর ও ভিন্নতর কোন শরীয়াতের প্রয়োজনই নেই-কোন দিন সে প্রয়োজন দেখাও দিবে না। কেননা এ শরীয়াতই সর্বকালের ও সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যেখানে যে মানুষই জন্ম নেবে, তাদের সকলের ও প্রত্যেকেরই জন্যে এই শরীয়াত, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাজিল হয়েছিল। এতে ব্যক্তি-মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে সামাজিক-সামষ্টিক মানুষের সমস্যাবলীর সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান। এর কোন ক্ষেত্রেই একবিন্দু আতিশয্য-বাড়াবাড়ি কিংবা প্রয়োজন অনুপাতে ঘাটতি অথবা অসম্পূর্ণতা পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে এতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোন মাধ্যম বা তৃতীয় সত্তা দাঁড় করানো হয়নি। এ শরীয়াত পালন করে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে বসবাস করে যে কোন বর্ণ বা ভাষার লোকেরা সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) সমস্ত বিশ্ব-মানবের জন্য সর্বশেষ রাসূল হিসাবে প্রেরিত। তিনি বিশ্ব-নবী, বিশ্ব-রাসূল। তাঁর প্রতি যে শরীয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের জন্যে (Universal)। আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদে এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত তিনটি লক্ষ্যণীয়। সূরা আল-আরাফ-এর আয়াতঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

www.amarboi.org

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ*

(الاعراف: ١٥٨)

হে নবী! তুমি ঘোষণা করে দাওঃ হে নির্বিশেষ মানব সমাজ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল-যে আল্লাহ্ সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক, সম্রাট। তিনি ছাড়া ইলাহ কেউ নেই, তিনি জীবন দেন, তিনি-ই মৃত্যু দান করেন। অতএব, তোমরা সকলে এই পরিচয়ের আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আন-সে নবী নিজেই আল্লাহ্ ও তাঁর কালামের প্রতি ঈমান রাখে-এবং তোমরা সকলে তাঁকে অনুসরণ করে চল; সম্ভবতঃ তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

সূরা সাবার আয়াতঃ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ* (السبا: ٢٨)

হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে অন্য কোন মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য দিয়ে পাঠাইনি, পাঠিয়েছি সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। কিন্তু বহু মানুষ তা জানেনা।

সূরা আল-ফুরক্বান-এর আয়াতঃ

تَبَرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا*

(الفرقان: ١)

'বরকতওয়ালা সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী হবে।

এ তিনটি আয়াতে মূলতঃ একই কথা বলা হয়েছে এবং তা হ'লঃ

হযরত মুহাম্মাদ (স) সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল ও নবী। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে হবে প্রথমে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনতে হবে তাঁরই প্রেরিত নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি। তিনি সমগ্র মানুষের জন্য সমগ্র সৃষ্টিলোকের একক ও অংশীদারবিহীন স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূল-সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। আর এই কাজের জন্যই

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন। অতএব কুরআনের প্রতিও ঈমান আনতে হবে এবং রাসূল এই কুরআনের ভিত্তিতে যে শরীয়াতের বিধান উপস্থাপন করেছেন, তা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) বিশ্ব-মানবের প্রতি রিসালাতের দায়িত্ব পেয়ে তা তৎকালীন সমস্ত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন, দ্বীন ও শরীয়াত প্রচারে তিনি সকল উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছেন, সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। মক্কা শরীফে তিনি নবুয়্যাত লাভের পর প্রায় তেরটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এ সময় তিনি প্রতিটি ঘরের প্রতিটি মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিপক্ষ ও অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর অমানুষিক জুলুম-নিপীড়ন ও অত্যাচার-নিস্পেষণ চালান হয়েছিল কেবলমাত্র এ কারণেই।

মক্কায় অবস্থান কালেই তিনি নগরীর বাইরের লোকদের নিকটও এই দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তায়েফ গমন করেছিলেন। মদীনা শরীফে পৌঁছার পর তিনি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখলেন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পরস্য সম্রাট কিস্‌রা, মিসর অধিপতি মুকাউকাস, হিরার রাজা হারেস গাসানী, ইয়ামানের বাদশাহ হারেস আল-হিময়ারী এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট। তাঁর অন্তর্ধানের পর সারা দুনিয়ায় দ্বীন-ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হল তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা ও মুসলিম উম্মাতের উপর। অতঃপর ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে পৃথিবীর বহু মানুষ, বহু জাতি। তখনকার জানা পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলের মানুষই ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। এ থেকে কুরআন মজীদের এ দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) বিশ্ব-মানবের নবী-রাসূল হিসাবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর নবুয়্যাত বিশ্ব-নবুয়্যাত, রিসালাত বিশ্ব-রিসালাত। কুরআনের দাওয়াত নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে অবশ্য গ্রহণীয়।

www.amarboi.org

ইসলামী শরীয়াতের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা

ইসলাম মানুষের দ্বীনী ও বৈষয়িক সব অবস্থার সংশোধন ও সুষ্ঠু সংগঠনের উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় এসেছে। তাতে যেমন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের বস্তুগত ও বৈষয়িক জীবনকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সুবিচার-ভিত্তিক বানাবার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাও। ইসলামে ইবাদাত অনুষ্ঠানের যে বিধান রয়েছে, তা নিছক প্রাণহীন কোন আনুষ্ঠানিক ইবাদাত নয়। এ সব ইবাদাত মানুষকে একদিকে আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও তাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে তোলার ব্যবস্থা করে, অন্যদিকে বৈষয়িক জীবনে তাকে বিরত রাখে সব রকম অন্যায়, অনাচার ও চরিত্রহীনতা থেকে। সেই সঙ্গে এসব ইবাদত বৃহত্তর সমাজ ক্ষেত্রে লোকদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, ইনসাফ ও সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যে কোন কল্যাণকর কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাত। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ও সুন্দর করে তুলবার কাজে আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতসমূহের সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার করার আহবান জানিয়েছে ইসলাম। ইসলামের বক্তব্য হল, এ সব কাজের মূলে দুটো জিনিস বর্তমান থাকা অপরিহার্য। প্রথম, চরম লক্ষ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ এবং দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষের যথার্থ অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষা করা। ইসলাম মানুষকে পরকালে ফল পাওয়া যাবে এমন আমলের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যেও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে আয়-উপার্জন করার তাগিদ দিয়েছে।

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ইহকাল ও পরকালকে একীভূত ও একাকার করে দিয়েছে। যে সব বৈষয়িক কাজ পরম কল্যাণ তথা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ও মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সম্পাদন করা হবে, করা হবে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী, তা-ই দ্বীনী কাজ বলে গণ্য হবে ইসলামের দৃষ্টিতে। পক্ষান্তরে 'ইবাদাত' নামের যে সব কাজ মানুষকে সাধারণ জনকল্যাণ ও বৈষয়িক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের কাজ থেকে বিরত রাখে, ইসলামে তা ইবাদাত রূপে গণ্য নয়। নবী করীম (স) একবার মসজিদে প্রবেশ করে একটি লোককে পারিবারিক ও সামাজিক কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নানাবিধ ইবাদাত-যিকির-আযকার ও অজীফা পাঠে নিমগ্ন দেখতে পেলেন। সাহাবীগণ লোকটির খুব প্রশংসা করলেন রাসূলের নিকট। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

www.amarboi.org

مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ،

লোকটির খরচ-খরচা কে বহন করে?

সাহাবীরা বললেনঃ তাঁর ভাই

একথা শুনে রাসূলে করীম (স) বললেনঃ اَخُوهُ اَعْبَدُ مِنْهُ 'এ লোকটির চাইতে তার ভাই-ই অধিক বেশী ইবাদাতকারী।'

কেননা এ লোকটি আয়-উপার্জন ও উৎপাদনমূলক কোন কাজ করে না, নিষ্ক্রিয় ইবাদাত ও যিকির-আযকারে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করে আর বসে বসে খায়। ওদিকে তার ভাই শ্রম করে, কামাই-রোজগার করে এবং এসবের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে। প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নিবিড় ও বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে দুনিয়ার সাথে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ। মানুষের বৈষয়িক কল্যাণ সাধনে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করাই যে মহত্তম ইবাদাত, একথা কুরআন হাদীসের বহু সংখ্যক ঘোষণা থেকেই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত। নবী করীম (স)-এর ঘোষণা হচ্ছেঃ

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ.

বিধবা ও অভাবগ্রস্থ লোকদের কল্যাণে চেষ্টানুবর্তী ব্যক্তি-আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী, সারা রাত্রি জেগে থেকে ইবাদাতকারী ও সারাদিন রোযা পালনকারী ব্যক্তির ন্যায় অনেক বড় আবেদ।

তিনি বলেছেনঃ

لَاَنْ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ.

কাঠের বোঝা পিঠে বহন করে নিয়ে আসা-কারও নিকট ভিক্ষা চাওয়া, সে দিবে কি দিবেনা তার নিশ্চয়তা না থাকা সত্ত্বেও-এ অবস্থার তুলনায়-অনেক ভাল ও কল্যাণময়।

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ،

নিজের শ্রমের বিনিময়ে যে খাদ্য সংগ্রহীত হয়, তার চাইতে উত্তম খাদ্য আর কেউ কখনও খেতে পারে না।

www.amarboi.org

طَلَبُ الْكَسَبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ هِيَ الْفَرِيْضَةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

ফরয নামায যথারীতি আদায় করার পর উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা ফরযের পর ফরয হওয়ার গুরুত্বের অধিকারী।

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত প্রথম কর্তব্য-ফরয। তার পরই যে ফরযটির গুরুত্ব, তা হল রুজি-রোজগারে আত্মনিয়োগ করা। প্রথমটিকে যেমন কিছু মাত্র উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি বিন্দুমাত্র উপেক্ষণীয় নয় দ্বিতীয় কর্তব্য পালন করা।

তিনি আরও বলেছেনঃ

إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّوْمُ وَلَا الصَّلَاةُ قِيلَ فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اَلْهُمُوْمُ فِيْ طَلَبِ الْعَيْشِ.

এমন কিছু গুনাহ রয়েছে, নামায-রোযার দ্বারা যার কাফ্ফারা হয় না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সে গুনাহের কাফ্ফারার কি উপায় হে রাসূল? বললেন, তার উপায় হচ্ছে রুজি-রোজগারের চিন্তা-ভাবনায় আত্মনিমগ্ন ও কর্মতৎপর হওয়া।

রাসূলে করীমের এসব ঘোষণার ভিত্তিতে দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠে, পাশ্চাত্যবাদীদের ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তা ও ধারণা থেকে তা মৌলিকভাবেই ভিন্নতর। এ দু'রকমের ধারণার মধ্যে অতগু সুগভীর পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা হল, উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হল ধর্ম বা ধর্মের কাজ এবং ধর্মের পরিধি এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে ধর্মের কোন স্থান নেই, নেই কোন কাজ।

কিন্তু কুরআন মজীদ ইসলামকে একটা 'ধর্ম' বলেনি, বলেছে 'দ্বীন'। এ পর্যায়ে দুটো আয়াত উল্লেখ্যঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ*
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ

www.amarboi.org

الْإِسْلَامَ دِيْنًا ، (المائده: ٣)

আজকের দিন কাফির লোকেরা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় করোনা, ভয় কর আমাকে। আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, এই পর্যায়ে তোমাদের প্রতি দেয় আমার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে যে দ্বীন পছন্দ করে মনোনীত ও নির্দিষ্ট করেছেন, তারই নাম হল ইসলাম। এ ইসলাম আল্লাহ্‌র একটা অতিবড় নিয়ামত হিসাবেই মানুষের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ামত দান শেষ হয়েছে- এর কোন অংশই অবশিষ্ট বা বাকি থেকে যায়নি। এ পর্যায়ে আর কিছু দেবার নেই। উপরন্তু এ দ্বীন পূর্ণমাত্রায় সম্পূর্ণ, এতে অসম্পূর্ণতা নেই কিছু। এ দ্বীন একদিকে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে, তার নিজের সত্তার সাথে এবং অন্যদিকে ও একই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্ব-মানবের সাথে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে। 'দ্বীন' সম্পর্কিত এ ধারণা যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'ধর্ম' সংক্রান্ত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস তা এ থেকে প্রকট ও ভাস্বর হয়ে উঠে। বস্তুতঃ মানুষের জন্যে যে 'ধর্ম' অপরিহার্য, তার এরূপ সুসম্পূর্ণ, সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শুধু 'অদৃশ্য উচ্চতর শক্তি সমূহের' সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করে যে ধর্ম, তার বাইরে মানুষের বাস্তব জীবনে যা কোন কর্মাদর্শ ও পথের নির্দেশ দিতে অক্ষম, মানুষের জন্যে তার কোন প্রয়োজনই নেই। এটাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্মত কথা এবং এটাই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বীন-ইসলাম অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা-দুর্ঘটনার উপর নির্ভরশীল কোন ধর্ম নয়। তবে তা বিশ্বলোক পর্যবেক্ষণ, সৃষ্টি ও জীবনের কার্যকারণ সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা চালানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন ও উদ্বোধন করে, তাকে মুক্তিদান করে সব রকমের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিক নিয়ম-বিধানের বন্ধন থেকে। ইসলাম মানুষকে আকুল আহবান জানায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে। সেই সঙ্গে সে মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনকে সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে গড়ে তোলে; তাদের পারস্পরিক কার্যক্রম এমনভাবে সুসংগঠিত করে, যার ফলে সেখানে জুলুম-অত্যাচার, নিপীড়ন-নিষ্পেষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ এক বিন্দু স্থান লাভ করতে পারে না।

www.amarboi.org

এ কারণে ইসলামী শরীয়াত-পারদর্শীগণ বলেছেন, ইসলামী শরীয়াতের তিনটি বড় বড় দিক রয়েছেঃ

(১) اَلْأَحْكَامُ الْإِعْتِقَادِيَّةُ আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়ম-বিধান

(২) اَلْأَحْكَامُ الْخُلُقِيَّةُ নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি

(৩) اَلْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ বাস্তব কাজ-কর্ম সংক্রান্ত আইন ও বিধান

এর প্রতিটি দিকের আবার বহু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে।

আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়ম-বিধান

'আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়ম-বিধান' বলতে বুঝায় আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী, আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রাসূল এবং পরকালীন অবস্থা সম্পর্কে যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞানার্জন। এ জ্ঞানকে অবশ্যই কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভিত্তিহীন মত এবং ভ্রান্ত ও অর্থহীন ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। মুসলিম মনীষীগণ এজন্যে একটা জ্ঞানকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। যার নাম 'ইল্‌মুল কালাম'-কালাম শাস্ত্র কিংবা ইল্‌মুত তাওহীদ-আল্লাহ্র একত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান। এ পর্যায়ে পাঠ গ্রহণের জন্যে তাঁরা দুটি পথ অবলম্বন করেছেনঃ

একটি হচ্ছে, আকীদা-বিশ্বাস পর্যায়ে কুরআন মজীদ এবং রাসূলে আমীন (স)-এর সুন্নাতে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তা শিক্ষা করা। সেই সঙ্গে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তির পুরাপুরি প্রয়োগ ততটা, যতটা কুরআন প্রদর্শিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুমোদন করে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ্ অনুমোদিত মাত্রায় দর্শন ও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ, যেন এক দিকে কুরআন-সুন্নাহ্ এবং অপর দিকে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত রীতি-নীতি

'নৈতিক চরিত্র' বলতে বুঝায়ঃ ইসলামে বিশ্বাসীদের জীবনে এমন সব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যার ফলে তাদের দ্বারা যাবতীয় শুভ কর্ম সম্পাদিত হতে পারে ইত্যাদি। এছাড়া যেমনঃ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আন্তরিকতা, সহৃদয়তা, বিনয়, নম্র স্বভাব, আত্মপরিশুদ্ধি, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও অহংকার-আত্মম্ভরিতা পরিহারের ন্যায় মহৎ গুণাবলীও মুসলিম মাত্রেরই থাকা উচিত। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মৌলিক ও বিস্তারিত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকেই গ্রহণীয়। আধ্যাত্মবাদী মনীষীগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে এ পর্যায়ে বিশেষ তত্ত্ব ও

www.amarboi.org

তথ্যমূলক আলোচনা পেশ করেছেন। ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এদিকটির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত। উপরন্তু ইসলামী শরীয়াত যে আমল বা কর্ম-বিধান পেশ করেছে, তার জন্যে হৃদয়-মনকে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এই ইল্‌ম একটি ভিত্তি-বিশেষ। এ গুণাবলীর মাধ্যমেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত হয়। বিদ্রোহী ও শত্রু ভাবাপন্ন লোকদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ এর দ্বারাই দূর করা সম্ভব; এমনকি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করাও এছাড়া আর কোন উপায়ে সম্ভব নয়।

এ কারণে আমরা দেখতে পাই, মানুষের পরস্পরে যে বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে এবং যে কারণে একশ্রেণীর লোক অপর লোকদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়, ইসলাম সে সব পার্থক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আত্মিক ও নৈতিক পার্থক্যসমূহ ইসলামে স্বীকৃত। কেননা এ পার্থক্য আছে বলেই মানুষ পৃথিবীর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনে এবং তাকে কল্যাণময় করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করতে পারছে। নবী করীম (স)ও নানা কথার মাধ্যমে জনগণকে এ ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত করতে চেষ্টা পেয়েছেন। তিনি এর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেনঃ

إِنَّ الدِّيْنَ حُسْنُ الْخُلُقِ،

উত্তম ও নির্মল চরিত্রই হচ্ছে আসল দ্বীন।

অর্থাৎ দ্বীন বা ধর্ম ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অবাস্তব কাল্পনিক জিনিস নয়; বরং বাস্তব জীবনে তার পূর্ণ রূপায়ন জরুরী। আর তা সম্ভব উত্তম ও নির্মল চরিত্রের মাধ্যমেই। যে দ্বীন তার প্রতি বিশ্বাসীদের মধ্যে উত্তম ও নির্মল চরিত্র সৃষ্টি করে না, তার সামগ্রিক বৈষয়িক জীবন উন্নতমানে গড়ে তোলে না, তা দ্বীন বা ধর্ম হওয়ার ও ধর্ম রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়।

বৈষয়িক ও বস্তুগত পার্থক্যসমূহ প্রতিরোধ এবং নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামের একটা বিশেষ অবদান রয়েছে দাস প্রথার বিলোপ সাধন প্রক্রিয়ায়। ইসলাম নীতিগতভাবেই দাস প্রথাকে অস্বীকার করেছে। ঘোষণা করেছে; মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না, কেননা মানুষ মাত্রই মাতৃগর্ভ থেকে 'স্বাধীন'রূপে জন্মগ্রহণ করে। তবে মানুষই তার নিজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতে অন্য মানুষকে দাস বানিয়ে নেয়, যদিও নীতিগতভাবে একাজ করার অধিকার কোন মানুষেরই নেই। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌রই দাস অন্য কারো নয়। তাই ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার সময় তদানীন্তন আরব সমাজে আবহমান কাল থেকে যে দাস

www.amarboi.org

প্রথা চলে আসছিল, তা হঠাৎ করে উৎখাত করার নীতি অবলম্বন না করে ক্রমিক নীতিতে নির্মূল করার বাস্তব পন্থা অবলম্বন করা হয়। দাস মুক্তিকে বহু গুনাহের কাফফারা এবং আল্লাহ্‌র মাগফিরাত লাভের অতিবড় উপায় রূপে নির্ধারণ করে দিয়ে অন্যায়-অপরাধ দমন ও বিলোপের মাধমে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের স্থায়ী, কার্যকর ও উৎসাহপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী এক ব্যক্তি তাদনীন্তন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর দরবারে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা থেকে ইসলামের নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা জানতে পারা যায়। সে ভাষণটি এইঃ

> আমরা জাহেলিয়াতের জনগণ মূর্তি-পূজারী ছিলাম। অশ্লীল, অশালীন, অশোভন ও লজ্জাকর কাজ-কর্মে আমরা লিপ্ত থাকতাম। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার কোন মর্যাদাও আমরা রক্ষা করতাম না। প্রতিবেশীদের নির্যাতন ও নিপীড়ণ করাই ছিল আমাদের স্বভাব। আমাদের সবল ও শক্তিমান লোকেরা আমাদের দুর্বল ও অক্ষমদের গ্রাস করে ফেলত। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে আমাদের মধ্য হতেই একজনকে রাসূলরূপে মনোনীত করলেন। আমরা তাঁর বংশ পরিচয় জানি। তিনি যে একান্তই সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিশ্বস্ত, আমানতদার, ক্ষমাশীল, সে বিষয়েও আমরা প্রত্যক্ষভাবে ও পুরাপুরি অবহিত। তিনি আমাদের দাওয়াত জানালেন আল্লাহ্‌কে এক ও একক রূপে মেনে নিতে, কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী করতে। আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যে প্রস্তর বা মূর্তির পূজা-উপাসনা করতাম, তিনি তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ও পরিহার করার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আমাদের আদেশ করলেন সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয় সম্পর্কের হক্ক আদায় করতে, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে, হারাম কাজ ও অন্যায় রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে; নিষেধ করলেন নির্লজ্জতা ও কলুষতার কাজ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ইয়াতীমের মাল-সম্পদ খেয়ে ফেলতে এবং নির্দোষ ও নিষ্পাপ স্ত্রীর উপর চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ আনতে। আমরা সকলে তাঁকে সত্য রাসূল রূপে গ্রহণ করেছি এবং এই সব আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি।

হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজে-যিনি এই ইসলামী রিসালাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন–সর্বপ্রথম এসব উন্নত মানের চরিত্র নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ চরিত্র দান করেছিলেন, তাঁর

www.amarboi.org

চরিত্রকে উন্নত ও সুদৃঢ় বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অতীব উত্তম নৈতিক ভূষণে বিভূষিত করেছিলেন। তিনি নিজেই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেনঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ،

হে রাসূল! তুমি নিশ্চয়ই অতীব উত্তম, উন্নত ও বিরাট চরিত্রের অধিকারী

রাসূলে করীম (স) নিজেই বলেছেনঃ

اَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبِىْ،

আমার আল্লাহ্-ই আমাকে আদব-কায়দা শিখিয়েছেন এবং অতীব উত্তম আদব ও চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেনঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ،

লোকদের মহত চরিত্র ও উত্তম নৈতিকতাকে পূর্ণ পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।

www.amarboi.org

বাস্তব কাজ-কর্ম সংক্রান্ত আইন-বিধান

শরীয়াত পালনে প্রস্তুত লোকদের প্রথম কর্তব্য আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কর্তব্য তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা। আর এ দ্বিমুখী কাজের জন্যেই মানুষ আইন ও নিয়ম-বিধানের মুখাপেক্ষী। প্রকৃতি-বিকাশের ন্যায় আইন প্রণয়নের এটা সর্বশেষ পর্যায়। তা এভাবেঃ প্রথমে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধন ও সুষ্ঠু রূপে গড়ার পর তদনুযায়ী তাদের চরিত্র গঠন করতে হবে। এ হল মানব সমাজ সংশোধন ও সংগঠনের সর্বপ্রথম কাজ। তারপর মানুষকে তৈরী করতে হবে বাস্তব কর্ম-জীবনে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান পালন করার জন্য, তাকে বানাতে হবে শরীয়াতের অনুগত ও অনুসারী। এ ক্ষেত্রটি তিনটি দিকে পরিব্যাপ্ত। একটি হল মানুষের কথা-পারস্পরিক কথা-বার্তা ও কথোপকথন। দ্বিতীয় হল মানুষের কাজ-যা সে সম্পাদন করে এবং তৃতীয় হল হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা প্রয়োগ, অর্থাৎ যে সব কাজে মানুষের আধিপত্য স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়। আর এই সব দিক সম্পর্কেই শরীয়াতের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য মানুষের উপর এমন অবস্থাও কখনও-সখনও এসে পড়ে-তাকে এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়, যখন শরীয়াত পালনের বাধ্যবাধকতা তিরোহিত হয়। মানুষের হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা প্রয়োগে ভুল-নির্ভুল ও সহীহ বাতিল-এর প্রশ্ন দেখা দেয়, আমলের ক্ষেত্রে দেখা দেয় হালাল-হারামের প্রশ্ন। কেননা এমন অনেক কাজই মানুষের সমীপবর্তী হয়, যার কোন-কোনটি হালাল এবং কোন-কোনটি হারাম। ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তি ও সমাজ-সমষ্টির ক্ষেত্রেও এই হালাল-হারামের প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তা দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন-বন্ধুতা-মিত্রতা ও যুদ্ধ বা সন্ধির ক্ষেত্রেও। যেসব ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে-যেমন পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত), নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ঈমানদার মানুষকে। মানুষ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়, তার ভোগ ও ব্যয়-ব্যবহার করে। তাতে ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব ধন-সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে আবার বহু ব্যক্তির এবং সমাজ-সমষ্টির হক্ক বা অধিকারের প্রশ্নও রয়েছে। মানুষের পরস্পরে হয় অনেক মুয়ামিলাত-লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, আত্মীয়তা-বন্ধুতা ও চুক্তি-প্রতিশ্রুতি। মানুষের সামাজিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার

www.amarboi.org

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন। এ জীবনের সম্পর্ক যেমন বেঁচে থাকা অবস্থার সাথে, তেমনি মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার সাথেও। আদালতী ও ফৌজদারী অপরাধ এবং তার দণ্ড ও শাস্তির প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। রাষ্ট্র শাসন-পরিচালনা, বিচার-মীমাংসা, সর্বোচ্চ শাসক-প্রশাসক নিয়োগ এবং দাবি প্রমাণ করা ও আইন জারী বা বলবৎ করণও মানুষের সামাজিক জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর এই সবই হচ্ছে ইসলামী ফিকাহ্-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্র পরিভাষায় এর একটা সাধারণ নাম হল أفعال المكلفين 'শরীয়াত পালনে বাধ্য লোকদের কার্যাবলী।' এই-ই হচ্ছে ইল্মে ফিকাহ্র আলোচ্য বিষয়বস্তু।

ইসলামী ফিকাহ্
(ISLAMIC JURISPRUDENCE)

'ফিকাহ্' বা 'আল-ফিক্হু' শব্দের অভিধানিক অর্থঃ

اَلْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَالْفِطْنَةُ فِيهِ،

কোন বিষয়ে জানা, বোঝা, অনুধাবন করা এবং তাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দক্ষতা-পারদর্শীতা অর্জন।

'দ্বীন-সম্পর্কিত গভীর, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম জ্ঞান'কেই সাধারণতঃ 'ইল্‌মে ফিকাহ্' বলা হয়। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও আদেশ-বিধান এরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই হল ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান।

ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রথম পর্যায়েই ইসলামী ফিকাহ্ এই রূপ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইসলামী শাসন-বিধানের ভিত্তিরূপে কাজ করে। উত্তরকালে ইসলামের দেশ জয় অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। বহু দেশ ও জাতি ইসলামের পতাকাতলে এসে ভিড় জমায়। তখন অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, সংঘটিত হয় অনেক ঘটনা ও ব্যাপার এবং সে বিষয়ে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান 'খলীফা' কিংবা ইসলামী বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতি অথবা লোকদের সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান পেশকারী সরকার নিয়োগকৃত বা সাধারণ জন-সমর্থিত বিশেষজ্ঞগণ যেসব ফরমান রায় বা ফতোয়া দিয়েছেন, তা-ও এই ইসলামী ফিকাহ্‌রই বিকাশ পর্যায় এবং তারই অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদাত-বন্দেগী তথা জামা'আতের সাথে নামায পড়া থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের যাবতীয় কাজই শামিল রয়েছে। অনেক ব্যাপার এমনও দেখা দিয়েছে, যে-বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তখন কুরআন-সুন্নাহ্-বিশেষজ্ঞ লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্ এবং সাহাবীদের কথা, কাজ ও গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর উপর ভিত্তি করে সমুখে উপস্থিত নতুন বিষয়ে 'রায়' দিতে হয়েছে। এগুলোও ফিকাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। এ পর্যায়ে ইল্‌মে ফিকাহ্‌র নবতর সংজ্ঞা দিতে হয়েছে এ ভাষায়ঃ

اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ.

'শরীয়াতের মৌলিক দলীলসমূহের ভিত্তিতে বাস্তব কাজ-কর্ম সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান-ই হল ফিকাহ্। (ব্যবহার তত্ত্ব বা আইন-বিজ্ঞান)

www.amarboi.org

শরীয়াতের যে সব হুকুম-আহ্কাম জানবার ও বুঝবার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করে ইজতিহাদের সাহায্যে মত স্থির করতে হয়েছে, তা-ও এই ফিকাহ্রই অঙ্গ ও অংশ। এ দৃষ্টিতে ইল্মে ফিকাহ্র দু'টি অংশ।

একটি হল শরীয়াতের খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধান।

আর দ্বিতীয়তটি হল, তৎসংক্রান্ত দলীল ও প্রমাণ।

আর এই দৃষ্টিতে বিস্তারিত ও ভিন্ন ভিন্ন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব কাজ-কর্ম বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম-আহ্কাম যার জানা আছে, তাকেই বলা হয় 'ফকীহ্'। ইসলামের প্রথম যুগে কয়েকজন সাহাবী 'ফকীহ্' রূপে জনগণের মধ্যে সুপরিচিত হন। তাঁরা হলেনঃ (১) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (২) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, (৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (৬) হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (৭) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)। রাসূলে করীম (স)-কে 'ফকীহ্' বা 'ফিকাহ্বিদ' বলা হত না। কেননা শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দলীল-প্রমাণ-ভিত্তিক ছিল না। দলীল-প্রমাণ-চিন্তা-বিবেচনা বা গবেষণার ফলেও তা অর্জিত হয়নি। তাঁর যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র উৎস ছিল আল্লাহ্র নিকট থেকে পাওয়া 'অহী'।

ফিকাহ্র বিধি-বিধানের ব্যাপকতা

ইসলামী ফিকাহ্র আইন-বিধান ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্র-সরকার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মানব জীবনের এ ক'টি দিকই এমন যে, আল্লাহ্র হক্ তাঁর সৃষ্টির উপর, ব্যক্তিদের হক্ অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর, ব্যক্তির অধিকার সমাজ-সমষ্টির উপর এবং সমাজের অধিকার ব্যক্তিদের উপর প্রতিফলিত হয়। এ সব-ক'টি দিক ও বিভাগের জন্যেই ইসলামী ফিকাহ্য় আইন-বিধান রয়েছে। এ কারণেই ইসলামী ফিকাহ্ প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম ইবাদাত আর অন্য ভাগের নাম 'মুয়ামিলাত'-পারস্পরিক ব্যাপারাদি। (Mutual Transactions)

ইবাদাতঃ

যে সব কাজের মূল লক্ষ্য সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ, চল্তি কথায় সেসবকে বলা হয় ইবাদাত। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ। এসব ক্ষেত্রে শরীয়াত পালনের বাধ্যবাধকতা ইবাদাতমূলক।

www.amarboi.org

এসবের মাধ্যমে বান্দাহ্ তার মা'বুদের প্রতি আপন কর্তব্য পালন করে। এ কারণে এই পর্যায়ের যাবতীয় বিধি-বিধান সপ্রমাণিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সু-স্থির ও অপরিবর্তনীয় এবং অবস্থা ও যুগ বা কালের পরিবর্তনে তাতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন সূচিত বা সাধিত হতে পারে না। এ পর্যায়ের বিধি-বিধানের কোন দৃষ্টান্ত মানব রচিত আইন বিধানে পাওয়া যেতে পারে না। কেননা মানব রচিত আইন-বিধান 'আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দাহর সম্পর্ক কিংবা মা'বুদের প্রতি বান্দাহর কর্তব্য'-বিষয়ে কখনও নাক গলায় না। এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। এ দিকটির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাও তাতে স্বীকৃত নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলাই এ পর্যায়ের যাবতীয় কাজের বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ্ নিজে এসব ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন, তবু তিনি এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের মন, প্রবৃত্তি ও নফস্কে আল্লাহ্নুগত্যে প্রস্তুত ও তাতে অভ্যস্ত করে তোলা হবে এ সব ইবাদাত পালনের মাধ্যমে ও এগুলোর সাহায্যে। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে আল্লাহ্র; কোন্ কাজে আল্লাহ্র ইবাদাত হয় আর কোন্ কাজে হয় না, এ কথা নিজস্বভাবে জানতে পারা মানুষের সাধ্যাতীত। তাই ইবাদাতের নিয়ম-বিধান মানুষ নিজে রচনা করবে, এমন দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দেন নি। তাই পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, সময় সংরক্ষণ ও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের বিনিময়ের তাঁর শোকর আদায় পর্যায়ের যাবতীয় কাজের বিধান আল্লাহ্ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

নামাযের কাতারে নামাযীরা সুশৃংখল ও সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ায়। এজন্যে দেহ ও মন উভয়ই পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নিতে হয় নামাযীকে। রোযা পালনে হয় বান্দাহর মনের কৃচ্ছ সাধনা। নফ্সকে সর্বপ্রকার লালসা-কামনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেয়। সব বদ্ অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মানুষকে দেয় মুক্তি ও নিষ্কৃতি। প্রয়োজন, অভাব-অনটন ও বঞ্চনার তীব্র পীড়নের অনুভূতি ধনী-দরিদ্র সবাইকে একাত্ম বানিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষে মানুষে শ্রেণী-পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায়। পরস্পর শুধু নিকটবর্তীই হয় না, অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হয় পরম প্রীতি, বন্ধুতা ও ভালোবাসা।

ধনীদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক্ রয়েছে এবং সে হক্ সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত। প্রধানতঃ যাকাত নিয়মিত প্রদান করে এ হক্ আদায় করা হয়। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন লোক ও শ্রেণী পরস্পরের সাথে নৈকট্য ও একাত্মতা লাভ করে। সমাজ থেকে শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-বিরোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। লোকদের মধ্যে সংগ্রাম নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার ভাবধারা গড়ে উঠে। হজ্জ পালনে স্ত্রী-পরিজন ও বাসস্থান তথা স্বদেশ থেকে

www.amarboi.org

দূরত্ব স্বীকার করার এবং বিদেশ যাত্রাসঞ্জাত দুঃখ-কষ্ট-দুর্ভোগ সহ্য করার অভ্যাস গড়ে উঠে। অনেক বাধা-বন্ধন ও আদত-অভ্যাসের দাসত্ব থেকেও মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তাছাড়া এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন। সেখানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত, পারস্পরিক জানাজানি, চিন্তার আদান-প্রদান এবং একের পক্ষে অপরের সমস্যা জানা-বোঝা এবং একের উন্নতি ও অগ্রগতি থেকে অন্যের শিক্ষা ও প্রেরণা লাভের বিরাট সুযোগ ঘটে। এ যে কতবড় একটা নিয়ামত, তা একমাত্র অনুভূতিসম্পন্ন লোকেরাই বুঝতে পারে।

ফিকাহ্‌বিদগণ পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন গঠন সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহকে ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে একত্রিত ও সুসংহত করেছেন। কেননা এ পর্যায়ে মানুষকে অনেক বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে হয়। শরীয়াত প্রণেতা মানবোপযোগী সমাজ কাঠামো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ পর্যায়ে বিস্তারিত বিধি-বিধান দিয়েছেন। বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, মহরানা, ব্যয়ভার বহন, বংশ প্রমাণ, অভিভাবকত্ব, সন্তান পালন, তালাক্ ও বিচ্ছেদ প্রভৃতি পর্যায়ের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত মসলা-মাসায়েল এই ফিকাহ্‌রই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আধুনিক কালে এ পর্যায়ের বিধি-বিধানকে বলা হয় 'পারিবারিক আইন' (Family code)

মুয়ামিলাত (Mutual Transactions)

মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক ও বৈষয়িক ব্যাপারকেই 'মুয়ামিলাত' বলা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহ্‌র লক্ষ্য মানবীয় সমাজ-পরিস্থিতির সংশোধন ও উন্নয়ন সাধন। মানুষ স্বভাবতঃই যে সামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য, সেই সামাজিক জীবনকে কল্যাণময় আদর্শ ও ভাবধারায় পরিসিক্ত করাই এ পর্যায়ে ইসলামী ফিকাহ্‌র উদ্দেশ্য। এই পর্যায়েও কুরআন ও সুন্নাতে বিধান এসেছে এ কথা ঠিক; কিন্তু তা ইজমালী বা নীতিগত-অবিস্তৃত ও খুঁটিনাটিমুক্ত। কেননা মানব জীবনের এই ক্ষেত্রে অবস্থা, কাল, পরিবেশ বা ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অনেক পার্থক্য বা পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। এরূপ অবস্থায় খুঁটিনাটি বিধান চিরন্তনতা পেতে পারে না। এ কারণে এসব ক্ষেত্রের জন্যে দেয়া বিধি-বিধানকে অনিবার্যভাবে মৌলিক, অবিস্তৃত ধরণের হতে হয়েছে, যেন প্রত্যেক যুগে ও পরিবেশে প্রয়োজনের দৃষ্টিতে সে মৌলিক ও অবিস্তৃত বিধানের ভিত্তিতে খুঁটিনাটি আইন রচিত হতে পারে। তবে সে খুঁটিনাটি রচনায়ও মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ এবং তা অনুসরণ করার মাধ্যমে

www.amarboi.org

যেন আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা হয়, আল্লাহ্‌র অসন্তোষের কোন কারণ না ঘটানো হয়।

এই কারণে 'মুয়ামিলাত' পর্যায়ে 'ইসলামী শরীয়াত' শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেঃ

إِنَّ الْمَقْصَدَ إِنَّمَا هُوَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَحِفْظُ النِّظَامِ،

সাধারণ জনকল্যাণ লাভ এবং সামাজিক জীবন সংস্থার সংরক্ষণই হল এক্ষেত্রে শরীয়াতের চরম ও পরম লক্ষ্য।

আগেই বলেছি, এ পর্যায়ে শরীয়াতের দেয়া বিধি-বিধান মোটামুটি পর্যায়ের-মৌলিক, অ-বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি মুক্ত। যে কোন সময় যে কোন খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তারই ভিত্তিতে রচিত হতে পারবে।

এভাবে ইসলামী আইন মানব জীবনের এই 'মুয়ামিলাত' পর্যায়ের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত, যতটা ব্যাপকভাবে আধুনিক আইন বিস্তৃত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের জরুরী আইনের মৌলিক বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সূরায়। সূরা আল-আনফাল, সূরা আত্-তওবা, সূরা আল-ফাত্হ ও সূরা আল-মুম্‌তাহিনায় এ সম্পর্কিত আয়াতের উল্লেখ দেখা যায়। নবী করীম (স) অন্যান্য জাতির সাথে বিভিন্ন সময়ে যে সব যুদ্ধ বা সন্ধি চুক্তি করেছেন-যা কখনও রক্ষা করা হয়েছে, কখনও করা হয়েছে ভংগ-নবী চরিত সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে তার উল্লেখ বিস্তারিতভাবে রয়েছে। এই পর্যায়ের বিস্তারিত আইন-বিধান রচনার জন্যে তা যে কোন সময় উৎস ও ভিত্তির কাজ করতে পারে। এ কারণে মুসলিম ফিকাহ্‌বিদগণ অন্যান্য জাতির সাথে মুসলিম জাতির যুদ্ধ-সন্ধি বা চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী ফিকাহ্‌র মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন এবং তার নাম রেখেছেনঃ 'সিয়র ও মাগাজী'। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক, আশ্রয় গ্রহণকারী বিদেশী নাগরিক এবং যুধ্যমান জাতির লোকদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ব্যাপারটিও এ পর্যায়েই গণ্য।

সাংবিধানিক (Constitutional) ও সাংগঠনিক (Institutional) বিষয়াদিও ফিকাহ্ শাস্ত্রের অংগ ও অংশ। ফিকাহ্‌বিদগণ তার নাম দিয়েছেন اَلسِّيَاسِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ 'শরীয়াত-ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি। শুল্ক, ওশর, খারাজ, জিজিয়া, গুপ্ত সম্পদ, খনিজ সম্পদ এবং পতিত ও অনাবাদি জমি আবাদকরণ ইত্যাকার অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়াদিও এর ভিতরেই শামিল রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য ঘোষণাবলী থেকে ফিকাহ্‌বিদগণ এমন সামাজিক-সামষ্টিক ও

www.amarboi.org

সুবিচারমূলক বিধান তৈরী করেছেন, যা ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব ও উৎপাদনের স্বাধীনতা-অধিকার প্রকাশ পায় ও সপ্রমাণিত হয়। এটিও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পর্যায়ে গণ্য হয়েছে। ফিকাহ্‌বিদগণ জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন ও সম্পর্ক স্থাপন-রক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়মবিধি (মাসলা) তৈরী করে শরীয়াতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন; ধন-সম্পদের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করে তার মালিকানা লাভের সঠিক পন্থা এবং তৎসংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বহু লোকের একত্রিত হয়ে অর্থোৎপাদন বা ব্যবসায়মূলক কাজ করার এবং তার বহু শাখা-প্রশাখা দেখিয়ে তার জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারটিকে তাঁরা উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

অপরাধ ও পারস্পরিক শত্রুতার ব্যাপারটিও ফিকাহ্‌বিদদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জন্যে তাঁরা সুবিচারমূলক বিস্তারিত আইন-বিধান ও নিয়ম-কানুন তৈরী করেছেন। ফলে যত প্রকারেরই নতুন নতুন অপরাধ সংঘটিত হোক না কেন, সে সব বিষয়ে শরীয়াতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। বিচার, দাবি, সাক্ষ্যদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও ফিকাহ্‌র অংশ।

মোটকথা, ইসলামী ফিকাহ্ মুসলিম জনগণের সর্ববিষয়ে ইসলামী আইন উপস্থাপন করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় যেসব বিষয়ে স্পষ্ট বিধান দেয়া হয়নি, ফিকাহ্‌বিদগণ সেই সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ও ভিত্তিতে বিধান তৈরী করেছেন। ফলে ইসলামী ফিকাহ্ এক বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। সে জ্ঞান-ভাণ্ডার সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও নির্ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর যে কোন নবতর ঘটনা, নতুন সমস্যা বা জটিলতাই দেখা দিক না কেন, সে বিষয়ে শরীয়াতের বিধান তা থেকে সহজেই বের করা সম্ভবপর।

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য ঘোষণার ভিত্তিতে বাস্তব জীবনের সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কি হতে পারে, তা ব্যাপকভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে। অনুরূপভাবে যে সব বিষয় ও সমস্যাদি সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট কোন ঘোষণা নেই, সেই সব বিষয়েও ফিকাহ্ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় এবং শরীয়াতের মৌল বিধানের আলোকে সে সব বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শরীয়াতের বিধানদাতা শরীয়াতসম্মত এমনসব নিদর্শন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যে সব থেকে কুরআন-সুন্নাহ্‌য় না পাওয়া বিষয়াদিতেও শরীয়াতের পথনির্দেশ কি হতে পারে বা হওয়া উচিত তা স্পষ্টভাব বুঝতে ও জানতে পারা যায়। তা ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়াদি

www.amarboi.org

হোক; কিংবা মুসলমানদের বিশেষ ধরনের মুয়ামিলাত পর্যায়ের ব্যাপারই হোক, তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। বস্তুতঃ ইসলামী ফিকাহ্ তার শাশ্বত ও চিরন্তন উৎসকে ভিত্তি করে মানব জীবনের সর্ববিষয়ে, সর্বদিক ও সকল রকমের ব্যাপারেই এমন মৌল নীতি উপস্থাপন করেছে, যা সর্বকালে, সর্বদেশে ও সকল প্রকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অনুসরণযোগ্য এবং তার ভিত্তিতে শরীয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-পথে কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ছাড়াই অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

www.amarboi.org

ইসলামী ফিকাহ্য় সমাজ-সমষ্টির প্রাধান্য

ইসলামী ফিকাহ্ সাধারণভাবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ বিধানে ব্রতী। তবে ব্যক্তি-কল্যাণের উপর সমাজ-সমষ্টির কল্যাণের প্রাধান্য এখানে স্বীকৃত। এ কারণে তা সামাজিক প্রাধান্যসম্পন্ন বলে পরিচিত। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, ব্যক্তি-স্বত্ত্ব ব্যবহার ও প্রয়োগে যদি অন্য কারো ক্ষতি সাধিত হয়, কিংবা এক ব্যক্তির স্বত্বাধিকার ভোগ সাধারণ সমাজ-কল্যাণের সাথে কখনও সাংঘর্ষিক হয়, তখন ব্যক্তি-স্বত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও তার সীমা নির্ধারণের পন্থা অবলম্বন ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে খুবই বৈধ। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বভাবসম্মত হলেও তা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নয়। উপরিউক্ত অবস্থায় ব্যক্তির স্বত্ব-স্বামিত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা সংগত হবে ঠিক ততটা, যতটা সার্বিক-সামাজিক কল্যাণ বিধানের জন্যে অপরিহার্য। উপরন্তু সে হস্তক্ষেপও হতে পারবে শুধু ততটুকু, যার দ্বারা অন্যান্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ কারণেই যে কাজটি মূলতঃ মুবাহ্-করা নাজায়েয নয়, তা করা হলে যদি অন্য লোকদের ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়, তাহলে সে কাজ থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কেননা সাধারণ কল্যাণ বিশেষ কল্যাণের উপর অগ্রাধিকার লাভের অধিকারী। রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণার ভিত্তিতে এই মৌল নীতি সপ্রমাণিতঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ،

ইসলামে যেমন নিজে ক্ষতি স্বীকারের নিয়ম নেই, তেমনি অন্য লোককে ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়ারও সুযোগ নেই।

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, যে কাজের ফলে অন্য লোকদের ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সে কাজ যদি মূলতঃ 'মুবাহ'ও হয়, তবু সেই কাজ প্রতিরোধ বা বন্ধ করে দিতে হবে। (মুবাহ বলা হয় সে কাজকে যা করতে নিষেধ করা হয়নি)।

বস্তুতঃ ইসলামী ফিকাহ্র এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল নীতি। হাদীস গ্রন্থে রাসূলে করীম (স)-এর ধরনের আরও বহু সংখ্যক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যার ভিত্তিতে এ মৌল নীতির বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জানা যেতে পারে। যেমন একটা জিনিস কেউ ক্রয় করতে উদ্যোগী হলে, তার অনুমতি ব্যতীত অপর জনকেও উদ্যোগী হতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। একজন কোথাও বিয়ের প্রস্তাব

www.amarboi.org

দিলে তার উপর আর একজনকে প্রস্তাব দিতে তিনি নিষেধ করেছেন-যতক্ষণ না সে প্রস্তাব কোন চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে কিংবা প্রথম প্রস্তাবকারী নিজেই অনুমতি দেয়। শুফয়া (شفعة) সংক্রান্ত বিধানও এই ভিত্তিতে রচিত। এই সব ক'টি ব্যাপারে বিক্রেতা-ক্রয়কারীর বা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কিংবা তাকে একটা সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। তাতে অংশীদার বা প্রতিবেশীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই শুফ্য়া'র অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। একজনের কাজে অন্যদের ক্ষতি সাধিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হলেই সমাজের সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্নে জীবন যাপনে সক্ষম হতে পারে। ব্যক্তির প্রকৃত সৌভাগ্য এই রূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থায়ই নিহিত এবং শেষ পর্যন্ত এতেই সার্বিক ও সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এই দৃষ্টিতে সার্বিক সামাজিক কল্যাণের জন্যে ব্যক্তি মালিকানা হরণ করা সম্পূর্ণ শরীয়াতসম্মত। যেমন লোক চলাচলের পথ প্রশস্তকরণ, রাস্তা নির্মাণ, খাল কাটা এবং মসজিদ, হাসপাতাল, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি দখল করার সামাজিক অধিকার স্বীকৃত। তবে সেজন্যে শর্ত এই যে, সম্পত্তি হরণ করে ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না; দখলকৃত সম্পত্তির সঠিক মূল্য বা ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে তাকে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। হযরত উমর ফারূক ও তাঁর পরে হযরত উসমানের (রা) খিলাফত কালে এই রূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বহু সাহাবীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মক্কার হেরেম শরীফ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও দখল করে নেয়া হয়েছিল।

জনগণের খাদ্যাভাব দেখা দিলে উদ্বৃত্ত খাদ্য সম্পদ মালিকদের নিকট থেকে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়া এবং মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার উর্ধ্বে উঠে গেলে তার ন্যায্য মুল্য নির্ধারণ করে দেয়ার অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের রয়েছে। কিন্তু তাতে মূল লক্ষ্য থাকতে হবে জনগণের খাদ্যাভাব বা খাদ্য কষ্ট দূর করা ও নির্বিঘ্নে খাদ্য আহরণের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ। অনুরূপভাবে বিশেষ কোন শিল্প কাজে সেই কাজে দক্ষ শ্রমিক-কর্মীদের উপযুক্ত মজুরীর বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে বিনিয়োগ করারও অধিকার রয়েছে সমাজ তথা রাষ্ট্র-সরকারের।

মূলতঃ এগুলো ইসলামের সার্বিক সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাবলীর দৃষ্টান্ত। ইসলামের এ এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা। ইসলামের পূর্বে এই ধরনের সামাজিক সার্বিক কল্যাণকর আদর্শ উপস্থাপন অন্য কোন মতাদর্শ বা সমাজ

www.amarboi.org

ব্যবস্থার পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। ইসলামের এ এক বিশেষ অবদান। যারা মনে করে যে, ইসলামের আইন-বিধান পূর্ববর্তী কোন সমাজ ব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত, তাদের কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তা এ থেকেই প্রমাণিত। ইসলামী ফিকাহ্ আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে এই সার্বিক কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করেছে। দুনিয়ার সভ্যতাসমূহ শেষ পর্যন্ত ইসলামের অনুকরণে বহু ক্ষেত্রে এ ধরনের আইন-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। সে সব সভ্যতায় যে সব অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আইন-বিধান কার্যকর ছিল বা এখনও রয়েছে, ইসলামী ফিকাহ্‌র কোন পর্যায়েই তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না।

www.amarboi.org

ইসলামী শরীয়াতের বৈশিষ্ট্য

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, ইসলাম বস্তুতঃই এক মানবীয় দ্বীন-মানবোপযোগী জীবন-বিধান। এ ধরনের দ্বীন বা জীবন-বিধানই চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও চিরকালীন হওয়ার যোগ্য। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে তার সে যোগ্যতা প্রমাণিতও হয়েছে। ইসলামী বিধান তার প্রথম উন্মেষ কালে যেমন মানবোপযোগী ও সর্বমানুষের জন্যে কল্যাণকর ছিল, আজ চৌদ্দশ' বছর পরও তা তেমনি-ই মানবোপযোগী এবং কল্যাণকর। কেননা ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তি-স্তম্ভ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও অক্ষয়। এ থেকে একথাও জানা গেল যে, তা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্বদিকের ও সর্বকালের প্রয়োজন পূরণে পুরাপুরি সমর্থ। অতএব সর্বকালের মানুষের কর্তব্য–ইসলামী শরীয়াতকেই নিজেদের জন্যে একমাত্র সামাজিক-সামষ্টিক আইন ও বিধান রূপে গ্রহণ করা, তার সবগুলো শাখা-প্রশাখাকে বাস্তবায়িত করা, তাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সব রকমের সমস্যার সমাধানে তাকেই প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করা। কেননা এই বিধানই যে সর্বকালের মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবন সুষ্ঠুরূপে গড়তে সক্ষম, তা এই বিধান সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি লোকই স্বীকার করতে বাধ্য। আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে এ পর্যায়ে আরও অনেক কথা জানা যাবে।

(১) ইসলামী শরীয়াতই হল আল্লাহ্র নিকট থেকে বিশ্ব-মানবতার জন্যে আসা সর্বশেষ শরীয়াত। এ শরীয়াত নির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোন জাতির জন্যে, বিশেষ কোন কাল, যুগ বা শ্রেণীর জন্যে নয়। তা সর্বকালের, সর্বদেশের ও সর্ব জাতির এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্যে। এর রচয়িতা স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গুপ্ত (Exoteric and Esoteric) সর্ব বিষয়ে পুরামাত্রার জ্ঞানের অধিকারী; অতএব তাঁর রচিত শরীয়াত সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ, সঙ্গতিপূর্ণ। এতে নেই একবিন্দু একদেশদর্শীতা। আল্লাহ্ নিজে সর্ব প্রকার ভুল-ক্রটি, অসম্পূর্ণতা, পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ আকর্ষণ, স্বার্থপরতা ও নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই তাঁর তৈরী শরীয়াত-মানুষের বাস্তব জীবন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি সর্বোতভাবে ভুল-ক্রটিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী; তাঁর রচিত বিধান সর্বাবস্থায়ই মানুষের জন্যে অনুসরণীয় এবং প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। মানব রচিত বিধান এরূপ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের

www.amarboi.org

অধিকারী নয়-তা হতেও পারে না। মানব রচিত বিধানে যেরূপ মানবীয় ঝোঁক-প্রবণতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে, আল্লাহ্ রচিত বিধানে তেমন কিছু থাকতে পারে না।

ইসলামী শরীয়াতে যে আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে, তা মানুষের মনকে জাগ্রত ও সচেতন করে; হৃদয় ও মানসিকতাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে; সব কল্যাণকর কাজের প্রতি প্রবণতা জাগায়; কল্যাণকর ভাবধারার স্ফুরণ ঘটায়; অন্যায়ের প্রতিরোধ করে; কুস্বভাব ও অশ্লীল ভাবধারাকে দমন করে। মানব রচিত আইন-বিধানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তি ও দন্ডদানের বিভীষিকা সৃষ্টিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাতে মানুষকে ভেড়ার পালের মত শুধু চাবুকের ভয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। তাতে মানুষকে তার অনুকূলে গড়ে তুলতে এবং মনোলোকে চরিত্রের দীপ-শিখা জ্বালাতে চেষ্টা করা হয় না।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে, ইসলামী শরীয়াত মানুষের সর্বপ্রকার কাজের জন্যে দু ধরনের কর্মফল নির্দিষ্ট করেছে। তার একটি দুনিয়ায় প্রাপ্তব্য। তাতে বৈষয়িক উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করা হয়। আর অপরটি পরকালে প্রাপ্তব্য। তা একান্তভাবে পারকালের জন্যে নির্দিষ্ট এবং পরকালীন উপায়-উপকরণই তাতে প্রয়োগ করা হবে। মানব রচিত আইনের কর্মফল চূড়ান্তভাবে ইহকালীন, কেবলমাত্র ইহকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাতে পরকালকে স্বীকার করা হয়নি, স্বীকার করা হয়নি পরকালীন ফলাফলকেও।

ইসলামী শরীয়াত মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্মকে পরিণাম ফলের দৃষ্টিতে দুভাগে ভাগ করেছে। ভাল কাজ যে করবে, তার জন্যে সওয়াব নির্দিষ্ট এবং মন্দ ও পাপের কাজ যে করবে, তার জন্যে নির্দিষ্ট আযাব। কিন্তু মানবীয় আইন-বিধান কেবলমাত্র অন্যায় কাজের দরুণ শাস্তি নির্ধারণ করে; কেবল শাস্তি ও দন্ড দিয়েই পাপ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চায়। কিন্তু কেবলমাত্র আযাবের বা শাস্তির ভয় দেখিয়েই মানব মনকে কল্যাণময় কাজে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করা যেতে পারে না-যেতে পারে না কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতায় নামাতে। কেবলমাত্র আযাব ও শাস্তির ভয় দেখিয়েই মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টার মধ্যেই মানবীয় আইনের সমস্ত তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে। এমতাবস্থায় যদি কেউ অন্যায় ও পাপ করতে চায়ই এবং তার দণ্ড থেকেও বাঁচতে চায়, তাহলে সে অন্যায় ও পাপ করে আত্মগোপন করে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে না এমন নয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়াত কোন দেশে বা সমাজে কার্যকর হলে সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। এই রূপ সমাজের লোকদের হৃদয়-

www.amarboi.org

মনের সাথে স্থাপিত হয় শরীয়াতের গভীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক গড়ে উঠে আল্লাহ্‌র প্রতি খালেস ও একনিষ্ঠ ঈমানের উপর। আল্লাহ্ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে কাজ থেকে একজন মুমিন নিজ থেকেই বিরত থাকে এই ঈমানের তাকীদেই। আর তাঁকে লুকিয়ে কোন নাফরমানীর কাজ করা যায় না, নাফরমানীর কাজ করলেই তা আল্লাহ্ জানতে পারবেন-এই চেতনা তীব্রভাবে বর্তমান থাকে বলেই কোন ঈমানদার লোকের পক্ষে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তার সঙ্গে থাকে মৃত্যুপরবর্তীকালীন জবাবদিহীর চেতনা। কেননা সে সময় তার এ জীবনের যাবতীয় কাজের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে, আল্লাহ্ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করবেন এবং এতে কোন অন্যথা হতে পারবে না-মুমিনের এ ঈমানই সব রকমের পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার রক্ষাকবচ হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে এই চেতনা যে তীব্রভাবে জাগ্রত হতে পারে, তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। কাজেই মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সব কায়-কারবার চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না। আর জীবনব্যাপী কাজকর্ম কোনরূপ হিসাব-নিকাশ, যাচাই-বাছাই ও ফলাফল লাভ হতে বঞ্চিত থাকবে, সে কথা মেনে নেয়ারও কোন যুক্তি নেই। যে'লোক আল্লাহ্‌র বিধান শক্তভাবে ধারণ করেছে এবং পুরাপুরি তা পালন করেছে এবং আজীবন কল্যাণের পথে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তার এই সব ত্যাগ ও তিতীক্ষা কি নিষ্ফল যাবে? কিংবা যে লোক অন্যায় অনাচারের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে, সব রকমের হীন ও নীচ কাজ করেছে, মানুষের ধন-মাল, ইজ্জত-আবরু ও জান-প্রাণের উপর আঘাত হেনেছে, মানুষের অধিকার হরণ করেছে ও হক্ নষ্ট করেছে, সে লোকই কি সফল ও সার্থক হবে? ......অথবা এ দু'ধরনের লোক কি কোনক্রমেই একই পরিণতি লাভ করতে পারে? ......পারে সর্বদিক দিয়ে সমান হতে? যে শাসক অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়েছে, লালসা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাসত্ব করেছে, মানুষকে অকারণ কষ্ট দিয়েছে, তার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে নিতান্ত দাসানুদাসের মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে, সেকি সমান হতে পারে সেই শাসকের, যে সর্বাবস্থায় ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের দণ্ড শক্ত হাতে ধারণ করে রয়েছে, নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ চেয়েছে ও কল্যাণ সাধনে বাস্তবভাবে চেষ্টানুবর্তী হয়েছে, মানবতার মর্যাদা রক্ষায় পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? কক্ষণও নয়। এ দু'ধরনের লোক বা ব্যক্তি কখনও এক ও অভিন্ন পরিণতি লাভের অধিকারী হতে পারে না-না এ দুনিয়ায়, না পরকালে এবং না সার্বিকভাবে। প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার ব্যক্তি মর্যাদাবান মানুষ রূপে সর্বত্র স্বীকৃত ও সম্বর্ধিত

www.amarboi.org

হবে, পাবে তার উপযুক্ত সম্মান; সর্বত্রই সে সুবিচার ও শান্তি লাভের অধিকারী হবে—এই দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও। এটাই তো স্বাভাবিক এবং পুরাপুরিভাবে বিবেকসম্মত।

ইসলামী শরীয়াতে ইজতিহাদ করে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় শরীয়াতী বিধি-বিধান বিধিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শরীয়াত-বিশেষজ্ঞ লোকদের উপর। তাঁদের সে ইজতিহাদ চলবে শরীয়াতের ধরা-বাঁধা নিয়মে, কুরআন ও সুন্নাহ্র মৌল নীতি ও ভাবধারার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে। কিন্তু মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী যে আইন রচিত হয়, তাতে নির্বিশেষ মানব কল্যাণ মূল লক্ষ্য হয় না সাধারণতঃ; বরং তাতে শাসকদের নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক এবং তাতে অনেক সময় প্রকৃত ভুলকে যথার্থ বলে এবং প্রকৃত সত্য ও যাথার্থ্যকে 'ভুল' বলে গণ্য করে সংশোধন, সংবর্ধন ও পরিবর্তনের প্রচণ্ড কারসাজিও চলতে পারে-চলে থাকে অবাধে।

এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা (Comperative Study & Discussion) থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে অতি সহজেই পৌঁছতে পারি যে, ইসলামী শরীয়াত আল্লাহ্র নাজিল করা সর্বশেষ বিধান হিসাবে দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যাশী। একটি হল, আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন ও সে সম্পর্ককে যথার্থ ও গভীরতর করণ এবং দ্বিতীয়টি হল, মানুষের পরস্পরের মধ্যে সঠিক ও যথোপযুক্ত সম্পর্ক নির্ধারণ, স্থাপন ও সংগঠন। এর প্রথমটি হচ্ছে দ্বিতীয়টির ভিত্তি। কিন্তু মানব রচিত আইন ও বিধান মানুষের শুধু বৈষয়িক ও 'জাগতিক' বিষয়-ব্যাপারাদি সম্পন্ন করতে চায় মাত্র। ফলে তা কখনও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দিকটিতেই নিহিত রয়েছে পরকালীন জীবনের ব্যাপারটি। আর এখানেই হৃদয় ও মন-মানসিকতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্তমান। মনের লক্ষ্য ও ঝোঁক-প্রবণতার ব্যাপারটি এক্ষেত্রে মানদণ্ডের কাজ করে। শরীয়াতী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের বাহ্যিক জীবন; মানব রচিত আইনের বিচার ক্ষেত্রও অনুরূপ। নিয়্যাত ও মন-মানসিকতার জবাবদিহির ক্ষেত্র এ থেকে ভিন্নতর।

এ পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা এই যে, ইসলামী শরীয়াতের উৎস বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র ইল্‌ম এবং মানবতার প্রতি তাঁর নির্বিশেষ কল্যাণ কামনা। আর মানব রচিত আইন-বিধান কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির নিজস্ব অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত। এদুটি কখনই সমান ও অভিন্ন হতে পারে না-না মর্যাদার দিক দিয়ে, না পরিণতি ও ফলাফলের বিচারে।

www.amarboi.org

ইসলামী শরীয়াতের ইতিবৃত্ত

ইসলামী শরীয়াত সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত কোন জিনিস নয়। এর একটা অতীত রয়েছে, আছে একটা বিরাট ঐতিহ্য। এ পর্যায়ে আমরা সেই ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণে সচেষ্ট হতে চাই।

ইসলামী শরীয়াতের প্রথম উৎপত্তি কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে। সে কালের মেয়াদ কম-বেশী দেড় হাজার বছর। এর প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের জীবন কালব্যাপী। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন কাল। আর তৃতীয় হচ্ছে নিঃশর্ত অনুসরণ বা 'তাক্‌লীদ' এবং আধুনিক নবজাগৃতি।

প্রথম পর্যায়

রাসূলের যুগে ফিকাহ্

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)কে তাঁর রাসূল, বিশ্ব-মানবতার পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা রূপে মনোনীত করেন তাঁর জীবনের ৪০ বছরে উপনীত হওয়ার পর। এবং এসময় থেকেই ইসলামী ফিকাহ্‌র সূচনা। আর এযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে-মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রায় দশ বছর পর। ফলে এ যুগটির মোট সময়কাল হল কিঞ্চিদাধিক বাইশ বছর। এ যুগটি দু'ভাগে বিভক্তঃ

হিজরাত পূর্বকাল এর প্রথম ভাগ। মক্কা শরীফে রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি প্রথম অহী অবতীর্ণ হওয়া থেকে সূচিত হয়ে মদীনায় হিজরতের মুহূর্ত পর্যন্ত এ ভাগটি সীমিত। তখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজ পুরামাত্রায় গড়ে উঠেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রায় তেরটি বছর মোট এর সময়কাল। এই সময় কালে ইসলামী শরীয়াত বা ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নি। তখন পর্যন্ত তার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এই সময়টা ইসলামী দাওয়াত প্রচার, আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ এবং লোকদের চরিত্র ও নৈতিকতা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়েছে। এক কথায়, এই সময়টা জনগণের হৃদয়-মন ও মানসিকতাকে ইসলামী শরীয়াত গ্রহণ ও বাস্তবে অনুসরণের জন্য প্রস্তুতকরণ পর্ব। এই সময় ইসলামী শরীয়াত

www.amarboi.org

পর্যায়ে গণ্য হওয়ার মত কাজ খুব সামান্যই হয়েছে। নামায ও যাকাত এই সময়ই ফরয করা হয়; কিন্তু তার পূর্ণ রূপ ও প্রক্রিয়া অনির্ধারিত থেকে যায়। বছরের কয়েকটা দিন মাত্র রোযা রাখার প্রচলন হয় এবং তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর কাজ শুরু হয়ে যায়।

হিজরাত পরবর্তী কাল এর দ্বিতীয় ভাগ। মোট দশটি বছর এ ভাগের মেয়াদ। ইসলামী সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই সময়ই সূচিত হয়। তাই এই সময় শরীয়াত-ভিত্তিক নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনের প্রয়োজন দেখা দেয় তীব্রভাবে। এই কারণে এ সময়ই নবী করীম (স)-এর প্রতি কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আয়াতসমূহ নাজিল হতে শুরু করে। কখনও কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব স্বরূপ শরীয়াতী আইন সম্বলিত আয়াত নাজিল হত, কখনও কোন বিষয়ে জরুরী 'ফতোয়া' স্বরূপ অথবা কখনও আল্লাহ্‌র নিজের ইচ্ছানুক্রমে কোন বিধান নাজিল হত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর সত্যিকার বান্দাহ রূপে গড়ে তোলার জন্যে যখন কোন আইন-বিধান দেয়ার প্রয়োজন মনে করতেন কিংবা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এবং ইসলামী ব্যক্তি ও পরিবার গঠনের জন্যে কোন নির্দেশনার প্রয়োজন হত, তখন কুরআন মজীদের আয়াত নাজিল হত।

নবীযুগে ইসলামী শরীয়াতের উৎস

নবীযুগে ইসলামী শরীয়াতের একমাত্র উৎস ছিল আল্লাহ্‌র অহী, যা তিনি তাঁর প্রিয় ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাজিল করতেন। এই অহীর দু'টি রূপ ছিল। একটি রূপ ছিল শাব্দিক-মূল কথা ও বক্তব্য আল্লাহ্‌র নিজের দেয়া ভাষায় অবতীর্ণ হত। আর দ্বিতীয়টি ছিল তাত্ত্বিক বা ভাবমূলক। মূল কথা ও বক্তব্য হত একান্তভাবে আল্লাহ্‌র আর তার শব্দ ও ভাষা রাসূলে করীম (স)-এর নিজের। প্রথম প্রকার অহীর বাস্তব রূপ ত্রিশ পারা কুরআন মজীদ। হযরত মুহাম্মাদ (স) তা ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হযরত জিবরাইলের মাধ্যমে পেয়েছেন, ঠিক সেভাবেই-সেই রূপে, সেই কথা, শব্দ ও ভাষায়ই তিমি তা দুনিয়ার মানুষের নিকট পেশ করেছেন। আজকের দুনিয়ার মানুষের নিকট সেই জিনিস হুবহু সেভাবেই বর্তমান রয়েছে। তাতে একবিন্দু পরিমাণ তারতম্য কোথাও দেখা দেয়নি। এরূপ করার জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এ ভাষায়ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

www.amarboi.org

رِسَالَتَهٗ (المائده: ٦٧)

হে রাসূল, (লোকদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও তা যা তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে তোমার আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তুমি তাঁর রিসালতকে পৌঁছাবার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ রয়ে গেলে।

রাসূলের প্রতি যে কুরআন নাজিল হয়েছে তাতে রয়েছে সাধারণ মূলনীতি ও মোটামুটি ধরনের নিয়ম-কানুন। আর তা এমন প্রকৃতির যে, রাসূলই তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবেন এবং কোন্ আয়াত থেকে কি আদেশ বা নিষেধ জানা যায়, তা বিশদভাবে বলে দেবেন। এই দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হয়েছে। কুরআন মজীদেই বলা হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ*

(النحل: ٤٤)

এবং আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে বলবে লোকদেরকে যা তাদের জন্যে তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন তা গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলাই কুরআনের বিধান নাজিল করেছেন। এই নাজিল করার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর উপর অর্পিত হয়েছে। আর তাহল, আল্লাহ্‌র নাজিল করা মূল বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে লোকদের বুঝিয়ে দেয়া। লোকদের বুঝাবার প্রয়োজন হ'ল কেন? এজন্যে যে, কুরআন কোন কথাই সবিস্তারে ও খুঁটিনাটি সহ বলে না। কুরআনের প্রায় সব কথাই মোটামুটি ও মূলনীতি বিষয়ক, বিশেষত্বমূলক। রাসূল নিজে তো প্রয়োজন মত সব কথা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বলে দিবেনই; কিন্তু কেবল তাতেই স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সব কথা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যাবে, অতঃপর আর কোন কিছুই অস্পষ্ট বা অজানা থাকবে না এবং এ বিষয়ে আর কারো চিন্তা-গবেষণারও প্রয়োজন হবে না, এমন নয়; বরং এ আয়াতটির শেষ শব্দই বলে দিয়েছে যে, রাসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যারা শুনবে ও জানবে, তাদের এবং তাদের পরবর্তী লোকদেরও তথা সব মানুষেরই সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা-গবেষণা করার দায়িত্ব রয়েছে; তার প্রয়োজনও দেখা দেবে সর্বকালে, সর্বযুগে এবং প্রত্যেক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।

www.amarboi.org

রাসূলে করীম (স) কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার যে দায়িত্বটি পালন করবেন, তা একান্তভাবে আল্লাহ্র তরফ থেকেই তাঁর উপর অর্পিত। অতএব সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও মূল কুরআনেরই অনুরূপ আল্লাহ্র নিকট থেকেই আসা স্বাভাবিক—এসেছেও। রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র নিকট থেকে জেনে নেয়া এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কাজেই তার শব্দ ও ভাষা রাসূলের নিজের হলেও তার মূল কথা ও বক্তব্য বা মৌল ভাবধারা কুরআনের মতই আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ। এরই অপর নাম সুন্নাত। আর তা আমাদের নিকট রয়েছে হাদীস রূপে। এ জিনিসেরও আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী হয়ে আসার উদ্দেশ্য হল, কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও যেন আল্লাহ্র নিকট থেকেই পাওয়া হয় এবং রাসূল (স) যেন আল্লাহ্র বিধান তার আসল রূপে ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ-তাৎপর্য-ভাবধারা যথাযথভাবে বিশ্ব-মানবতার নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন; সক্ষম হন এমন পদ্ধতি, ভঙ্গী ও স্টাইলে যাতে করে লোকেরা খুব সহজেই তা বুঝতে, অনুধাবন ও হৃদয়ংগম করতে পারে। তাতে অনুসরণীয় যে আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধান রয়েছে তা যেন লোকদের নিকট স্পষ্ট ও ভাস্বর হয়ে উঠে এবং তা-ও মৌলিকভাবে আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা বলে তারা নিঃসন্দেহে প্রত্যয় লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ-মৌলিক ইবাদাতের এই পাঁচটি বিষয়ে শরীয়াতের বিধান বিবেচনা করলেই পূর্বোক্ত কথার যথার্থতা বুঝতে পারা যায়। এ সব ক'টি ইবাদাত সংক্রান্ত মৌলিক হুকুম ও বড় বড় কয়েকটি বিষয় ও ব্যাপার কুরআনেরই স্পষ্ট ঘোষণা। কিন্তু তা মোটামুটি ও অ-বিস্তৃত। নবী করীম (স) এর প্রত্যেকটিরই বিস্তারিত রূপ ও খুঁটিনাটি বিধি-বিধান ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মুখের কথার দ্বারা, তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন নিজের আমল ও কাজ দ্বারা। তাঁর ব্যাখ্যাটাও আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা। তাঁর আমলটাও আল্লাহ্র দেখান পদ্ধতিরই বাস্তব রূপ। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত বহু ঘটনা, ব্যাপার ও আদেশ-নিষেধও এই পর্যায়ে পড়ে। এসব ঘটনা, ব্যাপার ও আদেশ-নিষেধ এমন এজমালী যে, শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজন মত সে সবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারেন যে-কোন সময়, যে-কোন অবস্থায়। দুনিয়ায় নিত্যনব সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন-বিধানও সে সবের ভিত্তিতেই রচিত হতে পারে জনকল্যাণের দৃষ্টিতে। এর ফলে তা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির নিকটও তা পাবে পুরাপুরি স্বীকৃতি এবং তা থেকে তৈরী হবে চিরন্তন ও সাধারণ ইসলামী মূলনীতি।

www.amarboi.org

সত্যকথা এই, রাসূলে করীম (স)-এর জীবন কালে অহীর মাধ্যমেই সব হুকুম, আহকাম-আইন-বিধি ও রীতি-নীতি নাজিল হত। রাসূল নিজে যে সমস্যা বা প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতেন, আল্লাহ্ তা'আলা অহী পাঠিয়ে তার সমাধান করে দিতেন, প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দিতেন। ফলে তাঁর নিজের বেলায় শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে কোন অসুবিধাই দেখা দিত না। তিনি ছাড়া অন্যান্য লোক-সাহাবায়ে কিরামের বেলায় এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের গ্যারান্টিযুক্ত ব্যবস্থা ছিল বিশ্বনবীর অস্তিত্ব-জীবন ও উপস্থিতি। তিনি তাঁদের মাঝে সব সময়ই থাকতেন, তাঁদের কাছাকাছি অবস্থান করতেন, খুব সহজেই তাঁর সাক্ষাত পেতেন এবং যে কোন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে প্রয়োজনীয় যে-কোন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান তাঁরা জানতে পারতেন। ফলে অন্য কোন ভাবে বা উপায়ে শরীয়াতের বিধান জানবার তাঁদের কোন প্রয়োজন হত না। শরীয়াতের বিধান জানবার জন্যে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-গবেষণার কোন প্রয়োজনই হত না। ফলে এই সময় ফিকাহ্ শাস্ত্র তার আসল সংজ্ঞার রূপে বর্তমান ছিল না বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা ফিকাহ্র সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এ ভাষায়ঃ

هُوَ اِسْتِنْبَاطُ الْاَحْكَامِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

'ভিন্ন ভিন্ন ও মৌল দলীলের ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম-আদেশ-নিষেধ বা নিয়ম-নীতি—বের করাই হল ফিকাহ্।

এ অর্থে বা এই সংজ্ঞার দিক দিয়ে ফিকাহ্র কোন অস্তিত্ব রাসুলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় বর্তমান ছিল না। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রথমে দলীল বের করে তার ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করে শরীয়াতের রায় জানবার প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি। এরূপ কোন বিষয় থাকলেও তা ছিল বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নিকট অস্পষ্ট, অপ্রকাশিত। রাসূল-ই তাঁদের এ প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। আর রাসূল যে নিজ ইচ্ছা-বাসনা বা খেয়াল-খুশী মত কোন কথা বলতেন না, বলতেন না নিজস্বভাবে নিছক চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণার ভিত্তিতে, তা ছিল সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজনমান্য। শরীয়াত জানার জন্যে সাহাবাদেরও কোন চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ফলে ফিকাহ্ একটি স্বতন্ত্র ধরনের জ্ঞান-শাখা হিসাবে রাসূলের জীবনকালে দানা বেঁধে উঠেনি। এ যুগটি ছিল শরীয়াত জানার আসমানী ব্যবস্থা। তাই ইল্মে ফিকাহ্য় এ যুগটিকে বলা হয় عَصْرُ التَّشْرِيْعِ السَّمَاوِىْ। অন্য কথায়, চিন্তা-বিবেচনা ও ইজতিহাদ অ-নির্ভরশীল ফিকাহ্র যুগ ছিল এটা।

www.amarboi.org

তবে কোন সাহাবীই এযুগে ফিকাহ্ জানার জন্যে চিন্তা-ভাবনা বা ইজতিহাদ করেন নি, একথাটি সার্বিকভাবে সত্য নয়। যে সব সাহাবী রাসূলে করীম (স) থেকে দূরে অবস্থান করতেন, প্রয়োজন হলেই রাসূলের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়ার সুযোগ যাঁদের ছিল না, তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ্র জানা বিষয়ের ভিত্তিতে নবতর বিষয়ে-যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোন ঘোষণা তাঁদের জানা ছিল না-শরীয়াতের রায় জানবার জন্যে ইজতিহাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাও তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে করেননি-করেছেন রাসূলে করীম (স)-এর অনুমতিক্রমে, প্রয়োজনের তাগিদে। দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর ব্যাপারটি উল্লেখ্য। তাঁকে রাসূলে করীম (স) ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন। তাঁর যাওয়ার সময় রাসূলে করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি ভাবে শাসনকার্য চালাবে? বললেনঃ কুরআনের ভিত্তিতে। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাতে যদি কোন সিদ্ধান্ত না পাও? বললেন, তাহলে সুন্নাতের ভিত্তিতে। জিজ্ঞেস করলেন, সুন্নাতেও যদি কোন কিছু না পাও, তাহলে কি করবে? বললেনঃ اَجْتَهِدُ بِرَاْيِیْ আমি কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রেক্ষিতে চিন্তা-বিবেচনার সাহায্যে আমার মত নির্ধারণে প্রাণপন চেষ্টা চালাব। তখন রাসূলে করীম (স) শুধু এই ইজতিহাদের কথা সমর্থনই করেন নি, তাঁর এ সাহাবীর এই উক্তি শুনে সুগভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, সেই সঙ্গে আল্লাহ্র শোকরও করেছিলেন। সুদূর ইয়েমেনে থাকা অবস্থায় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করে তো আর শাসন কার্য চালান সম্ভব ছিল না। তাই এই ইজতিহাদ করার অনুমতি রাসূলে করীম (স) নিজেই তাঁকে দিয়েছিলেন এবং তিনি ইজতিহাদ করবেন শুনে অপরিসীম সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থিতিতে তাঁর সামনে বসেও-এবং তাঁর অনুমতিক্রমেই-কোন কোন সাহাবী ইজতিহাদ করেছেন। আসলে তা ছিল নিতান্তই খুঁটিনাটি ব্যাপারে ও বিষয়ে। তবে ফিকাহ্র দৃষ্টিতে 'ইজতিহাদ' যাকে বলা হয়, এ ক্ষেত্রে ঠিক তা ছিল না। এ ইজতিহাদকে বলা যায় একটি খুচরা ঘটনায় রাসূলের নিকট থেকে ফিকাহ্র রায় জানার পর অনুরূপ খুচরা ঘটনায় অনুরূপ রায় গ্রহণ। এটা অবশ্য কারো কারো মত। অন্য কেউ কেউ বলেছেনঃ তা ইজতিহাদ নয়, তা হল রাষ্ট্র ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে মত প্রকাশ করা মাত্র। সেক্ষেত্রে হালাল-হারাম প্রভৃতি শরীয়াতের ভিত্তিগত ব্যাপারে ইজতিহাদের কোন অবকাশ ছিল না। আর যেহেতু ফিকাহ্বিদদের চিন্তা-ভাবনা-বিবেচনা এবং

www.amarboi.org

তাঁদের ইজতিহাদের আসল ক্ষেত্র এটাই, তাই রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থিতিতে কেউ কিছু করে থাকলে তাকে ইজতিহাদ বলা যায় না।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ কথাও বলতে চাই যে, রাসূলে করীম (স) নিজেও এই ধরনের ফিক্হী ইজতিহাদ করেন নি; তিনি তাঁর জীবনে এ ধরনের প্রয়োজনের সম্মুখীন হননি কখনও। তবু তিনিও মাঝে-মধ্যে কখনও-সখনও সাধারণ অর্থে রাষ্ট্র ও যুদ্ধ পরিচালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ইজতিহাদ করেছেন। তাই খুঁটিনাটি ব্যাপারে-কোন কোন নিতান্ত খুচরা বিষয়ে-বাহ্যতঃ ও প্রকাশ্যত ফিক্হী ইজতিহাদ রাসূলে করীম (স)ও করেছেন বললেও নিতান্ত মিথ্যা বলা হবে না। যেমন একজন মহিলা তাঁর স্বামীর কোন কোন কাজের উল্লেখ করে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট তার শরীয়াতী রায় জিজ্ঞেস করল। বললঃ তার স্বামী তাকে বলেছেঃ

اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ

তুমি আমার নিকট আমার মার পিঠের মত।

জাহিলিয়াতের সময় আরবরা এ ধরনের কথাকে 'তালাক দান' বলে মনে করত। তারা মনে করত, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে এরূপ বাক্য বললে সে স্ত্রী তালাক হয়ে গেল। নবী করীম (স) এ কথা শুনে বললেনঃ

مَا اَرَاكِ اِلاَّ قَدْ حُرِّمْتِ عَلَيْهِ

আমার তো মনে হয়, তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ।

মেয়েলোকটি একথা শুনে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হল। সে আল্লাহ্‌র নিকট কান্না-কাটিও করল। তখন নবী করীম (স)-এর প্রতি অহী নাজিল হলঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ * اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ (المجادلة: ١-٢)

www.amarboi.org

যে মেয়েলোকটি তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করছিল তার কথা আল্লাহ্ শুনেছেন এবং তোমাদের দু'জনের পারস্পরিক কথাবার্তাও আল্লাহ্ তা'আলা শুনতে পেয়েছেন।......আল্লাহ্ তো সব শুনেন, সব দেখেন......। যে সব লোক তাদের স্ত্রীদের মা বলে সম্বোধন করে, তারা তাদের 'মা' হয়ে যায় না'.......।

এ আয়াত থেকে জানা গেল, স্ত্রীকে 'তুমি আমার মা'র পিঠের মত' বলাকে ফিকাহ্‌র পরিভাষায় 'জিহার' বলা হয়। আর জিহার-এ স্ত্রী তালাক ও হারাম হয়ে যায় না। এটি কাফ্‌ফারা-সাপেক্ষ একটা অপরাধ মাত্র। কাফ্‌ফারা হয় মাল দিয়ে আদায় করতে হয় নতুবা আদায় করতে হয় রোযা রেখে। তা করা হলেই 'জিহার' শেষ হয়ে যায়।

রাসূলে করীম (স)-এর এই ধরনের উক্তিকে যদি ফিক্‌হী পরিভাষা অনুযায়ী 'ইজতিহাদ' বলা হয়ও, তবু তা সেকালে শরীয়াতের উৎস রূপে গণ্য হয়নি, একালেও হতে পারে না। কেননা এরূপ ঘটনার দুটি অবস্থাঃ একটি হল রাসূলে করীম (স)-এর এ ধরনের উক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা হয় সমর্থন করেছেন ও তাকে বহাল রেখেছেন, না হয় তাকে বহাল রাখেন নি-সে কথাকে সমর্থনও করেন নি। যদি বহাল রেখে থাকেন, তাহলে সেই বিশেষ উক্তিটি নয়-আল্লাহ্‌র বহাল রাখা সংক্রান্ত ঘোষণাই হবে আইনের উৎস। আর যদি বহালই না রেখে থাকেন, তাহলে এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিপরীত ঘোষণার অহী নাজিল করেছেন, তা-ই হবে আইন প্রণয়ন ও শরীয়াতের উৎস। উত্তরকালে এ পর্যায়ে শরীয়াতের যে বিধানই নির্ধারিত হবে, অ অহীর সূত্র থেকেই উৎসারিত বলে মনে করতে হবে।

এই সব কারণে রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-কালকে 'ফিক্‌হী ইজতিহাদের যুগ' বলে মনে করা যায় না, সে নামে অভিহিতও করা চলে না। পারিভাষিক অর্থে তা ইসলামী ফিকাহ্‌র একটি অধ্যায় বা পর্যায় রূপেও গণ্য হতে পারে না।

কিন্তু ফিকাহ্‌র ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় এ অধ্যয় বা পর্যায়টির উল্লেখ অনিবার্য-অপরিহার্য। কেননা ফিকাহ্‌র কাঠামো গঠনের এটাই তো ভিত্তিকাল। এখান থেকেই তো ফিকাহ্‌র সূচনা। পরবর্তীকালে যে ইসলামী

www.amarboi.org

ফিকাহ্‌র উত্তুংগ প্রাসাদ রচিত হয়েছে, তার ভিত্তিমূলে রয়েছে এই যুগটির বিশেষ অবদান।

তা সত্ত্বেও বলতে হবে রাসূলে করীম (স)-এর যুগ কিংবা রাসূলে করীম (স)-এর অনুপস্থিতি স্থানে রাসূলে করীম (স)কে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে জানতে না পারার দরুণ যে 'ফিকাহ্'র চর্চা হয়েছে,তাকে বাস্তব অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে-তা সংঘটিত হওয়ার পর-সেই বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম কি তা জানবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করতে হবে। তার বাইরে ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে সে যুগে ফিকাহ্ শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন কাজ হয়নি, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

www.amarboi.org

সাহাবীদের যুগে ইসলামী ফিকাহ্

এ যুগটির সূচনা রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তিকাল মুহূর্তে এবং সমাপ্তি সর্বশেষে মৃত্যু বরণকারী সাহাবীর চির বিদায়ে। সম্ভবতঃ তা প্রথম হিজরী শতাব্দীর সর্বশেষ প্রান্ত অবধি বিস্তৃত। এই শতাব্দীতেই ইসলামী রাজ্য বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করে। সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও পারস্য এই সময়ই ইসলামের পাতাকাতলে এসে যায়। তার পরও মুসলমানদের বিজয়াভিযান ক্রমাগতঃ সমুখের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। মুসলমানদের জীবন এসময় বিপুল ও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ লাভ করে। তাঁদের উপর আসে নতুন নতুন দায়িত্ব। দেখা দেয় নিত্য-নতুন সমস্যা। জীবনের বহু নব দিগন্ত উদঘাটিত হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক নবতর প্রশ্ন দেখা দেয়। এভাবে আরব ও অনারব মুসলমানদের পারস্পরিক মিলন ঘটে। এদের মধ্যে বংশানুক্রমিকতাও চলতে শুরু করে। তখন এমন কিছু জটিলতা তাদের সমুখবর্তী হয়, যা ইতিপূর্বে তাঁদের সামনে কখনই আসেনি। লোকদের এমন সব আদত-অভ্যাস ও সামাজিক নিয়ম-প্রথা তাঁরা দেখতে পান , যার সাথে ইতিপূর্বে তাঁদের কোন পরিচয় ছিল না। আর সে কারণে মানুষের পারস্পরিক জীবন ও মুয়ামিলাত, ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ-সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অসংখ্য নতুন প্রশ্ন-নবতর সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

সেই সব সমস্যার সমাধান পেশ করা, সে সব প্রশ্নের জবাব দেয়া এবং সে সব ব্যাপারের মীমাংসা করার দায়িত্ব তখন স্বভাবতঃই সাহাবীদের উপর অর্পিত হয়। অথচ অবস্থা এই ছিল যে, কুরআন মজীদে কিংবা সুন্নাতে রাসূলের সেইসব সমস্যা, প্রশ্ন ও জটিলতা সম্পর্কে কোন পথনির্দেশই পাওয়া যাচ্ছিল না। এরূপ অবস্থায় ইজতিহাদ করা ছাড়া-শরীয়াতের অকাট্য স্পষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধানের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা করা ব্যতীত কোন উপায়ই তাঁদের ছিল না।

কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, খুলাফায়ে রাশেদূন এবং তাঁদের সমসাময়িক লোকজন ইজতিহাদের উপর খুব কমই আস্থাবান ছিলেন। কেননা তাতে করে তারা ভুল করার আশঙ্কা তীব্রভাবে বোধ করতেন। অবশ্য এতৎসত্ত্বেও সমস্ত বিশেষ ও সাধারণ বিষয়াদিতে ইজতিহাদ ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে। এই কাজে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌল আদর্শ ও ভাবধারাকে পুরাপুরি রক্ষা করেই কথা

www.amarboi.org

বলতেন। সেই সঙ্গে সাধারণ জন-মানুষের কল্যাণও তাঁদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হত। এক কথায়, ইসলামী নিয়ম-নীতির চতুঃসীমার মধ্যে থেকে মানুষের কল্যাণ-উদ্দেশ্যে তাঁরা নতুন সমস্যার সমাধান বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম বিশেষভাবে উদারতা ও বিদ্বেষহীনতার ভাবধারা পোষণ করতেন। এক সাহাবী ইজতিহাদ করে কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করে থাকলে অন্য সাহাবী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে মতভেদও দেখা দিত; কিন্তু সে মতভেদকে তাঁরা নেহাত মতের পার্থক্যই মনে করতেন। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ বাঁধাতেন না। তাঁরা মনে করতেন, কুরআন-সুন্নাহ্ পরিবেষ্টিত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ও ছোটখাট ব্যাপারে বিভিন্ন মত হওয়া-একেক জনের বিভিন্ন বা পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নয়। আর তা নিয়ে পরস্পর বিরোধ-বিসম্বাদ ও কোন্দলের সৃষ্টি হওয়া কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সাথে একটি লোক এসে সাক্ষাত করল। তার ছিল একটা সমস্যা। সে সমস্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে হযরত আলী (রা)র নিকট জিজ্ঞেস করে সে একটা সমাধান লাভ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটি সে বিষয়েই হযরত উমর ফারূক (র)-এর নিকটও জিজ্ঞেস করল। উমর ফারূক (রা) 'আমি হলে ব্যাপারটির ফয়সালা এভাবে করতাম' বলে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করলেন। লোকটি বললঃ আপনাকে কে নিষেধ করছে, ব্যাপার তো আপনারই হাতে? জবাবে হযরত উমর ফারূক বললেনঃ আমি যদি কুরআন কিংবা সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে তোমার ব্যাপারে ফয়সালা দিতে পারতাম, তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। তাই আমি বলছি, আমার নিজের মতের কথা। আর মত তো সবারই রয়েছে। আর দু'টি মতের মধ্যে ঠিক কোন্‌টি সর্বোতভাবে সত্য, নির্ভুল ও যথার্থ, তা আমি বলতে পারব না।

সাহাবীদের মধ্যে ফিকাহ্ সংক্রান্ত মতভেদের রূপ

পূর্বেই বলেছি, ফিকাহ্র খুঁটিনাটি মাসলায় সাহাবীদের পরস্পরে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। সে মতভেদকে ঠিক 'মতভেদ' না বলে বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছা বলাই সমীচীন। তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ মতভেদ হয়েছে কুরআনের আদেশ-নিষেধ (আহকাম) সম্পর্কিত আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবনে পার্থক্য হওয়ার কারণে। যেমন এ পর্যায়ে কোন আয়াতে যদি এমন একটা শব্দ থাকে যার দু'টি বা কয়েকটি অর্থ হতে পারে, তাহলে সেই শব্দের বিভিন্ন জন

www.amarboi.org

বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কুরআনের আয়াত ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ 'তিন কুরু'। কুরু শব্দটির সাধারণ ব্যবহারের দৃষ্টিতে দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি 'তুহর' আর দ্বিতীয়টি হায়য। ফলে কেউ আয়াতটির অর্থ বুঝেছেন তিন তুহর। আবার কোন কোন সাহাবী তার অর্থ করেছেন তিন হায়য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এ দুটি অর্থই সমানভাবে সত্য ও সঠিক। এর কোন অর্থকেই ভুল বা অযথার্থ বলা যেতে পারে না।

এমনও দেখা যায় যে, আয়াতে ব্যবহৃত কোন শব্দের একটি অর্থ হয় প্রত্যক্ষ এবং আর একটি অর্থ হতে পারে পরোক্ষ। আর সাধারণ ব্যবহারের দিক দিয়ে এ দু'টি অর্থই যথার্থ। যেমন اَبٌ এর প্রত্যক্ষ অর্থ পিতা বা বাপ, আর পরোক্ষ অর্থ দাদা, দাদার পিতা ইত্যাদি।

এই মত-পার্থক্য অনেক সময় সংঘটিত হয় হাদীস পাওয়া,সংরক্ষণ করা এবং তা বুঝার পার্থক্যের কারণে। অনেক সময় তা হয় মূল ইজতিহাদের কাজে এবং মত গ্রহণ ব্যাপদেশে।

সাহাবীদের মতে ইজতিহাদের তিনটি পর্যায় ছিলঃ

১. মূল দলীল-কুরআন বা হাদীস-বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা

২. দৃষ্টান্ত-সদৃশ ও প্রায় সমান ব্যাপার গুলোর সাথে তুলনা করা

৩. নিছক রায়-এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা।

'রায়' (رای) বলতে বুঝায় চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করে সঠিক মত কি হতে পারে তা সবদিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা। জানা সব ব্যাপারে চিন্তা-বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে একটা মত গঠন করা এবং শরীয়াতের মৌল ভাবধারার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। উত্তর কালে এই জিনিসকেই পরিভাষিক নাম দেয়া হয়েছেঃ اَلْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ এবং اَلْاِسْتِحْسَانُ -

সাহাবীদের যুগে ফিকাহ্র উৎস

সাহাবীদের যুগে নতুন কোন ঘটনা সামনে এলে ও সে বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানবার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদে অনুসন্ধান শুরু করতেন। তাতে স্পষ্ট কিছু না পেলে তাঁরা সন্ধান চালাতেন রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতে। এখানেও যদি তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত না পেতেন তাহলে তাঁরা দেখতেন, এ দু'টি উৎসে ঘটনার অনুরূপ বা সদৃশ কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা। যদি তেমন কিছু পাওয়া যেত, তাহলে তাঁরা সে জিনিসটির

www.amarboi.org

ভিত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত ব্যাপারে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত কি হতে পারে, তা 'কিয়াস' বা 'ধারণা' করতেন। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করতেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ্য় যে কারণে (علت) একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, অনুরূপ বা সদৃশ ঘটনায় সেই কারণটি আছে কিনা। যদি সে কারণ (علت) টি দেখা যেত, তাহলে নবতর ব্যাপার বা বিষয়েও তাঁরা সেই সিদ্ধান্তই আরোপ করতেন। আর তা-ও যদি তাঁরা না দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁরা একত্রিত হয়ে নবতর বিষয় বা ব্যাপার সম্পর্কে পরস্পরে পরামর্শ করতেন। সে পরামর্শেও তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্র মৌল ভাবধারাকে সব সময়ই হৃদয়ে জাগরূক রাখতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও তা কুরআন-সুন্নাহ্রে সামগ্রিক ব্যবস্থা, আদর্শ ও ভাবধারার বিপরীত হচ্ছে কি না, তা তাঁরা গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখতেন। এভাবে সর্বসম্মতিক্রমে যখন কোন সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছতেন, তখন তা-ই হত তাঁদের সর্বসম্মত মত—'ইজমা'। তখন তার বিরুদ্ধতা করার ইখতিয়ার হত না কারো। তাঁদের এই ইজ্মা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত ও গৃহীত সিদ্ধান্তের সমতুল্য বিবেচিত হত।

পরামর্শ করতে গিয়ে যদি তাঁদের মাঝে মতভেদ দেখা দিত, তখন তাঁদের প্রত্যেকেরই দলীল-প্রমাণ অন্যদের নিকট 'অধিকাংশের মত অনুযায়ী কাজ'-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন হত। কিন্তু তাকে 'ইজ্মা' মনে করা হত না কখনও। কেননা 'ইজমা' সকলেরই জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এখানে যেহেতু মতভেদ রয়েছে কাজেই প্রত্যেকেরই নিজস্ব দলীল-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্যে বাধ্যতামূলক হতে পারে না। নিজের নিজের দলীল-ভিত্তিক মতকে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। বস্তুতঃ এখান থেকেই সাহাবীদের সমাজে 'ফিক্হী ইখতিলাফ'—'ফিকাহ্-সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ'-এর উৎপত্তি। একই বিষয়ে ও ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও উক্তির গোড়ার কথা এটাই। পরবর্তীকালে ফিকাহ্বিদ্গণ সাহাবীদের এই 'একই বিষয়ে বিভিন্ন উক্তি'কে 'আসার' নামে বিশাল ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এই পটভূমিতে বলা যায়, সাহাবীদের যুগে ফিকাহ্র আরও দু'টি সুস্পষ্ট উৎস ছিল। তার একটি হল 'ইজমা' আর দ্বিতীয়টি 'রায়' বা কিয়াস- 'চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত মত'।

এই সময় ফিকাহ্র ময়দানে ইজতিহাদী কার্যক্রম যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সঙ্গে ফিকাহ্র কতিপয় উৎসও নির্দিষ্ট হয়। পূর্বে তো শুধু নতুন সংঘটিত ঘটনা, কিংবা সম্মুখে উপস্থিত বিষয় ও ব্যাপারেই শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা করা হত; বলতে গেলে, ফিকাহ্র যাবতীয় কার্যক্রম এরই মধ্যে

www.amarboi.org

সীমাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। কেননা এ সময় বহু রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপার সমুখে প্রকট হয়ে দেখা দেয়; বহু নবতর বিষয় বিচার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। মূল ইসলামী রাজ্যের সাথে বিজিত বহু অঞ্চল ও রাজ্য সংযোজিত হওয়ার কারণে বহু নতুন প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উপরন্তু ইতিপূর্বে ফিকাহ্‌র মৌল উৎস এমনভাবে সুসংকলিত হয়নি, যা লোকদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত, পঠিত ও পর্যালোচিত হতে পারত। এমনকি রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত-হাদীসও তখন পর্যন্ত সুসংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। তা না হওয়ার মূলে অবশ্য অনেক কারণই নিহিত ছিল। হাদীস সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদূনের অবলম্বিত বিশেষ সতর্কতা তার একটা কারণ। হাদীস বর্ণনা করার রীতিও তখন পর্যন্ত চালু হয়নি। উত্তরকালে-হযরত উমর ফারূক (স)-এর খিলাফত আমলের পরে সাহাবায়ে কিরাম মুসলিম জাহানের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যে সব স্থানে অবস্থান করতেন, তার বাইরেও বহু শহর, নগর ও জনবসতি অবস্থিত ছিল। সেই সব স্থানে নিত্য-নব সংঘটিত ঘটনা ও সমস্যাবলীর সঠিক মীমাংসা তাঁদেরই করতে হত। ফলে এসব ক্ষেত্রে সাহাবীগণকে নবী করীম (স)-এর সুন্নাত-তথা হাদীসের বর্ণনা প্রচার করতে হয়েছিল। এরই পরিণতিতে ফিকাহ্‌র একটা প্রধান স্তম্ভ লোকদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে বসে।

বিভিন্ন শহরে সাহাবীদের অবস্থান ও রাজনৈতিক মতবিরোধের উৎপত্তি এবং ফিকাহ্‌র উপর তার প্রভাব

পূর্বে যেমন বলেছি, ইসলামের বিজয় ও দেশ জয় ব্যাপকতর ও বিশালতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম ও আরব উপদ্বীপের সীমিত পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে মুসলিম জাহানের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। সেসব স্থানে তাঁদের বহু রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, বহু বিচার্য বিষয়ে 'রায়' দিতে হয়। এর ফলে কয়েকটি বিশেষ অবস্থা দেখা দেয়ঃ

(১) হাদীসের বর্ণনা ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সঙ্গে হাদীস জালকরণের কারসাজিও শুরু হয়ে যায়। হাদীসের অনেক অনারব বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করে। অনেক বর্ণনাকারী আবার রাসূলে করীম (স)-এর বক্তব্যের আসল-তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে। সেগুলো জাল হাদীস রূপে চালু হতে শরু করে।

(২) একই বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও ফতোয়া প্রচারিত হয়। অবশ্য তার মুলেও এটাই প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সেই বিষয়েই বিভিন্ন সাহাবীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছিল।

www.amarboi.org

(৩) সাহাবী ও শরীয়াতবিদদের বহু দূরে দূরে অবস্থান গ্রহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে সকলে মিলে এক সঙ্গে বসে ও পরস্পরে চিন্তার আদান-প্রদান করে একত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে তখন ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে ইজমা-সার্বিক ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়ার আর কোন উপায় থাকল না এবং অকাট্যতার শক্তিসম্পন্ন, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনমান্য শরীয়াতের কোন উৎস পাওয়া গেল না।

পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্যে এক প্রচণ্ড কালো বাতাস প্রবাহিত হয়। লোকদের মন-মানসিকতার স্থৈর্য ও আত্মার স্বস্তি চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত উস্‌মানের (রা) শাহাদাত বরণের পর হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠে। মুসলমানরা নিজেরা এক অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরই সুযোগে একদল লোক সাধারণ মুসলিম জনগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পথ ও মত গ্রহণ করে। প্রায় একই সময় 'শীয়া' নামে এক নতুন ফির্কার উদ্ভব হয়। অন্যদিকে হযরত আলী (রা) ও আমীর মুয়াবিয়ার পারস্পরিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খাওয়ারিজদের ফিত্‌না মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এর পর মুসলমান জনগণ টুক্‌রা-টুকরা হয়ে যায়, নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যেক দলের লক্ষ্য, তৎপরতা ও প্রবণতা পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ফিকাহ্‌-তথা ব্যবহারিক শাস্ত্রে নানা বিভিন্ন মত ও পথ সুচিত হয়। সেসব মত ও পথের মূলে ইজতিহাদের পূর্ণ শর্তাবলী পুরাপুরি রক্ষিত হতে পারে নি। অথচ এই ইজতিহাদই হচ্ছে সব রকমের লালসা-বাসনা ও বৈষয়িক স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সুস্থ নজরে শরীয়াতের 'রায়' জানার একমাত্র ভিত্তি বা উপায়।

এভাবে মুসলিম সমাজে দু'টি দলের উৎপত্তি হয়ঃ

(১) একদল লোক মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে মুসলিম ঐক্য শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মুসলিম শিবিরে সর্বাত্মক বিপর্যয়, ভাঙ্গন ও কলহ-কোন্দল সৃষ্টি করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং তারা এক্ষেত্রে বাহ্যত নিজেদের দ্বীনদারী ও আন্তরিকতাও প্রকাশ করত না।

(২) দ্বিতীয় দল কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনে সীমাহীন বাড়াবাড়ি ও আতিশয্যতা দেখাতে শরু করে এবং কুরআনের আয়াত এমন এক-একটা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করে, যা সুবিচার নীতির পরিপন্থী এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল দ্বীন-ইসলামের যে মধ্যম ভঙ্গীকে সত্যের মানদণ্ড ও বিচরণের কেন্দ্র রূপে নির্দিষ্ট করেছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.amarboi.org

সে যা-ই হোক, এসব কারণে ফিকাহ্ পারদর্শীদের পক্ষে এসময় তাঁদের দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করা-ফিক্হী হুকুম-আহ্কামকে সকল প্রকার সংমিশ্রণের আবিলতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রূপে পেশ করা-বড়ই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে ইল্‌মে ফিকাহ্ তার বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণকে নিয়ে একটি ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র পথে নিক্ষিপ্ত হয়। তখন তার পরিমণ্ডল ও বিষয়-বস্তুও ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর 'ইল্‌ম' বলতে বুঝাতে লাগল مَعْرِفَةُ النُّصُوصِ শরীয়াতের অকাট্য দলীল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ; যেমন 'ফিকাহ্' অর্থ দাঁড়ায়, সেসব অকাট্য দলীল থেকে শরীয়াতের হুকুম জানা ও বুঝাঃ

مَعْرِفَةُ الْاَحْكَامِ مِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ

এই সঙ্গে উল্লেখ্য, ইসলামী ফিকাহ্য় দুটি স্বতন্ত্র ধারার সূচনা এ সময়ই দেখা দেয়ঃ

(১) একটি ধারায় কেবলমাত্র 'রায়' (الرائ) (Personal opinion) ও ইজ্‌তিহাদের উপর পূর্ণ নির্ভরতা গ্রহণ করা হয় এবং হুকুম-আহ্কামের মৌল কারণ (علت)-এর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যাপকতা ও বিশালতা সৃষ্টির প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এ ধারার ধারকদের নাম-পরিচিতি হল اهل الرائ 'চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত মতের ধারক লোক।'

(২) আর দ্বিতীয় ধারায় কেবলমাত্র অকাট্য দলীলের উপরই নির্ভরশীলতা গ্রহণ করা হয়। অকাট্য দলীল যতটুকু বলে ঠিক ততটুকু বলা, তার অতিরিক্ত কোন মত প্রকাশ না করার নীতি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধারায় হুকুম-আহ্কামের মৌল কারণ নিয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা-বিবেচনা বা আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকাই হয় এই ধারার স্থায়ী নীতি। এ নীতি অবলম্বনকারীদের প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'আহ্লুল হাদীস' বা 'হাদীস অবলম্বন–অনুসরণকারী।

মূলতঃ এ দুটি ধারার সূচনা হয়েছিল এই যুগের প্রথম দিকেই। আর 'রায়' বা দলীল-ভিত্তিক চিন্তা-বিবেচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা হযরত উমর ফারূক (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে প্রচলিত হয়। তাঁরা শরীয়াতের দলীল প্রমাণের বাহ্যিক অর্থের উপর অবস্থান গ্রহণ না করে শরীয়াতের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মৌল ভাবধারা জানবার জন্যে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করার পক্ষপাতী। আর দ্বিতীয় ধারার সূচনায় রয়েছেন হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)

www.amarboi.org

প্রমুখ। তাঁরা শরীয়াতী দলীলের বাহ্যিক অর্থ ও তাৎপর্য পর্যন্ত অবস্থান গ্রহণের পক্ষপাতী, পদস্খলণ কিংবা ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কায় তাঁরা তা নিয়ে কোন গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা-বিবেচনা করতে প্রস্তুত নন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধারা দুটি উপরোল্লেখিত সাহাবীদের থেকেই মূলতঃ সূচিত হয়েছিল বললে পূর্ণ কথা বলা হয় না। এর সূচনা হয়েছে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) থেকে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই আমরা তার মূল উৎস ও সূত্রের সন্ধান পেতে পারি এবং বলতে পারি, সাহাবীদের স্বভাবগত গুণ-বৈশিষ্ট্য, মতি-গতি বা মন-মেজাজের পার্থক্যের কারণেই স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়-ইসলামী সমাজ জীবনের সেই প্রাথমিক কালেই-এই মত-পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল।

এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

রাসূলে করীম (স) খন্দক যুদ্ধ সমাপ্তির পর প্রত্যাবর্তন কালে সাহাবীদের সকলকেই নির্দেশ দিলেনঃ

لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ

বনু কুরাইজায় পৌছার পূর্বে তোমাদের কেউ আসরের নামায পড়বে না।

সাহাবীগণ অনতিবিলম্বেই বনু কুরাইজার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আসরের নামায উপস্থিত হল।

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيْ حَتّٰى نَاْتِيَهُمْ (بخارى)

তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেনঃ বনু কুরাইজায় না পৌছে আমরা আসরের নামায পড়ব না।

আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী

لَا نُصَلِّيْ اِلَّا حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ،

রাসূলে করীম (স) যেখানে গিয়ে নামায পড়তে বলেছেন, সেখানে না পৌছে আমরা আসর পড়ব না। তাতে নামাযের সময় যদি চলেও যায় তবুও।

অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেনঃ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ،

না, বরং আমরা এখন সময় মতই আসরের নামায পড়ে নেব।

www.amarboi.org

পরে এই ঘটনার বিবরণ নবী করীমের নিকট পেশ করা হল। কিন্তু

لَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ (بخاری، مسلم)

এ দুই শ্রেণীর বা মতের লোকদের কাউকেই তিনি এজন্যে ভর্ৎসনা করেন নি।

এ থেকে দেখা যায় রাসূলে করীম (স)-এর একটি সুস্পষ্ট আদেশের বাস্তব রূপায়ণ সাহাবীদের দ্বারাই দু'ভাবে হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে করীম (স)-এর কথার বাহ্যিক তাৎপর্য অনুযায়ী আমল করেছেন। ফলে আসরের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সময় মত নামায পড়েন নি। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাসূলে করীম (স) পড়তে নিষেধ করেছেন বলেই তা না পড়া উচিত। আর অপর লোকেরা বাহ্যিক তাৎপর্যে অবস্থান গ্রহণ না করে রাসূলের কথার গভীর ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য অনুধাবনের দিকে লক্ষ্য নিয়োজিত করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর এরূপ কথার উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরাইজায় পৌঁছা ত্বরান্বিতকরণ এবং পথে কিছু মাত্র অকারণ বিলম্ব না করা। তাই বলে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও তা পড়া হবে না, রাসূলে করীম (স)-এর উদ্দেশ্য তা নিশ্চয়ই ছিল না।

বর্ণনার শেষ বাক্য থেকে জানা গেল, একই সাহাবীদের দ্বারা রাসূলে করীম (স)-এর একই নির্দেশ দু'ভাবে-সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধীভাবে-পালিত হওয়া সত্ত্বেও কেউই শরীয়াতের সীমালংঘন করেন নি। ফলে তিনি কারো প্রতিই ভর্ৎসনা করার প্রয়োজন মনে করেন নি।

এ প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে বলা যায়, উপরোক্ত দুটি ধারাই রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় সূচিত হয়েছিল এবং দুটি ধারাই শরীয়াতসম্মত বলে রাসূলে করীম (স) কর্তৃক সমর্থিত। যাঁরা পথেই নামায পড়েছিলেন তাঁরা প্রথম ধারাটির প্রবর্তক। আর যারা বনু কুরাইজায় না পৌঁছা পর্যন্ত—নামাযের সময় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও—পড়েন নি, তারা দ্বিতীয় ধারার প্রতিষ্ঠাতা। এ দুটি ধারা এবং এ দুয়ের ধারকরা সমানভাবেই ইসলামের উদার ও বিশাল ধারার ধারক ও পথিক।

www.amarboi.org

ফিক্হী মাযহাব ও ফিকাহ্ সংকলন যুগ

রাসূলে করীম (স)-এর সর্বশেষ সাহাবী ইন্তেকাল করেন প্রথম হিজরী শতকের প্রায় শেষ ভাগে। আর এই সময়ই সূচিত হয় ফিক্হী মাযহাব গঠন ও ফিকাহ্ সংকলনের যুগ। হিজরী চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময় এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময় আব্বাসী খিলাফতের শক্তি ও প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। শরীয়াতের আইন প্রণয়নে সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে পারে এমন শক্তি বা অবস্থাও তার তখন ছিল না। বিশেষতঃ একারণে যে, এ সময় ফিকাহ্ পারদর্শীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ফলে এসময়কার জনতা ইজতিহাদ-শক্তির তৎপরতা-নিঃসৃত নিত্যনব সমস্যার নতুনতর সমাধান-আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে 'তাক্লীদ' বা অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যেতে বাধ্য হল।

এই সময় নানা দলীয় মাযহাব দান বেঁধে উঠে। সর্বোপরি চারটি প্রধান মাযহাব এসময়ই গড়ে উঠে ও সমগ্র মুসলিম জাহানে ব্যাপক প্রচার ও বিস্তার লাভ করে। অতঃপর বিভিন্ন যুগে সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতা প্রধানতঃ সে চারটি মযহাবেরই অনুসরণ করতে থাকে নিশ্চিন্তে, নির্বিচারে। অবশ্য একালের মুসলিম নরপতিরা ও প্রশাসকরাও ফিকাহ্বিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রচুর শক্তিবর্ধন করেন। এর ফলে ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ, মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়। অপরদিকে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফিকাহ্-সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে এবং ফিকাহ্র মনগড়া প্রসাদ আকাশ-ছোঁয়া পরিমাণ উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা উৎসও যথেষ্ট স্ফুরিত হয় এবং ফিকাহ্র প্রবৃদ্ধি ও তার ক্ষেত্র প্রসারে বিপুলভাবে সহায়তা করে।

কুরআন মজীদ ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত গ্রন্থাবদ্ধ হয়ে সাধারণ জনমানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফিকাহ্ সংক্রান্ত মত ও তাঁদের প্রদত্ত ফতোয়াসমূহ সংকলিত হওয়াও এ যুগেরই এক বিশেষ অবদান। এরপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি সংকলন- تَدْوِيْنُ عِلْمِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ। এ কাজটি এই সময়ই সম্পন্ন হয়। ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা ও শরীয়াতের সিদ্ধান্ত বের করার প্রতিভা প্রবৃদ্ধি এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে ইজতিহাদী দৃষ্টি প্রখরতা লাভের সহযোগী ও পরিপূরক জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ এ কালেই ব্যাপক রূপ

www.amarboi.org

পরিগ্রহ করে। এ পর্যায়ের জ্ঞান দু'ধরনের। এক ধরণের জ্ঞান, ফিকাহ্‌র সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। যেমন কুরআনের তাফসীর এবং বিতর্ক শাস্ত্রের জ্ঞান। আর দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান, ফিকাহ্‌র সঙ্গে যার পরোক্ষ সম্পর্ক। যেমন আরবী অভিধান ও ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অনুবাদের মাধ্যমে পাওয়া বিশ্ব-প্রকৃতি সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান।

ফিক্‌হী মাযহাব গঠনের কার্যকারণঃ

রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় 'শরীয়াতী আহকাম'-এর সংজ্ঞায় কোনরূপ মত-পার্থক্য ছিল না। কেননা রাসূলে করীম (স) নিজেই ছিলেন শরীয়াতের উৎস। আর তা-ও এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অহী তাঁর উপরই অবতীর্ণ হত। রাসূলে করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর সাহাবীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত-পার্থক্য দেখা দেয় বটে; কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বিষয়গুলোও ছিল আংগুলে গোণার মত। নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর কে খলীফা হওয়ার বেশী অধিকারী, মুর্তাদ হয়ে যাওয়া লোকদের হত্যা করা হবে কি না, যাকাত দিতে অস্বীকার কারীদের সাথে কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত এবং আরও কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার এ পর্যায়ে উল্লেখ্য। এই সব বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন ফিক্‌হী মত গ্রহণের পক্ষে সাহায্যকারী কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য তখন প্রতিটি ব্যক্তির করায়ত্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও সাহাবীদের এই সীমিত মত-পার্থক্যই উত্তরকালে-আব্বাসী শাসন আমলে ফিকাহ্‌র বিশাল ও বৃহত্তর বিশাল ক্ষেত্রের মত-বিরোধের বীজ হয়ে দেখা দিল। পরবর্তী সময়ে ফিকাহ্‌র গুরুত্ব যখন বৃদ্ধি পেল এবং হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও বর্ণনা শুরু হল, তখন লোকদের মন-মানসিকতায় দলগত ও গোষ্ঠিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল হয়ে দেখা দিল। বস্তুতঃ এ সময়ই শুরু হয় বিভিন্ন ফিক্‌হী মায্‌হাবের উৎপত্তি ও আত্মপ্রকাশের সূচনা। মুসলমানদের ব্যাপক দেশ বিজয়, ফিকাহ্‌বিদদের ঝোঁক-প্রবণতা ও মাসলা বের করার পদ্ধতি ও কৌশলগত পরিবেশের পার্থক্য এইসব মাযহাব রচনার মূলে ইন্ধন জোগাণ। আর তারই পরিণতিতে ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মাযহাব (school) গড়ে উঠা সম্ভব হল।

বিভিন্ন ফিক্‌হী মায্‌হাবের মধ্যে কতকগুলো ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাতে অন্য কারো মত সংমিশ্রিত হয়নি। কয়েকজন সাহাবী, কয়েকজন তাবেয়ী এবং তাঁদের পরবর্তী কয়েকজন ফিকাহ্‌বিদ নানা বিষয়ে যেসব নিজ নিজ মত ও রায় এবং নিজ নিজ বক্তব্য স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করেছেন, তা-ই এই ব্যক্তিগত ফিক্‌হী মাযহাব পর্যায়ে উল্লেখ্য। উত্তরকালের এসব ব্যক্তিদের মধ্যে সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওজায়ী ও লাইস

www.amarboi.org

উল্লেখ্য। আর যাঁদের মত ও রায় মুখস্থভাবে সংরক্ষিত ও বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা হলেন ইবনে আবু লাইলা ও ইবনে শুবরুমাতা।

ফিকাহ্র কয়েকটি বড় বড় দলগত বা গোষ্ঠিগত মাযহাব রয়েছে। তাতে সেই মায্হাবের ইমাম এবং তাঁর সঙ্গী ও অনুসারীদের অভিমত একই গ্রন্থ-সমষ্টিতে এক সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেই মাযহাবটি সংশ্লিষ্ট ইমামের নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও তাতে কেবল সেই ইমামেরই মতের উল্লেখ করা হয় নি, তাঁর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতেরও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিপরীত মতেরও উল্লেখ হয়। অবশ্য তাঁদের সকলেরই ইজতিহাদ সেই মূল ইমামেরই কায়েম করা মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে হয়েছে। এই পর্যায়ে চারটি মায্হাবের নাম উল্লেখ্য। তা হল, মালেকী, হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব। এ ছাড়া আরও কয়েকটি মাযহাব রয়েছে, তার উল্লেখ পরে করা যাবে।

সত্যিকথা হল, এই মাযহাব চতুষ্টয়ই দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে ফিকাহ্র এক বিরাট সম্পদ রেখে গেছে। শরীয়াতের ইতিহাসে এ চারটি মায্হাবের অবদান চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে-যেমন পূর্বে বলেছি-ফিকাহ্বিদদের পারস্পরিক যাবতীয় মতভেদ দুটি স্বতন্ত্র ধারা-সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত। একটি ধারা নিছক হাদীস ও আস্র-(সাহাবীদের উক্তি, মত, ফতোয়া)-এর উপর নির্ভরশীল। তাতে মূল দলীলের বাহ্যিক অর্থের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, তার গভীরতায় পৌঁছে মৌল কারণ (علت) সন্ধান করা হয় না। এ ধারাটির নাম দেয়া হয়েছে 'হাদীসবাদী চিন্তা-পথ' বা مَدْرَسَةُ الْحَدِيْث (school of Tradition)। আর দ্বিতীয় ধারাটি দলীলের বাহ্যার্থের উপর নির্ভরতা গ্রহণে অ-রাজী। তাতে তার গভীর তলদেশে নেমে শরীয়াতের মৌল দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আসল কারণ সন্ধান করা হয়-ডুবুরীরা যেমন করে সমুদ্রের গভীর তলদেশে নেমে মুক্তা আহরণ করে। অতঃপর যে 'মুক্তা'টি লাভ করা হয়, তা অনেক সময় দলীলের বাহ্যার্থ থেকে ব্যতিক্রম বা ভিন্নতর হয়ে পড়ে। কিন্তু তা গ্রহণে কোন দ্বিধা করা হয় না। ফিকাহ্র ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিকোণ্কে বলা হয় مَدْرَسَةُ الرَّاى 'গভীর চিন্তা-বিবেচনার পর মত গ্রহণ-ধারা'।

আহ্লুল হাদীস ধারা

ফিকাহ্ শাস্ত্রে চিন্তা ও মতের এই ধারাটি প্রথমে হিজাজ অঞ্চলেই দানা বেঁধে উঠে। একথা সর্বজনবিদিত যে, হিজাজের লোকেরাই নবী করীম (স)-এর হাদীস অন্যদের তুলনায় বেশী শুনতে পেয়েছে, তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে

www.amarboi.org

তারাই অধিক অবহিত। হিজাজের মদীনা শহরই ছিল হাদীসের উৎপত্তি ও লালন কেন্দ্র। ফিকাহ্‌বিদদেরও আশ্রয়স্থল এই মদীনাই। এখানেই সর্বপ্রথম ইসলামী সমাজ গঠিত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলে করীম (স) হিজরাত-পূর্ব তেরটি বছর বাদে নবুয়্যাতী জীবনের অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত সময়ই মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে শরীয়াতের বিধি-বিধানসম্বলিত অহী গ্রহণ করেছেন। জনগণের ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রে তা অনুসরণ ও রূপায়নের উদ্দেশ্যে এখানেই তিনি সর্বপ্রথম প্রচার কার্যও চালিয়েছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পরও ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই মদীনা নগরেই বহাল রয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর খলীফা এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এখানেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

সাহাবীদের পর তাবেয়ীদের যুগ সূচিত হলে মদীনায় হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রা) এই মতের প্রধান ধারক হয়ে দাঁড়ান। হিজাজ ও হিজাজের বাহিরের বহু ফিকাহ্‌বিদ তাঁরই নিকট থেকে এই ধারার ফিকাহ্ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে এঁদের মধ্য থেকে বহু লোক বিশাল ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের এ বিদেশ-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন সব হাদীস সংগ্রহ করা যা মদীনার লোকেরা বর্ণনা করতেন না, বর্ণনা করতেন মদীনার বাইরের মুহাদ্দিসগণ। অনেক সাহাবী আবার দেশ বিজয়ের কারণে কিংবা প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে মদীনার বাইরে বিভিন্ন স্থানে ও শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁরা এককভাবে বহু হাদীস বর্ণনা করতেন, যা মদীনাবাসীদের হয় শ্রুতিগোচর হয়নি কিংবা তাঁরা তা বর্ণনা করতেন না। এঁদের অনেকে ইরাক গমন করলেন, অনেকে গেলেন সিরিয়া ও মিশর। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল এই ধরণের হাদীস সংগ্রহ করা।

ফিকাহ্‌র এই ধারার হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেবই একমাত্র ধারক ছিলেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর পুত্র সালেমও এই ধারার ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। তিনি নিজস্ব মতের ভিত্তিতে কোন ফতোয়া দিতে কখনই প্রস্তুত হতেন না। যে বিষয়ে তিনি কোন হাদীস শুনতে পান নি, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অকপটে বলতেনঃ

لَا أَدْرِىْ لَعَلِّىْ إِنْ أَخْبَرْتُكَ بِرَائِىْ ثُمَّ تَذْهَبُ فَأَرَى بَعْدَ ذٰلِكَ رَأْيًا غَيْرَهُ فَلَا أَجِدُكَ فَمَا ذَا يَكُوْنُ؟

আমি জানি না। সম্ভবতঃ আমি আমার নিজস্ব চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে তোমাকে কোন মত বলতে পারি। কিন্তু সমস্যা হল, আমি যদি আমার

www.amarboi.org

নিজের কোন মত তোমাকে বলে দেই, সে মত শুনে তুমি চলে গেলে। কিন্তু পরে যদি আমার মত বদলে যায়, নতুন কোন মত গড়ে উঠে আর তখন তোমাকে না পাই-তোমাকে তা বলতে না পারি, তাহলে তখন কি অবস্থা হবে?

উত্তরকালে ফিকাহ্‌র এই ধারাটি শুধু মদীনা বা হিজাজের ফকীহ্‌দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ ধারার অনুসারী ও নিশানবর্দাররা ইসলামী রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। আমের শাবী ছিলেন তাবেয়ী এবং কূফাবাসী এই ধারার একজন ফিকাহ্‌বিদ। তিনি নিজস্ব মতের ভিত্তিতে শরীয়াতের ব্যাপারে কিছু বলতে প্রস্তুত ছিলেন না। হাদীস বা সাহাবীদের কোন উক্তি, মত বা ফতোয়া পেলে তার উপরই তিনি অবস্থান করতেন। সুফিয়ান সওরী একজন তাবে-তাবেয়ীন। তিনি কূফা নগরের নামকরা ফিকাহ্‌বিদদের অন্যতম। তিনি নিজস্ব মতের ভিত্তিতে শরীয়াতী বিষয়ে রায় দেয়া থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম আওজায়ী শাম-সিরীয়ার প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ। ইয়াজিদ ইবনে হুবাইব মিশরীয় ফকীহ্। তাঁর ছাত্র লাইস ইবনে সায়াদ একক মাযহাবের একজন ফিকাহবিদ। ইমাম মালিক (র) মদীনায় একটি প্রখ্যাত দল-ভিত্তিক মায্‌হাবের ইমাম ছিলেন। তিনি কূফা নগরে গড়ে উঠা দল-ভিত্তিক হানাফী মাযহাবের সম-সাময়িক ছিলেন। এঁদের পরে এসেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদ জাহেরী। ইমাম মালিক ফিকাহ্‌র একটি দল-ভিত্তিক ধারার প্রখ্যাত ও দায়িত্বশীল উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী তাঁর নিকট থেকেই ফিকাহ্ গ্রহণ করেছেন আর ইমাম শাফেয়ীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনে হাম্বল। তবে দাউদ জাহেরী ও ইবনে হাম্বল হাদীস ও সাহাবীদের মত বা উক্তির উপর অবস্থান গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁদের থেকে অনেক দূরে এবং চিন্তা-বিবেচনা-ভিত্তিক মত প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁরা অনেক দূরে। ইবনে কুতাইবাহ্ ফিকাহ্‌র ইতিহাসে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীকে ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে চিন্তা-বিবেচনা ভিত্তিক ফিকাহ্‌র গোত্রভুক্ত রূপে উল্লেখ করেছেন। অথচ শাহ্‌রিস্তানী তাঁর আল মিলাল অন্-নাহল (اَلْمِلَلُ وَالنِّحَلُ) গ্রন্থে তাঁদেরকে হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্‌বিদ বা মুহাদ্দিস-ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন। পরে আল্লামা ইবনে খালেদুন তা-ই করেছেন।

আহলুল-হাদীসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

এই ধারার ফিকাহ্‌বিদগণ শরীয়াতের অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের উপর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে হিজাজ অঞ্চলের লোকদের এটাই ছিল ফিকাহ্ নীতি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাঁদের বসবাসই ছিল হাদীসের উৎপত্তি

www.amarboi.org

কেন্দ্রে এবং হাদীসের বিপুল ও বিরাট সম্পদ তাঁদের নিকট বর্তমান ছিল। উপরন্তু হাদীসের সাথে তাঁদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর ও তীব্র। আল্লাহ্‌র হুকুম যে কি, তা জানবার ব্যাপারে ভুল ও পদস্খলন হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা নিজস্ব চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত মত (رأى) গ্রহণ থেকে বিশেষ সতর্কতার সাথেই দূরে সরে থাকতেন। এ নীতিতে তাঁদের দৃঢ় অবিচল হয়ে থাকার আরও কারণ এই ছিল যে, রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম যে পরিবেশ-পরিস্থিতি রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের সময়ও ঠিক তা-ই অপরিবর্তিত ছিল। ফলে নিত্য-নব সংঘটিত ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি বা তাঁদের সামনে এমন কোন নতুন সমস্যা দেখা দেয়নি, পূর্বে গত হয়ে যাওয়া সময়ের পৃষ্ঠায় যার কোন স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না। এ কারণে কোন বিষয়ে নতুন করে ও স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন দাবিই তাঁদের সামনে আসেনি কখনও। কিন্তু হিজাজ এলাকার বাইরে, মুসলিম জাহানের অন্যান্য স্থানে এরূপ অবস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও এসব অঞ্চলের লোকেরা নীতি ও আকীদাগত কারণেই 'চিন্তা-বিবেচনা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ' (رَأْى) থেকে সাধারণতঃ দূরে থাকতেন। তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে, এ পথ গ্রহণ করা হলে ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা বা মানুষের ইচ্ছা-বাসনারই অনুসরণ করা হবে এবং তার ফলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে এমন জিনিস শামিল করা হবে, যা মূলতঃই তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই ধারার ফিকাহবিদদের শরীয়াতী হুকুম বা সিদ্ধান্ত জানার মোটামুটি পদ্ধতি এই ছিল যে, কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ব্যাপার তাঁদের সামনে এলে তা প্রথমেই তাঁরা আল্লাহ্‌র কিতাবের নিকট পেশ করতেন। অর্থাৎ সেই বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কিনা, তা খুঁজে দেখতেন। তা না পেলে পরে হাদীস বা সুন্নাতে রাসূলে তার সন্ধান করতেন। এ পর্যায়ে এসে তাঁরা যদি পরস্পর-বিরোধী হাদীস পেতেন, তাহলে হাদীসের সনদ ও বর্ণনাকারীদের যাচাই-পরখের ভিত্তিতে কোন একটি হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং পরে তারই সিদ্ধান্তকে শরীয়াতের ঘোষণা রূপে গ্রহণ করতেন। অথবা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কিংবা কোন ফতোয়া দেয়া থেকেই তাঁরা বিরত থাকতেন। অবস্থার এই তারতম্য হত হাদীসের মর্যাদা যাচাই ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের যোগ্যতার পার্থক্যের কারণে। এজন্যে তাঁরা অবাস্তব ও মনগড়া কিংবা কাল্পনিক ফিকাহ্ রচনা এবং যে ঘটনা ঘটেনি সে বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাকে তাঁরা কিছুমাত্র পছন্দ করতেন না। কেননা এক্ষেত্রে একটা-না-একটা ফতোয়া দিতেই হয় এবং তা করতে হয় নিজস্ব চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে। কাল্পনিক বিষয়ে তো আর কুরআন-হাদীসের দলীল পাওয়া যেতে পারে না।

www.amarboi.org

হাদীস ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে এ নীতির অবদান

ফিকাহ্‌র এই ধারার লোকদের প্রধান নির্ভরতা ছিল হাদীস ও আস্‌র-এর উপর। এ কারণে তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাঁদের বিরাট অবদান রয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মন-মেজাজের লোকদের সমন্বয়ে গড়া তৎকালীন নব্য মুসলিম সমাজে এমন কিছু লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যারা শরীয়াতের প্রতি যথার্থ ঈমান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা লাভ করেনি। তারা নিজেদের ইমামের বিশেষ মতের সমর্থনে কোন কোন হাদীসের ভাষা ও বর্ণনায় ইচ্ছেমত রদবদল (تحريف) করতেও একবিন্দু দ্বিধা বোধ করত না; বরং একাজে তারা খুব বেশী দুঃসাহসী হয়ে গিয়েছিল। এই লোকদের সংখ্যা ও তৎপরতা অবশ্য হিজাজের তুলনায় ইরাক অঞ্চলেই বেশী ছিল। সেখানে বিভিন্ন মত ও চিন্তার আন্দোলনও ছিল বিভিন্ন ধরণের। এখানেই প্রথম শী'য়া দলের আবির্ভাব ও উৎপত্তি ঘটে।[১] পরবর্তীকালে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পারস্পরিক যুদ্ধ পরিসমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তারা 'খাওয়ারিজ' নামে অভিহিত হতে থাকল।[২] তারা সুন্নাতের নামে কতকগুলো মনগড়া আকীদা ও কাজের রেওয়াজ দিতে চেষ্টা করে মুসলিম সমাজে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জিন্দীক্ব-নাস্তিকও ইসলামী শরীয়াতকে বিপর্যস্ত করতে এবং তার প্রতি লোকদের মনে প্রবল সন্দেহ জাগাবার অপচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে তারা সুন্নাতে রাসূল বা হাদীসের প্রতি লোকদের মনে এই বলে সংশয় জাগানোর অভিযান চালায় যে, হাদীস ও সুন্নাত রাসূলে করীম(স)-এর অনেক পরে লিখিত ও সংকলিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় তা লোকদের মুখে মুখে বর্ণিত ও প্রচারিত হতে থাকে। ফলে তা জানতে ও চিনতে এবং তা আয়ত্ত করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তারতম্য ও পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

---

১. প্রকৃত শীয়া মতের সূচনা হয় নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পরে পরেই। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর এই মত অধিক তীব্রতা লাভ করে। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে এমন এক দল লোকের উৎপত্তি হল যারা মনে করত, হযরত আলী (রা)-ই খিলাফত লাভের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় সর্বাধিক অধিকারী। তাঁকে তারা 'আল্লাহ্‌র মনোনীত' (وصى الله) বলে অভিহিত করতে লাগল। তারা বলতে শুরু করল, প্রত্যেক খলীফারই কর্তব্য তারপরে কে খলীফা হবে তাকে মনোনীত করা। আর এ মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই মাসূম (معصوم) হতে হবে। معصوم ছাড়া মনোনীত ব্যক্তি কেউ হতে পারে না। 'মাসূম' মানে ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ্-পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র, সংরক্ষিত। এর পরে এমতের বহু শাখা-প্রশাখা গজাতে থাকে এবং এ ফির্কাহর অনুসারী লোকেরা শতধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। মোটকথা, 'শী'য়া ফির্কাহর' উৎপত্তি ঘটে হযরত আলী (রা)-কে কেন্দ্র করে। এতে রয়েছে নানা জনের নানা মত। কয়েকটি বড় বড় ফির্কাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেয়া যাচ্ছেঃ

(পরের পৃঃ দেখুন)

www.amarboi.org

কিন্তু এসব লোকের অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। মূল শরীয়াত ও ফিকাহ্‌য় কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা প্রকৃত ফিকাহ্‌বিদগণ এই সময় পূর্ণ দক্ষতার সাথে সহীহ হাদীস ও অ-সহীহ্ হাদীসের মধ্যে চুলচেরা বিচারের মাধ্যমে স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যি কথা এই যে, কুচক্রীদের হাদীস জালকরণ প্রচেষ্টা যতই তীব্র হয়েছে, ফিকাহবিদদের সতর্কতার হাতিয়ার ততই তীক্ষ্ম ও শানিত হয়েছে। তাঁরা প্রয়োজন মাত্রায় সজাগ ও উৎকর্ণ হয়েছিলেন। আর এ জিনিসই বহু একনিষ্ঠ লোককে সহীহতম হাদীসসমূহ খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখনও হাদীস গ্রন্থসমূহে সনদের দিক দিয়ে

(পূর্ব পৃঃ পর)

(ক) 'জায়দীয়া'-এদের বিশ্বাস, আলী ইবনে হুসাইনের পুত্র জায়দই খিলাফত পাওয়ার অধিকারী। শী'য়া মতের বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে এদের ফিক্‌হী মত আহলি সুন্নাত ও আহলি রায় ফিকহী মতের অনেক নিকটবর্তী। কাসেম আর-রসীর পৌত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল হুসাইন ২৮৮ হিঃ সনে ইয়ামানে 'কওমাতুজ্ জায়দীয়া' অর্থাৎ 'জায়দীয়া আস্তানা' নির্মাণ করেন।

(খ) আল-জা'ফরীয়া'-শী'য়া মতের যতগুলো ফির্কা আছে তন্মধ্যে এটাই বড়। এদের ধর্মমতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এরা নির্দিষ্টভাবে বারোজন ইমামে বিশ্বাসী, তার প্রথম ইমাম হলেন হযরত আলী (রা) নিজে আর তাদের সর্বশেষ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী, যাঁর প্রতীক্ষা এখনও করা হচ্ছে। ফিকাহী মস্‌লা-মাসায়েলের অনেক ব্যাপারেই তারা অন্যান্যদের সাথে একমত হলেও মুজতাহিদদের ইজমা'র গুরুত্ব স্বীকারের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। কেননা এ জিনিসকে তারা শরীয়াতী আইনের উৎস (source) বলে মানতে রাযী নয়। 'কিয়াস'কেও তারা শরীয়াত লাভের উৎস মানেনা। কেননা তাদের বিশ্বাস, তাদের ইমামগণ মাসূম এবং তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'ইলহাম' আসে। অতএব তারা নিজেরাই আইনের উৎস। ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লেবাননে এই জাফরী ফির্কার বিপুল সংখ্যক লোক বাস করে।

(গ) 'ইসমাঈলিয়া'-এরা জাফরী ফির্কা থেকে বিচ্ছিন্ন একটা প্রশাখা। এদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা ইমাম জাফরের পরে তাঁর পুত্র ইসমাঈলকেই খিলাফতের অধিকারী রূপে মানে। এদের বহু মত, আকীদা ও কাজ বা আমল মুসলমানদের অন্যান্য সব মত ও পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সে সব দিক দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সাথে এদের কোন মিল বা সাদৃশ্য নেই।

(২) 'খাওয়ারিজ'-এদের মূলমন্ত্র হলঃ 'অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই ওয়াজিব। আর 'সুলতান' আল্লাহ্ তা'আলার বহু হক্-এর মধ্যে একটি। এতে কারুর ব্যক্তিগত 'হক্' নেই। খিলাফত ওয়াজিব হয় স্বাধীন লোকদের নির্বাচনের ফল হিসাবে। দ্বীনের আদেশসমূহ পালন করা ঈমানের অংগ। এদেরও বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল-আজারিকা, আন-নজদীয়া, আস-সাফ্‌রীয়া। 'আবাজীয়া' ফির্কা এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রখ্যাত। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবাজ আত-তায়মী নামক ব্যক্তির নামে এর নামকরণ হয়েছে। ফিকাহ্‌র বহু মাসলা-মাসায়েলে এরাও আহলি সুন্নাত আল-জামায়াতের সাথে একমত। আম্মান ও আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল এদের বসবাস কেন্দ্র। আলজিরিয়া, ত্রিপলি প্রভৃতি উত্তর আফ্রিকান অঞ্চলে এদের অসংখ্য অনুগামী ও অনুসারী লোক রয়েছে।

www.amarboi.org

যেসব যয়ীফ হাদীস দেখতে পাওয়া যায়, সে সবের অনেকগুলোই মূলতঃ অগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য নয়। আর যা একান্তই গ্রহণীয় নয়, তা শরীয়াতের হুকুম-আহকাম বের করার মূল ভিত্তিরূপে গণ্য নয়। কিন্তু তবুও তা বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে শুধু এজন্যে যে, ইমাম ও মুজ্‌তাহিদের ফিক্‌হী মতের পক্ষে অতিরিক্ত সমর্থন তা থেকে পাওয়া যায়।

ফিকাহ্‌র এই ধারার আয়ুষ্কাল

কেবলমাত্র হাদীস ও আসর-এর উপর নির্ভরশীলতা ও অবস্থান গ্রহণ এবং কোনরূপ চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে উত্তরণ লাভের উদারতা উপেক্ষা করে চলার এই মত দীর্ঘায়ূ ছিল না। এর জন্যে খুব সংক্ষিপ্ত আয়ূষ্কালই লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা ২৭০ হিজরী সনে দাউদ জাহেরীর ইন্তিকালের পরই ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে এই মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণের অবসান ঘটে। অতঃপর সব ফিকাহ্‌বিদই শরীয়াতের প্রতিটি বিষয়ের গভীর তলদেশে পৌছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে সব বিষয়ে তাঁরা শরীয়াত-ভিত্তিক ফতোয়া দিতে শুরু করলেন। সে ফতোয়া দেয়া হত ঘটে যাওয়া ব্যাপারে যেমন, ঘটছে বা ঘটার সম্ভাবনাময়-আনুমানিক-বিষয়াদি সম্পর্কেও তেমন। মোটকথা প্রত্যেক বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্বে উত্তরণে তাঁরা প্রাণ-পণ চেষ্টা চালানোর নীতি গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করলেন। বস্তুতঃ উপরোক্ত মত ও মতের ধারকরা যদি প্রবল ও স্থায়ী হয়ে থাকত, তাহলে উত্তরকালে ইল্‌মে ফিকাহ্‌র এই বিরাট ও বিপুল সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হতনা।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দলভিত্তিক ফিক্‌হী মাযহাবসমূহের বিস্তারিত পরিচিতি বর্ণনার চেষ্টা করব।

www.amarboi.org

মালিকী মাযহাবঃ

ইমাম মালিকের (র) নামে এই মাযহাবটি পরিচিত। তাঁর পিতার নাম আনাস। তিনি ৯৩ হিজরী সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী সনে মদীনা শহরেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর শৈশবকাল দ্বীনী ইলমের পরিবেশেই অতিবাহিত হয়। এখানে থেকেই তিনি কুরআন ও সুন্নাতের ইল্মে বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি একবার মাত্র হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মদীনার বাইরে মক্কা শরীফ যান। এছাড়া তিনি আর কখনও মদীনা ছেড়ে বাইরে কোথাও যান নি। মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিস ও শরীয়াত-পারদর্শী উস্তাদদের নিকটই তিনি হাদীস ও ফিকাহ্‌র শিক্ষা গ্রহণ করেন। রবীয়াতা আর-রায় তাবেয়ী একজন প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। তিনিই ছিলেন ইমাম মালিকের প্রথম শিক্ষক-উস্তাদ। মদীনা ছিল হাদীসের প্রাণ-কেন্দ্র। এখানকার গোটা পরিবেশ হাদীস শিক্ষা ও চর্চার প্রাণস্পর্শী ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। ইমাম মালিকের উপর এই পরিবেশের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। ফিকাহ্ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশেষ পরিপক্কতা অর্জনের পর তিনি মসজিদে নববীতে দারস্ দিতে শুরু করেন। জনতা তখন তাঁর চারদিকে হাদীস ও ফিকাহ্ শিখবার উদ্দেশ্যে ভিড় করে। তিনি ছিলেন অতিবড় মুত্তাকী ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি। তিনি সহীহ্ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন, তার নাম 'আল-মুয়াত্তা'। হাদীস গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসে এ গ্রন্থের নাম তালিকার শীর্ষ স্থানে। কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ীর দেয়া ফতোয়াও তিনি এতে একত্রিত করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের বিশেষ-বিশেষ ইজতিহাদেরও উল্লেখ করেছেন। তাই ফিকাহ্ গ্রন্থ প্রণয়নের দিক দিয়েও এই গ্রন্থখানিই প্রথম। এক কথায় মুয়াত্তা গ্রন্থখানি হাদীস ও ফিকাহ্ উভয় দিক দিয়েই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন খলীফা এই গ্রন্থখানিকে দেশ শাসন ও আইনের সংবিধান গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক তাতে সম্মত হন নি ও অনুমতি দেন নি। ইমাম মালিক ছিলেন অত্যন্ত সত্যভাষী ও নির্ভীক সমালোচক। উৎপীড়কের উৎপীড়ন তাঁকে সত্য ভাষণ থেকে বিরত রাখতে পারত না। অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে যে সত্যই তাঁর নিকট প্রতিভাত হত, তা-ই তিনি প্রকাশ করতেন, তা অন্য কারো মনঃপূত হত কিনা, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না।

শরীয়াতের সিদ্ধান্ত বের করার ব্যাপারে ইমাম মালিকের পদ্ধতিঃ

কোন্ বিষয়ে শরীয়াতের কি সিদ্ধান্ত ও রায় বা হুকুম, তা জানবার জন্যে ইমাম মালিক সর্বপ্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের

www.amarboi.org

উপর। তাতে না পেলে তিনি সুন্নাত তথা হাদীসের সাগর মন্থন করতেন। অনুরূপভাবে প্রার্থিত বিষয়ে কুরআনে যদি অস্পষ্ট ইংগিত বা অ-বিস্তারিত কিছু কথা পাওয়া যেত, তাহলে সে বিষয়ে তিনি সুন্নাত বা হাদীসের বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান করতেন। তিনি অবশ্য মদীনাবাসীদের বাস্তব কাজকেও মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদা দিতেন। বহু সংখ্যক লোক-অন্ততঃ দশজন বর্ণনাকারী-প্রতি স্তরে ও প্রতিটি পর্যায়ে যে হাদীসের বর্ণনাকারী থাকে, তা-ই মুতাওয়াতির হাদীস। খবরে ওয়াহিদ ততটা শক্তিশালী বর্ণনা রূপে গুরুত্ব পায় না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে যদি কোন সমাধান তিনি না পেতেন, তাহলে সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে যাঁরা ফিকাহ্‌বিদ্‌রূপে পরিচিত ছিলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের ইজ্‌মা পাওয়া গেলে তিনি তা-ই গ্রহণ করতেন। নতুবা সে বিষয়ে কোন এক সাহাবীর কোন উক্তি বা মত পাওয়া গেলে তা-ই গ্রহণ করতেন-অবশ্য বিষয়টি যদি এমন হত যাতে মানুষের চিন্তা-বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। আর যদি ব্যাপারটি সে রকমই হত, তাহলে তিনি কিয়াস-এর আশ্রয় নিতেন। যে বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে হবে, সেটিকে অনুরূপ ধরনের অপর একটি বিষয়ের উপর রেখে-যে বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানা আছে-পরখ ও বিবেচনা করতেন। এ দুটি বিষয়ের মাঝে মূল 'ইল্লাত' বা কারণের দিক দিয়ে কোনরূপ সাদৃশ্য পাওয়া গেলে এ বিবেচ্য বিষয়েও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আর একেই বলে কিয়াস (قِيَاس)।

পূর্বে যেমন বলেছি, ইমাম মালিক শরীয়াতের মাসলা বের করার ব্যাপারে হাদীসের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। কেননা তিনি তো হাদীসের পাদপীঠ মদীনাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত ও প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শরীয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে মত গঠনে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনাকে খুব গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনার এই প্রয়োগকে পরিভাষায় কয়েকটি নাম দেয়া হয়েছে। যথাঃ 'আল-ইস্‌তিহসান' (اَلْاِسْتِحْسَانُ), আল ইস্‌তিসহাব (اَلْاِسْتِصْحَابُ), আল-মাসালিহ (اَلْمَصَالِحُ), আয্‌-যারায়ে' (اَلذَّرَائِعُ), প্রচলন ও সাধারণ আদত-অভ্যাস (العرف والعادة)। মোটকথা এটা খুব সঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে যে, ইমাম মালিক হাদীস ও চিন্তা-ভাবনা উভয় হাতিয়ারকেই পুরামাত্রায় প্রয়োগ করেছেন শরীয়াতের বিধি-বিধান নির্ধারণে। অবশ্য একটা বিশেষ ধারণার ভিত্তিতে ইমাম মালিককে ইমাম আবু হানীফার সাথে তুলনা করা হয়। বলা হয়, শেষোক্ত ব্যক্তি হাদীস খুব কম জানতেন, এ জন্যে তিনি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে (رَأْى) বেশী প্রয়োগ করেছেন এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি হাদীস খুব বেশী জানতেন বলে হাদীসের প্রয়োগও খুব বেশী

www.amarboi.org

করেছেন। এ ধারণার কারণেই ইমাম মালিককে আহলুল হাদীসদের গোষ্ঠীভুক্ত মনে করা হয় আর ইমাম আবু হানীফাকে মনে করা হয় 'আহলুল রায়'। আর এ দুজনই ছিলেন সমসাময়িক।

মালিকী মাযহাব প্রচারে সাহায্যকারীদের অবদান

যে সব মনীষী ইমাম মালিকের মাযহাব প্রচারে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে অহাব, আবদুর রহীম ইবনুল কাসেম, আশ্‌হুব ইবনে আবদুল আজীজ আল-কাইসী এবং আবদুল্লাহ ইবনুল হিকাম প্রমুখ। এঁরা ছিলেন সকলেই মিশরের অধিবাসী। শরীয়াত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা আপন জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় ইমাম মালিকের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা মিশর ফিরে গিয়ে শরীয়াত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় মিশরে যে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, এঁরা সকলে ছিলেন তার বড় বড় স্তম্ভ। এঁদের মাধ্যমেই মিশরে ইমাম মালিকের মাযহাব ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেবল এই ক'জনই নয়, এঁরা ছাড়াও তাঁর আরও বহু ছাত্র ও মতাবলম্বী লোক মুসলিম জাহানের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের দ্বারাও এই মাযহাবের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

এঁদেরই একজন ছিলেন তিউনিসিয়ার আসাদ ইবনুল ফুরাত। তিনি মদীনায় এসে ইমাম মালিকের শীষ্যত্ব গ্রহণ করে মালিকী মাযহাব অনুযায়ী শরীয়াতের শিক্ষা লাভ করেন। পরে ইমাম আবু হানীফার সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকেও তিনি শরীয়াতের ইল্‌ম অর্জন করেন। অতঃপর তিনি মিশর গমন করেন এবং সেখানে মালিকী মযহাবের ফিকাহ্‌বিদ আলী ইবনুল কাসেমের নিকট হানাফী মযহাবের ফিকাহ্ পেশ করেন। সেখানে তিনি মালিকী মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেন এবং সে ফতোয়াসমূহ সংকলিত করে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার নাম اَلْاَسْمَاءُ الْمُدَوَّنَةُ। এ গ্রন্থখানি ইমাম মালিকের নামেই প্রকশ করা হয়।

আবদুস সালাম ইবনে হুবাইব ওরফে 'সাহনূন'ও ইমাম মালিকের একজন ছাত্র। তিনি মূলতঃ হিম্‌স্-এর অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি মিশরে স্থানান্তরিত হন। তাঁর হাতে ছিল ইবনুল ফুরাত-এর সংকলিত গ্রন্থখানি। মিশরে তিনি ইবনুল কাসেমকে এই গ্রন্থখানি হস্তান্তর করেন। তাতে তিনি কতিপয় বড় বড় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন। পরে সেগুলোকে ঠিক-ঠাক করে দিয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকার 'কীরাওয়ান' চলে যান এবং সেখানে মালিকী মায্‌হাবের প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

www.amarboi.org

আন্দালুসিয়ার ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-লাইসীও ছিলেন ইমাম মালিকের একজন পরোক্ষ শাগরিদ্। কেননা তিনি মিশরে গেলে সেখানে ইমাম মালিকের ছাত্র ও মতাবলম্বীদের সাক্ষাত পান এবং তাঁদের নিকট থেকে ইমাম মালিকের ব্যাখ্যানুযায়ী শরীয়াতের জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি আন্দালুসিয়ায় ফিরে গিয়ে মালিকী মাযহাবের ফিকাহ্ প্রচারের কাজে লেগে যান।

এতৎসত্ত্বেও ইমাম মালিকের বহু সংখ্যক ছাত্র শরীয়াতের নানা বিষয়ে ইমাম মালিক থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এই পর্যায়ে তাঁরা যে মত গঠন করেছিলেন ও যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা ছিল ইমাম মালিকেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী করা ইজতিহাদের অনিবার্য ফসল। উত্তরকালে এই সবকিছুর সমন্বয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয় এবং মালিকী মাযৃহাবের রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী করা অন্যান্য ইজতিহাদও তাতে শামিল করা হয়। আর এই সবকে একত্রে 'মালিকী মাযৃহাবের ফিকাহ্' রূপে জনসমক্ষে পরিচিত করা হয়। ঠিক এ কারণেই আমরা মালিকী মাযহাবকে 'গোষ্ঠীগত মাযহাব مَذْهَبٌ جَمَاعِيٌّ এর তালিকাভুক্ত মনে করেছি। এই পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল্লামা ইবনে রুশ্দ-এর المقدمات الممهدات। ইবনে জজ্জী'র كِتَابُ الْقَوَانِيْنِ الْفِقْهِيَّةِ ইবনে ফরহুনের تبصرة الحكام এবং مختصر خليل তার শরাহ ও বহু সংখ্যক টীকা উল্লেখ্য।

www.amarboi.org

শাফেয়ী মাযহাব

এ মাযহাবটি ইমাম শাফেয়ী'র নামে পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম ও পরিচয় হল মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আল-কুরাশী। তিনি ১৫০ হিজরী সনে মিশরের 'গাজ্জা'য় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁকে ইয়াতীম অবস্থায় নিয়ে মক্কা শরীফ চলে যান। এখানে কুরআন মজীদ, বিপুল সংখ্যক হাদীস ও আরব বেদুঈন কাব্য মুখস্থ করেন। এখানেই তিনি মুসলিম আজ-জানজী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ প্রমুখ খ্যাতনামা ফিকাহ্‌বিদদের নিকট হাদীস ও ফিকাহ্‌র বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেন। পরে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন এবং এখানে ইমাম মালিকের সাক্ষাত লাভ করে ও তাঁর নিকট 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন। এখান থেকেই তিনি ইয়ামান চলে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। এখান থেকে ইরাক চলে এলে সেখানে প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান-এর সাক্ষাত পান এবং তাঁর সাথে শরীয়াতের বিভিন্ন বিষয়ে মত-বিনিময় হয়। এই সাক্ষাতে ইমাম শাফেয়ী সর্ববিষয়ে হাদীসকে ব্যক্তিগত চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত মতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন। ফলে তাঁকে 'নাসেরুল হাদীস' (نَاصِرُالْحَدِيْث) –'হাদীসের প্রবক্তা ও সাহায্যকারী' হওয়ার খেতাব দেয়া হয়।

ইমাম শাফেয়ী ইরাকে অবস্থান কালেই তাঁর মাযহাব অনুযায়ী শরীয়াতের বিধি-বিধান প্রনয়ণ ও সংকলন করেন। তাঁর এসময়কার মতকে 'আল-কাদীম'- 'প্রাচীন মত' (اَلْقَوْلُ الْقَدِيْمُ) বলা হয়। কেননা এরপর তিনি সেখান থেকে মিশর চলে যান এবং সেখানে তাঁর চিন্তা ও মতে অধিকতর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন, মত-বিনিময় ও সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ফলে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে তাঁর প্রাচীন মতে অনেক রদ-বদল করেন। উত্তরকালে তাঁর এই পরবর্তিকালীন মতামতই 'নতুন মত' বা 'নতুন মাযহাব' নামে পরিচিত হয়। ইমাম শাফেয়ী এরপর মিশরেই থেকে গেলেন এবং ২০৪ হিজরী সনে তিনি এখানেই ইন্তেকাল করেন। মিশরেই তিনি সমাধিস্থ হন।

'হাদীস' ও 'রায়' এই দুটি স্বতন্ত্র ধারা থেকে যে-সব মনীষী সমানভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন, ইমাম শাফেয়ী তাঁদের অন্যতম। কেননা তিনি উভয় ধারার ফিকাহ্‌বিদদের নিকট থেকে শুধু তত্ত্ব, তথ্য, চিন্তা ও দৃষ্টিকোণই গ্রহণ করেন নি, তাঁর নিজস্ব মত রচনায়ও এ দুটি ধারাকেই সমানভাবে প্রয়োগ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি সর্ববিষয়ে হাদীসকেই সবকিছুর উপর স্থান দিতেন বলে তিনি 'আহলুল হাদীস' রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি বহু

www.amarboi.org

সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যথাঃ আল-উম্ম্, কিতাবু ইখ্তিলাফিল হাদীস, আর-রিসালা ইত্যাদি। এই শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি 'ইল্মে উসূলিল ফিকাহ্'র প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি লিখেছেন বলে তাঁকেই বলা হয় এই শাস্ত্রের আদি রচয়িতা।

শরীয়াতের বিধি-বিধান বের করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর পদ্ধতি

একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে গড়ে উঠা ফিক্হী মাযহাব হিসাবে প্রথম স্থান অধিকারকারী হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাব। সাধারণ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম সংকলিত করা হয়েছে এই মাযহাবে। চিন্তা-বিবেচনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বাধিক মনোনিবেশকারী এবং তার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণকারী-এই দু'টই প্রান্তিক মনোভাব ও দৃষ্টিকোন, দু'টতেই বাড়াবাড়ি। এই দু'টি প্রান্তিক সীমালংঘনকারী দৃষ্টিকোণ ও মনোভাবের মধ্যবর্তী নীতি অবলম্বনকারী হচ্ছে এই শাফেয়ী মাযহাব। এ মাযহাবের চিন্তা-পদ্ধতিটা হাদীসবাদীদের অনেক নিকটবর্তী। অন্যান্য মযহাবের অনুসারী লোকেরাও এ মতের দিকেই আকৃষ্ট।

প্রতিটি ব্যাপারে কুরআন থেকে পথ-নির্দশ লাভ করা এবং বাহ্যতঃ কুরআন থেকে যা বুঝা যায় তদনুযায়ী আমল-যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যার্থের বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে কোন অকাট্য দলীল সমুখে উপস্থিত না হবে-এটাই হল শাফেয়ী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণকারী বিষয়। এরপর হল সুন্নাতের স্থান। এমনকি 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীসও গ্রহণীয়, যদি তার বর্ণনাকারী সিক্বাহ্-বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য হয় এবং তা 'মশহুর' না হলেও কোন ক্ষতি নেই। এই মতটি হানাফী মাযহাবের বিপরীত। মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আমলের বিপরীত হলেও তা গ্রহণীয়-এই কথাটি ইমাম মালিকের মতের বিপরীত। শাফেয়ী মাযহবের এর পরে আইনের উৎস রূপে গৃহীত হচ্ছে ইজ্মা আর তারপরে কিয়াস। কিন্তু তার জন্য জরুরী শর্ত হচ্ছে এই যে, সে কিয়াসের মূলে কুরআন ও সুন্নাতের অবস্থিতি থাকতে হবে। 'কিয়াস' শাফেয়ী মযহাবে অন্যান্য মযহাবের ন্যায় ব্যাপকভাবে ও বিপুল প্রশস্ততা সহকারে গ্রহণীয় নয়। কিয়াসের যে দিকটি হানাফীদের নিকট গৃহীত এবং তারা যে জিনিসটির নাম দিয়েছে 'আল-ইস্তিহ্সান', শাফেয়ী মাযহাবে তা গ্রাহ্য নয়। এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবে হানাফীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়েছে। মালিকী মাযহাবে মদীনাবাসীদের আমলকেও শরীয়াতের একটা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, 'মাসালিহে মুরসালা'-কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একজন সাহাবীর উক্তি বা ফতোয়াও

www.amarboi.org

গ্রহণ করা হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবে সেজন্য মালিকী মাযহাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

শাফেয়ী মায্হাব প্রচারে সাহায্যকারীদের অবদান

প্রধান চারটি মাযহাবের ন্যায় শাফেয়ী মায্হাবেরও বহু সংখ্যক অনুসারী ও সমর্থক ছিলেন। তাঁরা বহু লোককে এ মায্হাবের পাঠ দিয়েছেন এবং ব্যাপকভাবে তার প্রচারও করেছেন। সে অনুসরণকারী ও সমর্থকদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

(১) ইউসুফ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-বূইতী আল-মিসরী। তিনি ইমাম শাফেয়ীর পর এই মায্হাবের শিক্ষাদান ও প্রচার কাজে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

(২) ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-সুজানী। ইমাম শাফেয়ীর মতাবলম্বীদের মাঝে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে বিতর্ক কার্যে তিনি সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এই মাযহাব সংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রণয়নেও তিনি ছিলেন বেশী অগ্রসর।

(৩) আর্-রুবাই আল-মুরাদী। ইমাম শাফেয়ী এঁর দ্বারা তাঁর রচিত কিতাবুল-উম্ম্ লিখিয়েছিলেন।

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুসারীরা এই মাযহাব সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা ইমাম শাফেয়ীর উদ্ভাবন (ইস্তেন্বাত) করা মাস্লা ছাড়াও তাঁরই নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে যুগোপযোগী ও সমসাময়িক প্রয়োজন অনুপাতে আরও বহু নতুন মাস্লা-মাসায়েলে শরীয়াতের হুকুম বের করেছেন। এই পর্যায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাধিক প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম হলঃ المهذب للشيرازي، الوجيز للغزالي، المجموع، المنهاج এই শেষোক্ত দুখানি গ্রন্থ ইমাম নববীর রচিত। এছাড়া শাফেয়ী আলিমদের রচিত বহু কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকাও রয়েছে। আরও আছে বহু মৌলিক গ্রন্থ।

মিশর, সিরিয়া এবং হিজাজে 'ওহ্হাবী মতবাদে'র উত্থান লাভের পূর্বে মক্কা ও মদীনায় শাফেয়ী মায্হাবের ব্যাপক প্রচার, প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এছাড়া পারস্য, মধ্য-এশিয়া ও কয়েকটি আরব দেশে এ মায্হাবের হাজার হাজার অনুসারী রয়েছেন।

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নাম অনুযায়ী এই মাযহাবটি পরিচিত হয়েছে 'হাম্বলী মাযহাব' নামে। তিনি ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহারা হন। ফলে তাঁর মা-ই এককভাবে তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব বহন করেন এবং তাঁকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের কাজে নিযুক্ত করেন ও তাঁর মনে ও চরিত্রে তাক্ওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এর পর ইবনে হাম্বল হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন ও তার বর্ণনার কাজও শুরু করেন। এই জন্য তিনি সর্বপ্রথম হাইসাম ইবনে বুশাইর ইবনে আবু খাজামের সাথে সাক্ষাত করেন ও তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। হাইসাম ছিলেন ইমাম জুহরী ও অন্যান্য কয়েকজন তাবেয়ী মনীষীর ছাত্র। তিনি ইমাম আবু ইউসুফের নিকটও শিক্ষালাভ করেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ যে হানাফী মাযহাবের একজন বড় ধারক ও প্রচারক ছিলেন, তা সর্বজনবিদিত। তাই ইবনে হাম্বল যে হানাফী ফিকাহ্ও শিখেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পরে তিনি যখন হজ্জ করতে গেলেন, তখন মক্কায় ইমাম শাফেয়ীর সাক্ষাত পান এবং তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট তিনি ফিকাহ্, ফিকাহ্র উসূল (মূলনীতি)-এর পাঠ গ্রহণ করেন। পরে তিনি বাগদাদ ফিরে যান এবং সেখানে একনিষ্ঠভাবে শিক্ষা দানের কাজ শুরু করেন। লোকেরা তাঁকে প্রথমে ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী বলে মনে করত। কিন্তু মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন নিজস্ব ফিক্হী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়াও কয়েকটি মৌল ব্যাপারে তিনি ইমাম শাফেয়ী থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ইমাম আহমদ ফতোয়া দানে খ্যাতি অর্জন করেননি। ফিকাহ্ পর্যায়ে কোন গ্রন্থও রচনা করেন নি তিনি। কেননা যে বিষয়ে কোন হাদীস বা 'আসর' উদ্ধৃত হয়নি, সে বিষয়ে কোন ফতোয়া দেয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। তবে তিনি তাঁর নিকট পেশ করা বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে হাদীস সংকলন, যা 'মুসনাদে ইমাম আহমাদ' নামে বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত। এ গ্রন্থে চল্লিশ হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থও তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত করে সংকলিত করেন নি। এক-একজন সাহাবীর বর্ণনা করা সব হাদীস-যা তিনি শুনতে ও জানতে পেরেছিলেন-এক সঙ্গে গ্রথিত করে দিয়েছেন। তাঁর এ গ্রন্থখানি অনতিবিলম্বেই মুসলিম জাহানের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শহর ও জনপদে অনুলিপিত

www.amarboi.org

হয়। আর এজন্যে তিনি এসব শহর ও জনপদে গমনও করেন। ফলে তিনি তাঁর সময়কার মুসলিম জনতার ইমাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ইমাম আহমদই সর্বপ্রথম হাদীসসমূহকে মুসনাদ আকারে সঞ্চয়িত করেন। আর তা সংগ্রহ করেন সিরিয়া, হিজাজ, বাসরা, কূফা প্রভৃতি হাদীসের পীঠস্থানসমূহ থেকে। এ ছাড়াও তাঁর নিম্নোদ্ধৃত তিনখানি গ্রন্থও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেঃ

(১) كِتَابُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ (২) كِتَابُ طَاعَةِ الرَّسُولِ এবং (৩) كِتَابُ الْعِلَلِ

ইমাম আহমদ নিজে ফিকাহ্‌র চাইতে বেশী দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন ইল্‌মে হাদীসে। তবে তাঁর ছাত্র-শিক্ষার্থী ও সহকারী লোকেরা তাঁর ফিকাহ্ পর্যায়ের মত, উক্তি ও প্রদত্ত ফতোয়াসমূহ বিশেষ গুরুত্ব সহকার সংগ্রহীত করেছেন। তাঁর যে মত ও ফতোয়া এই মাযহাবের ভিত্তি প্রস্তর হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে, তা-ও যথারীতি সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেনঃ 'খাল্লাল ইমাম আহমদের সব ফতোয়া ও ফিক্‌হী মত ও রায় সঞ্চয়িত করেছেন।' সাহাবীদের ফতোয়া ও ইমাম আহমদের ফতোয়ার তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যাবে, এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই বরং তা পরস্পরের সাথে পুরাপুরি সাদৃশ্য ও সংগতিপূর্ণ। সকলেই বুঝতে পারেন যে, এ দুটি জিনিস একই উৎস থেকে উৎসারিত। ইমাম আহমদের শেষ জীবন বাগদাদ নগরে রাসূলে করীম (সঃ)-এর হাদীসের পাঠদানে অতিবাহিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি সাহাবীদের ফিকাহ্‌রও শিক্ষাদান ও প্রচার করেছেন। তিনি ২৪১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

শরীয়াতের হুকুম বের করার ব্যাপারে ইবনে হাম্বলের পদ্ধতি

অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদদের মতই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও সর্বপ্রথম কুরআন মজীদ থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। তাতে না পেলে সুন্নাত বা হাদীস থেকে গ্রহণ করতেন। আর কুরআন ও হাদীসে কোন বিষয়ে পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা দিলে কুরআনকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন, তার পরের স্থান হত সুন্নাত বা হাদীসের। এরপর তিনি সাহাবাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন বিরোধীয় বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যাঁর কথাটিকে তিনি তুলনামূলকভাবে কুরআন ও সুন্নাতের নিকটবর্তী বুঝতে পারতেন, তা-ই তিনি গ্রহণ করতেন। এমনকি কোন সাহাবীরও কোন কথা যদি তাঁর নিকট কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী বা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেখতে না পেতেন, তা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন বিশেষ মতকে অগ্রাধিকার না দিয়ে

www.amarboi.org

সেই বিভিন্ন মতের উল্লেখ করতেন। আর এ ধরনের কোন জিনিসও না পেলে সেই বিষয়ে কোন মুরসাল হাদীস-সাহাবীর উল্লেখ না করে তাবেয়ী কর্তৃক রাসূলের হাদীসের বর্ণনা-কে গ্রহণ করতেন। তিনি এ ধরনের হাদীসকে 'কিয়াসের' উপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর এ সবের কোন একটিও না হলে প্রয়োজনের সময়ে তিনি 'কিয়াস'-এরই আশ্রয় নিতেন শরীয়াতের রায় জানবার জন্যে।

ইমাম আহমদ সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত হল, তিনি 'আসর'-ভিত্তিক ফকীহ্। অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি সাহাবীদের রায় গ্রহণ করতেন। এমনকি, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন সাহাবী থেকে যদি দুটি মত বর্ণিত হত, তা হলে তিনি তার মধ্যে একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার দিতেন না বরং অনেক সময় সেই দুটি মতকেই গ্রহণ করতেন। এতৎসত্ত্বেও শরীয়াতের অকাট্য দলীল বাধ্য করলে তিনি অনেক সময় কল্যাণ-দৃষ্টির ভিত্তিতে ফতোয়াও জারী করতেন। ইমাম শাফেয়ী যেমন এই 'কল্যাণ-দৃষ্টি'র (مصلحة) উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছেন, তিনি তা করতেন না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক একে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, ততটা গুরুত্বও তিনি দিতেন না। ইবনে হাম্বল সাহাবীদের 'আসর'-ভিত্তিক ফিকাহ্র প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ কল্যাণ-দৃষ্টিকে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত বের করার জন্যে একটা মৌল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন এবং এভাবে মাধ্যমকে তিনি লক্ষ্যের মর্যাদা দিয়েছেন।

এ মাযহাব কোন কোন ইবাদাতের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে, আরোপ করেছে অনেক কড়াকড়ি। তা সত্ত্বেও মুয়ামিলাত-লোকদের পারস্পরিক বৈষয়িক ব্যাপারে এই মাযহাবটি সর্বাধিক সহজ নিয়ম প্রবর্তন করেছে। কেননা এই মাযহাবে সমস্ত জিনিস-জিনিস ও ব্যাপার-মূলগতভাবে মুবাহ-যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসের কোন অকাট্য দলীল বা কোম সাহাবীর কোন মত, উক্তি বা ফতোয়া এবং কিয়াস করা যায় এমন কোন জিনিস পাওয়া যায় না। এ কারণে এই মাযহাবে এ কথাটি একটি মূলনীতি রূপে গণ্য যে, সর্বপ্রকার শর্ত আরোপ ও চুক্তি-সিদ্ধান্তই মূলতঃ মুবাহ; তবে যদি নিষেধের কোন অকাট্য দলীল পাওয়া যায়, তা হলে অন্য কথা।

হাম্বলী মাযহাব প্রচারে সাহায্যকারীদের অবদান

অন্যান্য সব ফিকাহ্বিদদের ন্যায় ইমাম ইবনে হাম্বলেরও বহু অনুসারী ও ভক্ত-অনুরক্ত লোক ছিলেন। তাঁরা সব সময় তাঁর চারপার্শ্বে ভিড় করে থাকতেন

www.amarboi.org

এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে তাঁর মতামত ও রায়সমূহ কণ্ঠস্থ করতেন ও তাঁর মাযহাব প্রচারে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতেন। এ পর্যায়ে তাঁর দুই জন পুত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বড় পুত্র ছিলেন সালেহ্। তিনি পিতার আদর্শের পরিপন্থী বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম আবদুল্লাহ। তিনি হাদীসের প্রতি খুব বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতার উত্তরাধিকার তিনি পুরাপুরি লাভ করেছিলে। অবশ্য বড় পুত্র সালেহ লাভ করেছিলেন তাঁর ফিকাহ্‌র উত্তরাধিকার। ফলে তিনি তাঁর পিতার ফিকাহ্‌র ব্যপকভাবে প্রচার করেন, যেমন আবদুল্লাহ্ প্রচার করেছিলেন তাঁর হাদীসের মুসনাদ গ্রন্থ।

তাঁর এ দুই সন্তান ছাড়া অন্যান্য যাঁরা একাজে অগ্রসর ছিলেন, তাঁরা হলেনঃ

(১) ফকীহ্ আহমদ হানী (২) আবু বকর আল-আসরাম-তিনি ইমাম আহমদ থেকে হাদীস ও ফিকাহ্ উভয়ই বর্ণনা করেছেন। (৩) আবদুল মালিক ইবনে মাহবান আল-মাইমুনী। তিনি ইমাম আহমদ থেকে ফিকাহ্ লিখেছেন, যদিও তিনি নিজে তাঁর ফিক্‌হী মত লিপিবদ্ধ করা পছন্দ করতেন না। (৪) আবু বকর আল-মারওয়াজী প্রমুখ।

এঁদের পরে এঁদের সকলেরই নিকট থেকে ইমাম আহমদের ফিকাহ্ গ্রহণ ও সংগ্রহ করেন আবু বকর আল-খাল্লাল। তাঁর পরে দুজন সর্বজনমান্য ও বিশ্ব-বিশ্রুত ইমাম ও মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনে কাইয়্যেম। এঁরা দুজন হাম্বলী মাযহাবকে পুনর্গঠিত (تَجْدِيد) করেন। ফিকাহ্‌শাস্ত্রে তাঁরা হাম্বলী মাযহাবের মুজাদ্দিদ। এঁরা দুজন এ মায্‌হাবের জোরালো ভাবে প্রচার করেন। বিশেষ করে মুয়ামিলাত পর্যায়ে তাঁর সহজ সরল ফিকাহ্‌কে তাঁরা সর্বত্র পৌছিয়ে দেন।

এতৎসত্ত্বেও আহলি সুন্নাত অল-জামা'আতের চারটি মায্‌হাবের মধ্যে এ মাযহাবটিই সবচেয়ে কম প্রচার লাভ করেছে ও বৃহত্তর মানবতার তুলনায় খুব কম সংখ্যক লোকই তা গ্রহণ করেছে। কেননা এ মায্‌হাবের পূর্ববর্তী অন্যান্য মাযহাবগুলো এর পূর্বেই দেশে-দেশে নগরে-জনপদে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। লোকেরা তদনুযায়ী আমলও শুরু করে দিয়েছিল। ফলে লোকদের মধ্যে এর অনুপ্রবেশ লাভের খুব কমই অবকাশ ছিল। এই সঙ্গে আরও দু'ট কারণ ছিল। একটি এই যে, এ মাযহাবের লোকেরা সরকারী আনুকূল্য ও বিচার

www.amarboi.org

বিভাগীয় পদ গ্রহণ থেকে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর দ্বিতীয় এই যে, ইজতিহাদ ও নিজস্ব চিন্তা-বিবেচনাশক্তির প্রয়োগ থেকেও তাঁরা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। কেননা যাঁরা বেশী বেশী ইজতিহাদ করেন ও শরীয়াতের মাস্‌লা-মাসায়েলে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করেন, তাঁদের প্রতি ছিল এঁদের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই মাযহাবের অনুসারী কয়েকজন প্রখ্যাত ও অতিশয় ধী-শক্তিসম্পন্ন আলেম এমন ছিলেন, যাঁরা ইস্তেম্বাত করার মেধাসম্পন্ন ছিলেন এবং অন্ধ অনুসরণের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও তাঁরা ইজতিহাদের দিগন্ত উজ্জ্বলকারী আলোক মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম দিকে এই মাযহাব ইরাক ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন মহলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মিশরে এর প্রবেশ ঘটে অনেক পরে। বিগত শতাব্দীতে নজ্‌দের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহহাব-এর অনুসারীগণ এই মাযহাবকে গ্রহণ করেন। বর্তমান শতকে হিজাজের সমস্ত শহরে ও মহলে এ মায্‌হাব বেশ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

www.amarboi.org

জাহেরী মায্হাব

দাউদ ইবনে আলী ইবনে খাল্ফ্ আল-ইসফাহানীর নামের সাথে এই মাযহাবটি সম্পর্কযুক্ত। তিনি 'জাহেরী' নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন বলে এই মায্হাবটি 'জাহিরী মাযহাব' নামে সুপরিচিত। তিনি ২০২ হিজরী সনে কূফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে বাগদাদে জীবন যাপন করেন। ইমাম শাফেয়ীর ছাত্রদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর গ্রন্থাদি পাঠ করে শাফেয়ী মাযহাবের জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে তিনি হাদীসকে ধারণ করে কট্টর শাফেয়ীপন্থী হয়ে যান। যদিও তাঁর পিতা হানাফী মায্হাবের অনুসারী ছিলেন এবং ছিলেন এই মায্হাবের একজন স্তম্ভ বিশেষ।

দাউদ বহু সংখ্যক মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। প্রখ্যাত হাদীসপন্থী ফকীহ্ ইস্হাক ইবনে রাহ্ওয়াই'র নিকট হাদীস শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি ২৩৩ হিজরী সনে নিশাপুর চলে যান।

জাহেরী মাযহাব হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। তা সম্পূর্ণরূপে হাদীস-ভিত্তিক মাযহাব। হাদীস ছাড়া সেখানে আর কোন কথা নেই। কেননা এ মাযহাবের ফিকাহ্ অকাট্য স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটি হচ্ছে তার সাধারণ অবস্থা। আর বিশেষ অর্থে এই ফিকাহ্কে বলা চলে 'ফিক্হুল হাদীস' বা হাদীসের ফিকাহ্। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও ক্ষেত্র সম্পর্কে যে বিধি-বিধান জানতে পারা যায়, তা-ই হচ্ছে এই মাযহাবের ফিকাহ্। দাউদ জাহেরী বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। তিনি তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণাও চালান। তবে তিনি তখনকার সময়ে মুহাদ্দিস সমাজে সুপরিচিত হতে পারেননি, তাঁর কাছ থেকেও কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে অকাট্য দলীল (نص) ধরে নিয়ে তার বক্তব্যকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিধান রূপে গ্রহণ করার এবং তার মুলে নিহিত মৌল কারণ (علت) খুঁজে বের করতে চেষ্টা না করার কথা সর্বপ্রথম তিনিই বলেছেন। এই মতের তিনিই প্রথম প্রবক্তা। এ কারণেই তাঁর নাম হয়েছে 'জাহেরী' -'হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী'। ইসলামী ফিকাহ্র অন্যতম গুরত্বপূর্ণ ও সর্বজনমান্য উৎস হচ্ছে কিয়াস্ (قياس)। কিন্তু ইমাম দাউদ এই 'কিয়াস'কে বাতিল ঘোষণা করেছেন। যাঁরা 'কিয়াস'-এ বিশ্বাস করেন, তাঁদের তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কেবলমাত্র এ কারণেই তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। শাফেয়ী মায্হাবের

www.amarboi.org

ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ যখন তাঁর এই মত ও নীতির প্রতিবাদ করলেন, তখন জবাবে তিনি বললেনঃ আমি তো শাফেয়ী মাযহাবের দলীলের ভিত্তিতেই 'ইসতিহ্‌সান' (হানাফী মাযহাবেও গৃহীত একটি মৌল নীতি) বাতিল করেছি। আর এ দলীলের দ্বারা কিয়াসও বাতিল প্রমাণিত হয়ে গেছে। দাউদ তাঁর ফিক্‌হী মত ও এই মতের মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকরণ এবং 'কিয়াস' বাতিলকরণ পর্যায়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ২৭০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

সত্যিকথা হচ্ছে, জাহেরী মাযহাবকে জানা ও বুঝার বর্তমানে একমাত্র উপায় হচ্ছে মুনযির ইবনে সায়ীদ লিখিত গ্রন্থাদি। তিন তাঁর গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে এই মাযহাবকে তুলে ধরেছেন এবং এর উপর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণসমূহ প্রতিহতও করেছেন-করেছেন খুবই বলিষ্ঠভাবে। তাঁর সঙ্গে উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছে প্রখ্যাত মনীষী ও ইসলামী জ্ঞানের বিরাট সাগর আল্লামা ইবনে হাজাম। তাঁর আসল নাম আহ্‌মদ ইবনে সায়ীদ ইবনে হাজাম হলেও শুধূ ইবনে হাজাম নামেই তিনি বিশ্বে সুপরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এই পর্যায়ে অতীব মূল্যবান সম্পদ। এক-একখানি গ্রন্থ জাহেরী মাযহাবের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান সময়ের মানুষের প্রতি এসব গ্রন্থের অবদান যে কত বড়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। এ মাযহাবের অনুসারী বলে পরিচিত লোক হয়ত এখন দুনিয়ায় নেই, কিন্তু এই মহামূল্য গ্রন্থাদিই ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে এই মত ও নীতিকে জানবার ও বুঝবার জন্যে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে থাকবে চিরকাল।

শরীয়াতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি

পূর্বে যেমন বলেছি, এ মাযহাব 'কিয়াস'-এর প্রয়োগ না করে, সুন্নাতকে শক্তভাবে আকড়ে ধরেছে। কুরআন বা সুন্নাহ্‌ থেকে যে অকাট্য দলীল পাওয়া যায়, তারই উপর অবস্থান গ্রহণ করা, তার বাইরে না যাওয়া বা তাতে চিন্তা-বিবেচনা প্রয়োগ না করার নীতি এই মাযহাবের স্থায়ী আদর্শ। কোন্‌ হুকুম কি কারণে (علت) দেয়া হয়েছে সেই কারণটি বের করে সেই কারণ অন্য যেখানেই পাওয়া যাবে তাতেও অনুরূপ হুকুম গ্রহণ করার নীতি এই মাযহাবে অগ্রাহ্য। কুরআন ও সুন্নাতের বিধান থেকে বাহ্যত যা জানা যায় এবং শরীয়াতের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম একমত হয়েছেন, এই মাযহাবের নিকট তা-ই হচ্ছে শরীয়াতের উৎস। সাহাবীদের পরবর্তী কালের লোকদের-তাবেয়ীনের-ব্যাপারে এই মাযহাবের দৃষ্টিকোণ হল, তাঁরা সংখ্যায় বিপুল এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দিকে তাঁরা বিক্ষিপ্ত ছিলেন, একস্থানে একত্রিত হয়ে কোন বিষয়ে পরস্পরকে আলাপ-আলোচনা এবং চিন্তা বা দলীলের

www.amarboi.org

আদান-প্রদান করে কোন একটি সিদ্ধান্তে একমত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা বলে তাঁদের ইজমা বা মতৈক্যকে এ মাযহাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। 'কিয়াস'কে তো প্রথম কথায়ই বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং কারো অন্ধ অনুসরণ কিংবা নির্বিচারে কারো কথা মেনে নেয়া-পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'তাক্‌লীদ'-কে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ তাক্লীদের কোন স্থানই এই মাযহাবে নেই। এ মাযহাব দুনিয়ার মুসলমানকে আহবান জানিয়েছে এই বলে যে, কারো অন্ধ ও নির্বিচার অনুসরণ করতে যেওনা। তোমার জীবনের ব্যবহারিক বিধান তুমি নিজে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকেই গ্রহণ কর। কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যা কিছু বুঝতে পারা যায়, তা-ই হবে তোমার নিকট গ্রহণীয়, মাননীয়, পালনীয় ও অনুসরণীয়। তার নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনে বা তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করে বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিতে যাওয়া উচিত নয়। এ আহবান মুসলিম জনতাকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্ অধ্যয়নে ও তা থেকেই ব্যবহারিক বিধি-বিধান জানবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু উত্তরকালে এ মাযহাবের ধারক ও বাহকদের নিকটও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত ও হুকুম-আহকাম জানবার জন্যে 'কিয়াস'-এর প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। তাই তাঁরাও শেষ পর্যন্ত 'কিয়াস'কেও একাজের একটা উৎসরূপে গ্রহণ করতে রাযী হয়েছেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'দলীল' বা 'প্রমাণ'।

জাহেরী মাযহাবের সাহায্যকারী প্রচারক

দাউদ জাহেরীর এই মতটি বেশী প্রচার করেছেন তাঁরই পুত্র আবূ বকর মুহাম্মাদ। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে তাঁর চেষ্টায় এ মাযহাব যথেষ্ট প্রচারিত হয়। বিশেষ করে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত ও পারস্পরিক মতভেদের ক্ষেত্রে এই মাযহাব সুন্নাত ও হাদীসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। একারণে এ মাযহাবটি হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে প্রাচ্যের দেশসমূহে শাফেয়ী, মালেকী ও হানাফী মায্‌হাবের পরে চতুর্থ মায্‌হাবরূপে গণ্য হতে ও স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। তবে হিজরী পঞ্চম শতকে এই মায্‌হাবটি তার অর্জিত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। লোকেরা এই মতকে সম্পূর্ণ পরিহার করে এবং তার স্থান অধিকার করে নেয় হাম্বলী মায্‌হাব। কিন্তু জাহেরী মাযহাবের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রাচ্য দেশসমূহে হ্রাসপ্রাপ্ত বা বিলীন হয়ে গেলেও ঠিক এই পঞ্চম শতকেই তা

www.amarboi.org

আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে অতীব স্পষ্ট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করে বসে। আর তা সম্ভব হয় ইমাম ইবনে হাজামের বিরাট অবদানের কারণে। তিনি এই মাযহাবের মত গ্রহণ করে তাক্‌লীদ করতে বলিষ্ঠভাবে নিষেধ করেন এবং আন্দালুসিয়ার এক চতুর্থাংশ এলাকার উপর এই মাযহাবের প্রভাব-প্রতিপত্তি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইবনে হাজাম এই মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম রূপে গণ্য হতে থাকেন। ইমাম ইবনে হাজামের الاحكام في اصول الاحكام، নামক গ্রন্থ এবং জাহেরী ফিকাহ্‌র সর্বজন গ্রাহ্য المحلى في فروع الفقه গ্রন্থখানি এ মাযহাবের সুদৃঢ় স্তম্ভ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

www.amarboi.org

আইন প্রণয়নে চিন্তা-বিবেচনার প্রয়োগ ধারা

চিন্তা-বিবেচনা বা 'রায়' বলতে আমরা বুঝি, কোন বিষয়ে মন ও মগজ দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করা, প্রকৃত সত্য জানবার জন্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ ও নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে চূড়ান্ত সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালানো। কিন্তু এ কাজে ব্যক্তির খাম-খেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ থাকবে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনার পর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই হবে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। এ কাজে কখনও 'কিয়াস' পরিহার করা হবে, কখনও তার আশ্রয়ও নেয়া হবে এবং চরম সার্বিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে 'ইস্তিহ্সান' নীতি অনুসরণ করা হবে।

মদীনা যেমন হাদীসের পাদপীঠ ছিল, তেমনি কূফা ছিল চিন্তা-বিবেচনা নীতির প্রাণকেন্দ্র। তবে এদিক দিয়ে কূফা শহরের পূর্বেকার কোন খ্যাতি ছিলনা মদীনার মত। এ শহরের সুনাম-সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে যখন এখানে গোষ্ঠীগত মাযহাব গড়ে উঠে এবং ইমাম আবূ হানীফা আন্-নুমান তাঁর বিশেষ পদ্ধতির ফিকাহ্ নিয়ে এখানে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হন এবং হাদীসবাদীদের সাথে তাঁর ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে মত-পার্থক্য সূচিত হয়। এ সময় থেকেই মদীনার ফিক্হী মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় কূফার ফিক্হী মর্যাদা এবং চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত ফিকাহ্র কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত ইরাক, যেমন হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্র লীলাভূমি হয়ে দাঁড়ায় মদীনা।

চিন্তা-বিবেচনামূলক ফিকাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট ফিকাহ্বিদগণ কূফা নগরে একত্রিত হন এবং তাঁরা এ মাযহাবের ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। এ শহর ছিল হাদীসের প্রাণকেন্দ্র মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। হানাফী মায্হাবের আত্মপ্রকাশকাল সূচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত মদীনায় ফিকাহ্ সম্পর্কে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়নি। আর হানাফী মায্হাবের ফিকাহ্বিদদের নিকট ব্যাপকভাবে হাদীস পৌঁছায় নি। শুধু সেই হাদীসসমূহই এখানকার লোকেরা জানতে পেরেছেন, যা এখানে অবস্থান গ্রহণকারী সাহাবীদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল। এ সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আলী, হযরত সায়াদ ইবনে আবূ আক্কাস, হযরত আবূ মূসা আল-আশয়ারী, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ও হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াল্লাহু আনহুম। এই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, খিলাফতের কারণে মুসলিম সমাজ দ্বিধা-বিভিক্ত হয়ে পড়েছিল যে ফিতনার কারণে, তার উৎসমুখ ছিল এই ইরাক। শীয়া মতবাদ এখান থেকেই

www.amarboi.org

মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। খারেজী মতবাদেরও উৎস-ভূমি ছিল এই ইরাকই। এখানে এমন সব মুসলিম পরিচিতিসম্পন্ন লোক একত্রিত হয়েছিল, ঈমান যাদের মর্মমূলে পৌছায়নি। এখানে এমন সব লোকও ছিল, যারা নিজেদের মনগড়া কথা রাসূলে করীম-এর হাদীসরূপে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এক কথায় এখানকার পরিবেশই ছিল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এখানকার লোকদের আদত-অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এখানে এমন সব ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, যার কোন দৃষ্টান্ত না রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে দেখা গিয়েছে, না রাসূলের মদীনায় কোন দিন ঘটেছে সেই ধরনের ঘটনা। ফলে এতদাঞ্চলের ফিকাহ্‌বিদগণ সর্বপ্রথম যাঁর ফিকাহ্ পদ্ধতির সাথে পরিচিত এবং তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আর হযরত ইবনে মাসউদ শরীয়াতের হুকুম-আহকামের মৌল কারণ (علت) নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করার সরাসরি শিক্ষা লাভ করেছিলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট থেকে। যে বিষয়ে শরীয়াতের কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল নেই, সেখানে চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত মত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণই হল ফিকাহ্‌র এই ধারার মর্মকথা।

হযরত আলী (রা)ও কূফায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আমলে এই শহরই ছিল ইসলামী খিলাফতের রাজধানী-একথা ঠিক; কিন্তু তখনকার ফিত্না-ফাসাদ, খিলাফত সংক্রান্ত ঝগ্ড়া ও তদ্দরুণ সামাজিক তিক্ততা ও দলাদলির কারণে হযরত আলী (রা)র ফিক্‌হী মত অ-শীয়া সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে অগ্রবর্তী ফকীহ্ ছিলেন আলকামা ইবনে কাইস আন্-নাখয়ী। তিনি ছিলেন এ ফিকাহ্‌র এক বিরাট স্তম্ভ বিশেষ। এছাড়া ছিলেন আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ আন্-নাখয়ী, মাসরুর ইবনুল আজদা আল-হামাযানী, উবাইদাতা ইবনে আমর আস-সালমানী, শুরাইহ ইবনুল হারেস আল-কাযী ও আল-হারেসুল আওয়ার। এঁরা সকলেই প্রথম হিজরী শতকের ফিকাহ্‌বিদ। এঁদের পর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেন প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ইবরাহীম আন্-নাখয়ী। তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন এবং হযরত আবু সায়ীদ খুদ্‌রী ও হযরত আয়েশা (রা) এই দু'জন সাহাবীকে পেয়েছিলেন-যদিও শুনতে এবং শিখ্তে পারেন নি তাঁদের নিকট থেকে কিছুই। তাঁর পরে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এই শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীবদ্ধ মাযহাবটির ব্যাপক প্রচার লাভের মূলে ইমাম হাম্মাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের সমসাময়িক।

www.amarboi.org

হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্ যেমন হিজাজ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তেমনি চিন্তা-বিবেচনা নিঃসৃত ফিকাহ্ও কেবলমাত্র কূফা নগরীর ফিকাহ্বিদদের নিয়েই গড়ে উঠেনি। এই পদ্ধতির ফিকাহ্র এক বিরাট ব্যক্তিত্ব মদীনা নগরে বাস করতেন। তিনি হচ্ছেন রবীয়াতা ইবনে আবদুর রহমান 'ফর্রুখ'। তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য। তিনি এই চিন্তা-পদ্ধতির ফিকাহ্র এতটা অনুসারী ছিলেন যে, তিনি রবীয়াতা আর রায় (ربيعةالرائ) নামেই সমাজে পরিচিত হচ্ছিলেন। ১৩৬ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

চিন্তা-বিবেচনাপন্থী ফিকাহ্র মৌল ভাবধারা

চিন্তা-বিবেচনাপন্থী ফিকাহ্র মৌল ভাবধারা হল, আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়াত সম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট। রাসূলের ইন্তিকালের পূর্বেই এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, তাতে একবিন্দু অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতা নেই। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের শরীয়াত বিবেক-বুদ্ধিসম্মত,গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদৃঢ় মূলনীতি কার্যকারণ ও সুসংবদ্ধ যৌক্তিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। শরীয়াতের কোন বিধি-বিধানই এমন নয়, যার মর্মমূলে কোন অকাট্য যৌক্তিকতা ও কারণ নিহিত নেই। এ ভাবধারার কারণে এই পদ্ধতির ফিকাহ্বিদগণ উদার ও অকপটভাবে সে সব কারণ ও যৌক্তিকতা নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা, আলোচনা-পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন বোধে তর্ক-বিতর্ক করেন। তাঁদের মতে, শরীয়াতের প্রতিটি হুকুম-বিধি-বিধান যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার আওতাভুক্ত, তার কোনটিই এর বাইরে নয়। তাই বলে তাঁরা হাদীসের বর্ণনাকে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। তাঁরা হাদীসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে তাঁরা সব বিষয়ে শরীয়াতের দৃষ্টিতে ফতোয়া বা 'রায়' জানাতে দ্বিধাবোধ করতেন না এবং কোন ঘটনা ঘটবে, তারপর ফতোয়া চাওয়া হবে, তার অপেক্ষায় ফতোয়া দেয়া মুলতুবী হয়ে থাকবে, এটাও তাদের নিকট কোন শর্ত ছিল না; বরং তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন মাস্লা মনে করে-কল্পনা করে সাজাতেন এবং সে ব্যাপারে শরীয়াতের ভিত্তিতে কি সিদ্ধান্ত হতে পারে, তা বের করার জন্য চেষ্টা চালাতেন। এভাবে আনুমানিক ফিকাহ্র একটা বিরাট স্তুপ তাঁদের নিকট পূঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এর ফলে তাঁদের ফিকাহ্র আকার (Vollume) অনেক বড় হয়ে গেছে এবং তাতে বিপুল সংখ্যক ও বিচিত্র ধরনের মাসলা-মাসায়েল ও সে সম্পর্কে শরীয়াতের রায় একত্রিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত বা 'রায়-ভিত্তিক' ফিকাহ্র এই ব্যাপকতাই সম্ভবতঃ হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্র বিকাশ ও কাশকে প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ করেছে এবং এই দ্বিতীয় পদ্ধতির ফিকাহ্র

www.amarboi.org

ধারাটিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আর এর দরুণই সমস্ত ফিকাহ্‌বিদকে বিভিন্ন ধরনের মাস্‌লা অনুমান করা ও সে সম্পর্কে শরীয়াতের 'রায়' কি হতে পারে, তা নির্ধারণ করার কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছে।

এই পদ্ধতির ফিকাহ্‌র কার্যক্রম ও কর্মধারা হচ্ছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম-ধারার অনুসারী। মানুষের বাস্তব জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিকে ও ধাপে উদ্ভুত প্রয়োজনের স্বাভাবিক পরিণতি হল এই ফিকাহ্‌। কেননা মানুষের জীবনে ঘটনার কোন শেষ নেই, তাই প্রয়োজনও সীমাহীন; অথচ শরীয়াতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল সীমিত। ফলে ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী আইন-বিধান প্রণয়নে শরীয়াতের সাধারণ 'রূহ' বা ভাবধারাকে রক্ষা করে চিন্তা-বিবেচনার সাহায্যে ফিক্‌হী মাস্‌লা বের করা অত্যন্ত বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ পদ্ধতির ফিকাহ্‌বিদগণ মনে করেন, সুষ্ঠু অনাবিল চিন্তা-বিবেচনাপ্রসূত রায় বা মত অবশ্যই গ্রহণীয়। শরীয়াতের বহু হুকুম তথা বিধি-বিধান নির্ধারণে এছাড়া গত্যন্তর নেই; শুধু তা-ই নয়, শরীয়াতের বহু হুকুম আহকাম যথারীতি এরই উপর ভিত্তিশীল। দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও কসম-কিড়ার সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও 'রায়' প্রদান প্রভাবশীল ধারণা-অনুমানেরই-বা ধারণা-অনুমানের প্রাধান্যেরই-স্বাভাবিক পরিণতি। রাসূলে করীম (স) নিজে এই ভাবে 'রায়' দানের অনুমতি স্পষ্টভাষায় দিয়েছেন-অবশ্য যখন শরীয়াতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যাবেনা অনুরূপ ক্ষেত্রে। তিনি যখন হযরত মুয়ায ইবনি জাবাল (রা)-কে ইয়েমেন পাঠাচ্ছিলেন,তখন তিনি তাঁর 'সাক্ষাতকার' (Interview) গ্রহণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ

بِمَاذَا تَقْضِىْ

তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করবে?

জবাবে মুয়ায (রা) বললেনঃ

بِمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ اَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ اَجِدْ اَجْتَهِدُ بِرَائِىْ وَلَا اٰلُوْ۔

আমি বিচার-ফয়সালা করব আল্লাহ্‌র কিতাবে-কুরআন মজীদে-যা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে। তাতে না পেলে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে আর তাতে যদি না পাই, তাহলে আমি আমার 'রায়' দ্বারা 'ইজতিহাদ' করব এবং কোন কাজ করতে কুণ্ঠিত হব না বা ক্রটি করব না।'

www.amarboi.org

একথা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল আনন্দ-উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেনঃ

যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁর রাসূলের মতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার তওফীক দিয়েছেন, তাঁর হাম্‌দ্ ও শোকর।

হযরত উমর ফারূক (রা) খলীফাতুল মুসলেমীন হিসাবে কাযী শুরাইহ্‌কে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করে যে হিদায়েত দিয়েছিলেন, তাতে তিনি তাঁকে বলেছিলেনঃ

مَا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ اَحَدًا وَمَا لَمْ تَسْتَبِنْ فِي الْكِتَابِ فَالْزِمْهُ فِي السُّنَّةِ وَاِلَّا فَاجْتَهِدْ بِرَأْيِكَ.

যে বিষয়ের ফয়সালা তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবে পাবে. সে বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আর যে বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছু পাবে না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাসূলের সুন্নাতকে ভিত্তি করবে। আর যদি তাতেও কাজ না হয়, তা হলে তুমি তোমার 'রায়' দ্বারা 'ইজতিহাদ' করবে।

এসব ঐতিহাসিক-অকাট্য ও সুস্পষ্ট নীতি-নির্ধারণী-ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম (স) ও সাহাবীদের আমলে 'রায়' গ্রহণযোগ্য বিবেচিত ছিল। শরীয়াতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধান যে বিষয়ে পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানার জন্য 'রায়'কে প্রয়োগ করা হত। তাবেয়ীগণ এই উপায়টিকে কখনও একটা 'স্বতন্ত্র মৌল উপায়' রূপে গ্রহণ করতেন আবার কখনও সাহাবীদের প্রকাশিত ও বর্ণিত মত থেকে বিধি-বিধান বের করার কাজে এই পন্থাটির ব্যবহার করতেন। যদিও এ বের করার কাজটির ফলাফল বিভিন্ন রূপ হত। এভাবে পূর্ববর্তী সুফল ধারায়ই 'রায়' প্রয়োগ ও গ্রহণ করা হতে থাকে। অবশ্য ইরাকের ফিকাহ্‌বিদগণ একটি বিশেষ কারণে চিন্তা-বিবেচনার ভিড়-চাপে এক স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে তুলে নিয়েছিলেন। হাদীস সম্পদ এঁদের নিকট তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ের ফিকাহ্‌বিদদের তুলনায় এঁদের নিকট ফিকাহর মাসলা-মাসায়েল বহু ভাগে বিভক্ত ও বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাঁরা বিপুল বিশালতা সৃষ্টি করেন।

চিন্তা-বিবেচনা-ভিত্তিক মায্‌হাবের প্রধান শাখা

ব্যক্তিগত পর্যায়ে শরীয়াতের মাসলা-মাসায়েল নিয়ে যাঁরা চিন্তা-বিবেচনা করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে তাঁদের ছাড়া

www.amarboi.org

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম হাসান আল-বসরী। ফিকাহ্‌বিদ কাতাদাহ তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ

مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِرَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْهُ،

সর্বব্যাপারে উমর ফারূকের সাথে মতের অধিক সাদৃশ্য রক্ষাকারী হাসান বসরী অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি দেখতে পাইনি।

কোন কোন আলেম তাঁর দেয়া ফতোয়াসমূহ সাতটি দফ্‌তরে সংগ্রহ করেছেন। তিনি ১৮০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। হানাফী মাযহাবের ব্যাপক প্রচারের কারণে তাঁর নিজের মতের ভিত্তিতে গড়ে উঠা মাযহাব (School of Thought) নিঃশেষ হয়ে গেছে। যেমন 'জায়দীয়া' শীয়া মতের একটা ফির্কা। এ ফির্কার ফিকাহ্-সংক্রান্ত মত চিন্তা-বিবেচনা-ভিত্তিক ফিকাহ্‌র-হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্‌র তুলনায় অনেক নিকটবর্তী। কিন্তু এই ধারার ফিকাহ্ সমূহের মধ্যে হানাফী মাযহাবই সর্বাধিক প্রচার ও প্রকাশপ্রাপ্ত।

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফা আন্-নুমান ইবনে সাবিত (র)-এর নামের সাদৃশ্যে এই মাযহাবের নামকরণ হয়েছে 'হানাফী মাযহাব'। তিনি কূফা নগরে ৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরেই তিনি দ্বীনী ইল্ম ও ফিকাহ্ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। সর্বপ্রথম তিনি 'ইল্মে কালাম' বা 'ধর্ম দর্শন' পাঠে মনোযোগী হন এবং তাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি এ পর্যায়ে যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, তার নাম اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ। এর পর তিনি তাঁর লক্ষ্য ভিন্ন দিকে নিবদ্ধ করেন। তিনি ফিকাহ্ শিক্ষা লাভের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং হাম্মান ইবনে সুলাইমানের নিকট এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিক্ষাব্যপদেশে তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত এবং তিনি তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেন। এভাবে আঠারটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এরপর তাঁর ইন্তেকাল ঘটে। অতঃপর তিনি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ শুরু করেন।

ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন অতীব বিশ্বস্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কঠিন দায়িত্ববোধসম্পন্ন ফিকাহ্‌বিদ। হাদীস বর্ণনায়ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। আর তাঁর এ বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস ছিল তাঁর ব্যবসায়। ফিকাহ শাস্ত্রে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন শাসকদের পক্ষ থেকে ইমাম আবূ হানীফাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি ১৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ হানীফা শরীয়াতের মাসলা-মাসায়েলে চিন্তা-বিবেচনা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এ পদ্ধতিতে ফতোয়া দিতে তিনি কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি আনুমানিক ও কাল্পনিক বিষয়েও শরীয়াতের রায় ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করতেন।

ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব পরামর্শ-ভিত্তিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক ফসল। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত ও রায় কি হতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ করতেন। তাঁর নিকট যাঁরা ফিকাহ্ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁরা তাঁরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবাস করতেন, তাঁর এ পরামর্শ-চক্রের তাঁরাই ছিলেন সদস্য। এর কর্মধারা ছিল এরূপঃ প্রথমে তাঁদের সামনে একটা মাসলা-জিজ্ঞাস্য বিষয়-পেশ করা হত। পরামর্শ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য

www.amarboi.org

সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন-অনুসন্ধানের পর জবাব তৈরী করে দিতেন। পরে সেই মাসলা ও সে বিষয়ে পাওয়া জবাবসমূহ ইমাম আবূ হানীফার সমীপে পেশ করা হত। এ পর্যায়ে সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা ও যাচাই-পরখ করার পর পক্ষে বা বিপক্ষে একটা চূড়ান্ত মতে কিংবা সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। শেষ পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হত।

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা কেবলমাত্র 'রায়' ও চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে বহু সংখ্যক হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং 'রায়'কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি ফিকহী মত নির্ধারণে 'রায়' ও চিন্তা-বিবেচনাকেই নিরংকুশ প্রাধান্য ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষতঃ জাহেরী মতের ফিকাহ্‌বিদগণ দোষারোপ করেছেন এই বলে যে, হানাফী ফিকাহ্ আসলে পারসীয় দর্শনের চর্বিত চর্বন মাত্র। ফলে আল্লাহ্‌র নাজিল করা শরীয়াতের ফিকাহ্ কার্যতঃ মানব রচিত ফিকাহ্‌য় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সত্যি কথা হল, তিনি হাদীসের উপর 'রায়'কে উগ্রাধিকার দেননি; বরং তিনি শুধু কতিপয় 'খবরে ওয়াহিদ' হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বিরুদ্ধতা করেছেন। কিন্তু তিনি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এ বিরুদ্ধতা করেন নি, বিরুদ্ধতা করেছেন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের কারণে-ইজতিহাদের ভিত্তিতে। তিনি খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন শুধু একারণে যে, হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর শর্ত অত্যন্ত শক্ত, কঠোর এবং অতীব উচ্চ মানের। তবে উত্তরকালে তাঁর ছাত্র ও অনুসারীগণ তাঁর বর্ণনা করা বহু 'আসর' সংকলিত করেছেন। মুসনাদে ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, হাসান ইবনে জিয়াদ এবং আবূ হানীফার পুত্র হাম্মাদের মুসনাদ এই পর্যায়ে উল্লেখ্য। এই মুসনাদসমূহের সমষ্টি সংখ্যা হল পনের খানি। খাওয়ারিজমী তাঁর جَامِعُ الْمَسَانِيْدِ নামক গ্রন্থে এই সব কখানি মুসনাদই একত্রিত করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ কূফা-কেন্দ্রিক এই ফিকাহ্‌ই সর্বপ্রথম শরীয়াতী কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেছে। হানাফী মাযহাবও এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ইমাম আবূ হানীফার ফিকাহ্-বিশেষ করে 'মুয়ামিলাত-পারস্পরিক ব্যাপারাদি সংক্রান্ত মাসলাসমূহে এই কৌশলকে পুরাপুরি গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নতমানের আদর্শ ও বাস্তব ঘটনা এবং ফিকাহ্ ও জীবনের পারস্পরিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত চেষ্টা-সাধনার ফসল হিসাবেই এ জিনিসটি ফিকাহ্‌র অংশ ও অঙ্গ হয়ে আছে।

www.amarboi.org

বস্তুতঃ ইমাম আবূ হানীফাই সর্বপ্রথম 'কিয়াসের' ভিত্তিতে ফিকাহ্ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন।

শরীয়াতের বিধি-বিধান বের করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার পদ্ধতি

শরীয়াতের হুকুম-আহকাম বের করার ব্যাপারে এই মাযহাবের নীতি হল-সর্ব প্রথম আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এ ব্যাপারে অন্যান্য মাযহাবের ফিকাহ্র সাথে এর কোন পার্থক্য নেই, যদিও কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ, তার ইশারা-ইঙ্গিত থেকে শরীয়াতের লক্ষ্য অনুধাবন এবং তা থেকে মাস্‌লা বের করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে।

কুরআনের পর এই ফিকাহ্র দ্বিতীয় লক্ষ্য-বিন্দু হচ্ছে সুন্নাত-হাদীস। হাদীস গ্রহণ করা, তার অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণ এবং হাদীসের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে খুব বেশী কড়াকড়ি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ মাযহাবে কেবলমাত্র সেই হাদীসই গ্রহণীয় যা মুতাওয়াতির, যা বহু লোক বহুসংখ্যক লোক থেকে বর্ণনা করেছেন। কিংবা সেই হাদীস, যা পরিভাষানুযায়ী 'মশহুর' রূপে পরিচিত-দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ তাবেয়ীদের যুগ থেকেই বিভিন্ন শহরে ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ যে অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত কিংবা কোন একজন সাহাবী যে হাদীসকে বহু সংখ্যক সাহাবীর সামনে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের কেউই তাঁর বিরোধিতা করেননি। এরপর হানাফী ফিকাহ্ লক্ষ্য নিবদ্ধ করে সাহাবীদের যুগের 'আমলের' দিকে। তাঁরা কোন বিষয়ে বা নির্দিষ্ট কোন ঘটনার কিংবা অনুরূপ কোন বিষয়ের হুকুমের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন কিনা, তা বিবেচনা করে দেখা হয়। যদি তেমন কিছু পাওয়া যায়, তাহলে তা তাঁরা মেনে নেন ও অনুসরণ করেন। আর তা-ও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তাঁরা 'কিয়াস' ও 'ইস্তেহ্‌সান'-এর দৃষ্টিতে কোন 'রায়' ঠিক করে সেই অনুযায়ী করণীয় বিষয় স্থির করেন। এ মাযহাবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুব বেশী কড়াকড়ি করা হয়েছে এবং অ-মশ্‌হুর 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণ না করার কারণে চিন্তা-বিবেচনা প্রয়োগে ইজতিহাদের কাজ এটি অনেক বেশী ও ব্যাপকভাবে করেছে।

বস্তুতঃ যখন কোন 'নচ্ছ্'-অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল-পাওয়া যেত না, ইমাম আবূ হানীফা কেবলমাত্র তখনই চিন্তা-বিবেচনার আশ্রয় নিতেন। কেননা 'নচ্ছ্' তো সীমিত আর ঘটনা সীমাহীন ও বিচিত্র। যা সীমাবদ্ধ তা কখনও সীমাহীনকে আয়ত্তাধীন করতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা কোন সহীহ্ হাদীসের বিরুদ্ধতা করেন নি। তিনি শরীয়াতের হুকুম-আহকাম বের করা পর্যায়ে তাঁর অনুসৃত নীতি তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন এ ভাষায়ঃ

www.amarboi.org

إِنِّىْ اٰخُذُ بِكِتَابِ اللّٰهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَمَا لَمْ اَجِدْ فِيْهِ اَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَالْاٰثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِىْ فَشَتْ فِىْ اَيْدِى الثِّقَاتِ فَاِذَا لَمْ اَجِدْ اَخَذْتُ بِقَوْلِ اَصْحَابِهٖ مَنْ شِئْتُ وَاَدَعُ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ اَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ اِلٰى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَاِذَا انْتَهَى الْاَمْرُ اِلَى التَّابِعِيْنَ فَلِىْ اَنْ اَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوْا،

আমি আল্লাহ্‌র কিতাব-আল্লাহ্‌র কিতাবের ঘোষণা বা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি, যখন তা পাই। যে বিষয়ে কুরআনের কোন ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত পাই না, সে বিষয়ে আমি রাসূলের সুন্নাত এবং তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ কথা-যা বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য লোকদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে-গ্রহণ করি। তা-ও যখন পাই না, তখন রাসূলের যে-কোন একজন সাহাবীর অভিমত (উক্তি বা কথা) গ্রহণ করি, যাঁর আমি গ্রহণ করতে চাই আর গ্রহণ করি না, যাঁরটা গ্রহণ করতে আমার ইচ্ছা হয় না। এর পর আমি তাদের 'অভিমত' থেকে অন্যদের অভিমত পানে বের হয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি তাবেয়ীদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা হলে তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেন, সেরূপ ইজতিহাদ করার ইখতিয়ার আমারও আছে মনে করে আমিও ইজতিহাদ করি।

হানাফী মাযহাব প্রচারে সাহায্যকারীদের অবদান

ইমাম আবূ হানীফার চারদিকে কূফার বিপুল সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ একত্রিত হয়েছিলেন। হাম্মাদ ইবনে সুলাইমানের শিক্ষাকেন্দ্রে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁরাও ইমাম আবূ হানীফার গোষ্ঠীভুক্ত বলে গণ্য হতেন। এঁদের মধ্য থেকেই ইমাম আবু ইউসুফ (মৃতঃ ১৮২ হিঃ) আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রথম দিকে ফিকাহ্ পারদর্শী ইবনে আবূ লাইলার নিকট ফিকাহ্ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মদীনা গিয়ে ইমাম মালিকের নিকট হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি হাদীস ও শরীয়াতের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান-সম্ভারে সুসমৃদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরিণামে তিনি হন ফিকাহ্‌র উভয় ধারার সমন্বয়কারী। তিনি এ দুটি ধারাকে পরস্পরের অতি নিকটবর্তী করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ইমামের সাথেও মতবিরোধ করেছেন-মাসলার মূল কারণ

www.amarboi.org

নির্ধারণ কিংবা 'রায়' গ্রহণ না করে তাঁর নিকট পৌঁছা ও তাঁর মতে সহীহ্ রূপে নির্ণিত 'আসর' গ্রহণ করার কারণে। তিনি ১৬৬ হিজরী সনে তৎকালীন সরকারের বিচারপতি রূপে নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি প্রধান বিচারপতি রূপেও কাজ করেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় এবং খলীফার নৈকট্য লাভের কারণে তিনি হানাফী মাযহাবের ব্যাপক ও বলিষ্ঠভাবে প্রচার চালাতে সক্ষম হন। তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ীই বিচার কার্য চালাতেন। তাঁর রচিত দু'খানি প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম হলঃ

① اَلرَّدُّ عَلٰى سِيَرِ الْاَوْزَاعِىِّ-

② كِتَابُ الْخَرَاجِ-

শেষোক্ত কিতাবখানি তিনি লিখেছিলেন আব্বাসীয় খলীফা হারুন আর-রশীদের অনুরোধক্রমে। কথিত আছে, খলীফা এই গ্রন্থখানি তাঁর রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

আবূ ইউসুফের পর ইমাম আবূ হানীফার ছাত্রদের মধ্য থেকে দ্বীনী জ্ঞানের মহা দিকপাল রূপে দ্বিতীয় যিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্ শাইবানী। তিনি ১৮৯ হিজরী সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার নিকট খুব বেশীদিন শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। কেননা এই শিক্ষালাভ কালেই ইমামের ইন্তিকাল হয়ে যায়। এসময় ইমাম মুহাম্মাদ মাত্র বিশ বছর বয়সের যুবক ছিলেন। এজন্যে পরে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হেজাজ গমন করেন এবং তথায় ইমাম মালিকের নিকট হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি ইমাম আওজায়ীর নিকটও ফিকাহ্শাস্ত্র পাঠ করেন। ফলে ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ ইউসূফের মতই হাদীস ও চিন্তা-বিবেচনা ফিকাহ্র এই দুটি ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী ফিকাহ্ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন ইরাক গিয়েছিলেন, তখন ইমাম শাফেয়ীর নিকটও ফিকাহ্র পাঠ করেন।

ফিকাহ্র মৌলনীতির ভিত্তিতে খুঁটিনাটি মাস্লা-মাসায়েল রচনা ও হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্ সংকলন করে ইমাম মুহাম্মাদ হানাফী মাযহাবের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ পর্যায়ে তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে জাহেরী রেওয়ায়েতের আল-মাবসুত, আজ্-জিয়াদাত, আল-জামেউস্-সগীর, আস-সিয়রুস সগীর, আস-সিয়ারুল কবীর, আল-জামেউল কবীর-এই মোট ছয়খানি গ্রন্থ ফিকাহ্ শাস্ত্রের ছয়টি সু-উচ্চ স্তম্ভের মত এবং বিশ্ব মুসলিমের নিকট সুপরিচিত। এ গ্রন্থ ক'খানিই হচ্ছে হানাফী ফিকাহ্র মৌল ভিত্তি। এক সঙ্গে এর নাম হচ্ছে مَسَائِلُ الْاُصُوْلِ এই ছয়খানি গ্রন্থই 'আল কাফী' নামক

www.amarboi.org

গ্রন্থে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। এ কাজটি করেছেন আল হাকেম আশ্‌শহীদ। বহু সংখ্যক বড় বড় ফিকাহ্‌বিদ এ গ্রন্থের শরাহ বা ব্যাখ্যা লিখেছেন। এই পর্যায়ে প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ আস-সরখসীর রচিত গ্রন্থের নাম اَلْمَبْسُوْط । ইমাম মুহাম্মাদ ফিকাহ্‌র আরও বহু মাসলা-মাসায়েল সংকলিত করেছেন। ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ তার নাম দিয়েছেন 'আন-নাওয়াদির'। এ পর্যায়ে তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম এইরূপঃ (১) আল-হারুনিয়াত; খলীফা হারুন-আর রশীদের আমলে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে এই রূপ নামকরণ করা হয়েছে। (২) আল-কাইসামিয়াত; এতে গ্রন্থের বর্ননাকারী 'শুয়াইবুল কাইসানী' (شعيب الكيسانى)র সাথে তাঁর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। (৩) আর্‌-রক্কীয়াত (الرّقيات); ইমাম মুহাম্মাদ রক্কার বিচারপতি থাকাবস্থায় যে সব মাস্‌লা বের করেছেন, তারই সংকলন হচ্ছে এই কিতাব।

মোটকথা, হানাফী মাযহাবের ফিকাহ সংকলনে ইমাম মুহাম্মাদের অবদান অতুলনীয়। তাঁর সংকলিত 'আল-ফতোয়া' ও 'আল ওয়াক্কিয়াত' নামেও এই মাযহাবের কিতাব রয়েছে। পূর্বোক্ত জাহেরী রেওয়ায়াতের কিতাব ও আন-নাওয়াদির গ্রন্থসমূহে যে সব বিষয়ে শরীয়াতের 'রায়' জানা যায়নি, পরবর্তীকালে হানাফী মাযহাবের অন্যান্য মুজতাহিদগণ সেসব বিষয়ে শরীয়াতের 'রায়' বের করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদের পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীতে সে সব মাসলাই সংকলিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর দুই জন সংগী (صاحب) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের সঙ্গে ফিকাহ্‌র বহু মাসলায় বিশেষ মতভেদ হয়েছে। এ মতভেদ অন্যান্য মাযহাবের পারস্পরিক মতভেদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তবে মনে রাখা আবশ্যক, এ 'মতভেদ'-এর অর্থ দলীলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যিনি যে মতই প্রকাশ করেছেন, আসলে তা কোন সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীল বা তার তাৎপর্য-পার্থক্যেরই ফসল মাত্র। দলীলের বা তার তাৎপর্যের পার্থক্যের কারণেই এই মত-পার্থক্য, ভিন্ন ভিন্ন মত। কিন্তু এতে কোন বিরোধ নেই। তাই উস্তাদ ও শাগরিদ বা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেও এ মত-পার্থক্য হতে কোন অস্বাভাবিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মাযহাবসমূহের পরিচিতি এবং সেসব মাযহাবের সুসংগঠিত হয় উঠা ও তার ধারা-প্রবাহ পর্যায়ে আলোচনা এখানে শেষ করা হচ্ছে। এ থেকে ইসলামী ফিকাহ্‌র উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য যথেষ্ট মাত্রায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে বলে মনে করি।

তবু ইসলামী ফিকাহ্‌র এতটা সম্প্রকাশিত, সম্প্রসারিত ও সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠার কার্যকারণ পর্যায়ে আরও কিছু বক্তব্য রাখা দরকার।

www.amarboi.org

ফিকাহ্‌র উৎকর্ষ লাভের কারণ

এই সময় অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বহু সংখ্যক 'আলিম' ইসলামী ফিকাহ্‌র ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে 'ইল্‌মে ফিকাহ্' হাদীস ও আকায়েদ থেকে একটা ভিন্নতর ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইল্‌ম বা বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে। এই সময় মুসলিম জনতাও এর প্রতি প্রচণ্ডভাবে ঝুঁকে পড়ে ও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ফিকাহ্ শিখবার ও জানবার জন্যে ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়ে উঠে। কেননা তাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল যে, ফিকাহ্ শিখলে ও জানতে পারলে তারা ব্যবহারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম জানতে পারবে, তাদের সামগ্রিক জীবন শরীয়াত মুতাবিক গড়ে উঠবে। এভাবেই তায়াত॥ ।আল্লাহ্‌নুগত্য ও আল্লাহ্‌র ইবাদাত-বন্দেগীর যা কিছু বাস্তব বিধান, তা পুরাপুরি পালন করা সম্ভবপর হবে। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা থেকে যেসব মুসলমান বহু দূরে চলে গিয়েছিল এবং প্রয়োজনের সময় কারো নিকট মাসলা জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, তারা ফিকাহ্‌র প্রতি সমধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে দূর দূর অঞ্চলের যেসব লোক ইসলাম কবুল করেছিল এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যে সব অমুসলিম ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিল, তাদেরও মনে ফিকাহ্ শিখবার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রকট ও তীব্র। যেসব বিদেশী লোক ইসলামী রাজ্যে অল্প দিনের বসবাসের জন্যে প্রবেশ করত,তারাও ফিকাহ্ শিক্ষা লাভ করত। এ সব কারণে 'ফিকাহ্' একটি বিরাট শাস্ত্রে পরিণত হয়, ফিকাহ্‌বিদগণ মুসলিম বিশ্বের দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েন এবং ফিকাহ্‌বিদ্‌দের চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্র অনেক বিশালতা লাভ করে। এর ফলে তাঁদের মন-মানস ও চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। দিন যতই অগ্রসর হতে থাকে, নিত্য-নতুন সমস্যা দেখা দেয়। ফিকাহ্‌বিদগণ সেসব বিষয়ে শরীয়াতের রায় জানবার জন্যে নতুন উদ্যমে চিন্তা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। শরীয়াতের অনেক মাসলা রেখা-চিত্র, জ্ঞান-চর্চা ও তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে ও মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। সেই সঙ্গে এ ব্যাপারটিও যথেষ্ট সাহায্য করে যে, বিপুল সংখ্যক অনারব দ্বীন-ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারা যে সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গরিমার ধারক ছিল, তা শিক্ষিত লোকদের মন-মানসকে অধিকতর তীক্ষ্ণ, শাণিত ও সূক্ষ্মদর্শী বানিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে ফিকাহ্‌র মাসলা-মাসায়েল নিয়ে গভীর ও

www.amarboi.org

সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা ও যাচাই-পরখ করার একটা সাধারণ প্রবণতা ও দক্ষতার সৃষ্টি হয়।

আমরা যে সময়ের কথা এখানে আলোচনা করছি, সে সময়ে মুসলিম মনীষার চরম ও পরম বিকাশ ঘটেছিল এবং জীবনের সর্বদিক ও বিভাগকে তা আলোকমণ্ডিত করে তুলেছিল। এ সময়ই রাসূলের হাদীস সংকলিত হয় এবং তা পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক হয় হাদীসের গ্রন্থাবলী। অন্যদিকে ফিকাহ্ এক স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'শাস্ত্র' রূপে গড়ে উঠে এবং ফিকাহ্‌র মূলনীতিসমূহ রচিত ও নির্ণিত হয় এসময়ই। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যক তাফসীর এসময়ই রচিত ও লিখিত হয়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও এই সময়ই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। যথাঃ দর্শন, যুক্তি বিজ্ঞান (মনতিক) এবং অন্যান্য ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান। এই সবই ফিকাহ্‌র চরম উৎকর্ষ লাভে বিশেষ সহায়ক হয়ে দেখা দেয়।

এই পর্যায়ে আরও একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার; তা হল ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য। এ পার্থক্য যতই গভীর ও প্রকট হোক না কেন, তাতে শরীয়াতের কোন দোষ ত্রুটি প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তবু এর মৌল কারণ অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।

www.amarboi.org

ফিকাহ্‌বিদদের মত-পার্থক্য

ফিকাহ্‌র হুকুম-আহকাম প্রধানতঃ ইজ্‌তিহাদেরই স্বাভাবিক ফসল। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট-অকাট্য দলীল অনুধাবন, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপলব্ধিকরণ এবং তার গভীর অর্ন্তমূলে নিহিত কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, সদৃশ ঘটনার সাথে সদৃশ ঘটনার তুলনা. যে বিষয়ে কোন দলীল নেই, সেক্ষেত্রে শরীয়াতের মৌল ভাবধারা বুঝতে চেষ্টা করা অথবা মূল দলীলের বাহ্যার্থ থেকেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যে বিষয়ে স্পষ্ট-অকাট্য দলীল রয়েছে, তার মৌল কারণ বিচার-বিবেচনা করা প্রভৃতিই হচ্ছে ফিকাহ্‌র উৎস ও উপায়। কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব গ্রহণের পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকও। তাই এই পার্থক্যের কারণে ও অনিবার্য পরিণামে ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রেও মতের পার্থক্য হওয়া একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

কিন্তু এ পার্থক্য সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য। ফিকাহ্‌বিদদের এ মত-পার্থক্য মূল ফিকাহ্‌র পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতিকর নয়-নয় কোন রূপ দোষ প্রকাশক; বরং এটা হচ্ছে চিন্তা-বিবেচনার পরিপক্কতার লক্ষণ। বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ

আমার উম্মাতের পারস্পরিক মত-পার্থক্য রহমাত স্বরূপ।

এর নির্গলিতার্থ এই হতে পারে যে, ইজতিহাদ করার সুযোগ থাকার কারণে বিভিন্ন লোকের ইজতিহাদের ফলে মতের ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা দেয়, তা মুসলমানের জন্য কিছুমাত্র ক্ষতিকর বা অকল্যাণকর হয় না-হওয়া উচিত নয়। তাতে বরং লোকদের জন্যে শরীয়াতের হুকুম পালনে প্রশস্ততা, উদারতা-উন্মুক্ততা এবং বাস্তব সুবিধা লাভ হয়ে থাকে।

ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে ইজতিহাদের পরিণামে এই উদারতা-প্রশস্ততাই মুসলিম উম্মাতের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। পূর্ববর্তী লোকেরা যখন কোন একটি মাসলার ব্যাপারে শরীয়াতী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন মত প্রকাশ করতেন, তখন দলীলের ভিত্তি ও দলীলের শক্তির আনুপাতিকতার তুলনামূলক আলোচনার ফলে মতের ঐক্য সৃষ্টির জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু মতের ঐক্য সৃষ্টি করা যদি

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত সম্ভব না-ই হত, তা হলে প্রত্যেকেই নিজের মতে অবিচল থেকেও বিপরীত মতাবলম্বীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা পোষণ করতেন। এই সময় তাঁর মানসিক অবস্থার রূপ হত এইঃ

إِنَّ رَأْيَهُ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَإِنَّ الرَّأْيَ الْمُخَالِفَ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

আমার মতই সঠিক, যথার্থ। তবে ভুল যে হতে পারে না তা নয়। আর অন্য মতটি ভুল বটে তবে তা যে সত্য হতেই পারে না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

ঠিক এ কারণেই আলোচ্য যুগের ফিকাহ্‌বিদগণ প্রত্যেক মাযহাবের ইমাম-তাঁর অনুসারীদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন যে, তাঁর ফিকাহ্ নিছক তাঁর একটা মত ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মত মানতেই হবে-বাধ্যতামূলকভাবে, তা জরুরী নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দিতেনঃ

عِلْمُنَا هٰذَا رَأْيٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ لَا أَدْرِي إِنْ كَانَ قَوْلِي هُوَ الْحَقُّ فَقَدْ يَكُونُ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

আমরা জানি এ একটা মত মাত্র। আমার শক্তি-সামর্থের বিচারে এ মতই হচ্ছে সর্বোত্তম। কেউ যদি এর চাইতেও সুন্দরতম ও অধিক যথার্থ মত পেশ করেন, তবে যথার্থতায় তা-ই হবে অধিক অগ্রগণ্য। আল্লাহ্‌র শপথ, প্রকৃত ব্যাপার তো আমি জানি না। আমার এই মতটাই যদি যথার্থ ও সত্য হয়, তা হলে যে মতটি বাতিল, সেটির বাতিল হওয়ায় কোনই সন্দেহ থাকবে না।

ইমাম মালিক সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي كُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوهُ.

আমি একজন মানুষ বইতো নই। আমার ভুলও হতে পারে আর আমার মত যথার্থও হতে পারে। কাজেই তোমরা সকলে অবশ্যই আমার মতের যথার্থতা বিচার-বিবেচনা করে দেখবে। যে মত কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক হবে, কেবল তা-ই গ্রহণ করবে আর যা এ দুটির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তাকে তোমরা বর্জন ও পরিহার করবে।

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী বলেছেনঃ

لَا تُقَلِّدُونِى وَاِذَا صَحَّ خَبَرٌ يُخَالِفُ مَذْهَبِى فَاتَّبِعُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّهُ مَذْهَبِى،

তোমরা আমার মত গ্রহণের জন্যে নিজেদের বাধ্য মনে করবে না। আমার মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস যদি সহীহ্ হয়, তা হলে তোমরা তা-ই গ্রহণ কর ও মেনে চল এবং জেনে রাখ, সেটাই আমার মাযহাব।

ইমাম ইবনে হাম্বল বলতেনঃ

اُنْظُرُوا فِى اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَاِنَّ التَّقْلِيْدَ لِغَيْرِ الْمَعْصُوْمِ مَذْمُوْمٌ

তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারগুলো নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখ। কেননা যে লোক নির্ভুল-নিষ্পাপ নয়, তার বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা অত্যন্ত নিন্দার্হ।

এ হল ফিকাহ্ ও মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বড় বড় মনীষীদের উক্তি-ঘোষিত নীতি ও আদর্শ। এঁদের ছাড়া জাহেরী ফিকাহ্‌বিদদের তো স্থায়ী ঘোষিত নীতিই হল, তাকলীদ-অন্ধভাবে কারো অনুসরণ করা যাবে না। তাকলীদ করা মহাপাপ।

ফিকাহ্ জ্ঞানের এ পরিপক্কতার প্রভাব প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপর প্রতিফলিত হয় সরাসরিভাবে। তাঁরা অগ্রসর হয়ে ইজতিহাদের সাহায্যে মাযহাবকে অধিকতর মজবুত ও সুদৃঢ় করে তোলেন। তার পূর্ণত্ব বিধানের জন্যে কাজ করেন অবিশ্রান্তভাবে। তাঁরা চুল-চেরা বিচার-বিবেচনা করে শরীয়াতের প্রত্যেকটি হুকুমের মূলে একটা কারণ-একটা যৌক্তিকতা নির্ধারণ করেন। তাঁদের ইমামগণ মাসলা বের করার-ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত করার নিয়ম-নীতিসমূহকে আলাদা-আলাদা করে ও সুস্পষ্ট করে তোলেন। শুধু এটুকু করেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেন নি। সেই সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মাযহাবের সাথে কিছু সংখ্যক লোক এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যাঁরা মাযহাবের নিজস্ব নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদের কাজ করেছেন সার্বক্ষণিকভাবে। এভাবেই প্রতিটি মাযহাব বিকশিত, সম্প্রসারিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে; সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ফিকাহ্ জ্ঞানের বিপুল ঐশ্বর্য বৈভবে।

www.amarboi.org

ইসলামী ফিকাহ্‌র উৎস ও ইসলামী আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

সূচনা

প্রতিটি বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলার কোন-না কোন 'হুকুম' রয়েছে। কিন্তু তিনি ঘটনা ও বিষয়াদির অল্প কিছু অংশ সম্পর্কেই স্পষ্ট-অকাট্য দলীল (নচ্ছ্) পেশ করেছেন আর অধিকাংশ সম্পর্কেই কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল পেশ করেন নি। তবে সেসব ক্ষেত্র ও বিষয়েও তিনি এমন সব লক্ষণ ও নিদর্শন রেখে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে জ্ঞানবান মুজতাহিদগণ শরীয়াতী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন; সে লক্ষণ ও নিদর্শনাদি তাঁদের হাত ধরে তাঁদেরকে পৌঁছে দেয় সেই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত।

ফিকাহ্‌র হুকুম-আহকাম প্রধানতঃ দু'ধরনের। হয় তা কোন সুস্পষ্ট-অকাট্য প্রমাণসম্পন্ন উৎস থেকে উৎসারিত–তা কুরআন বা 'মুতাওয়াতির' সুন্নাত যা-ই হোক না কেনঃ যেমন নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাত দেয়া ও সামর্থ্যবানের জন্যে হজ্জ করা ফরয হওয়া। অথবা তা কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণ সে বিষয়ে ইজমা–ঐকমত্য–গঠন করেছেনঃ যেমন দাদী-নানীর ছয় ভাগের এক ভাগ মীরাসের অংশ লাভ এবং পুত্রের বর্তমান থাকা অবস্থায় পুত্রের পুত্রের মীরাস বঞ্চিত হওয়া। এই দুই ধরনের শরীয়াতী হুকুম-সিদ্ধান্ত এমন যে, এর কোনটিরই বিরুদ্ধতা করা সম্ভব নয়; এর বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও সঙ্গত হত পারে না। কেননা এ হচ্ছে শরীয়াতের বাধ্যতামূলক আইন। এ আইন ভঙ্গ করা যেতে পারে না–করা যেতে পার না এ বিষয়ে নতুন কোন ইজতিহাদ।

কিন্তু যে সব হুকুম-আহকাম এমন সব 'নচ্ছ্' বা অকাট্য-স্পষ্ট দলীল থেকে গৃহীত যা এমন একটা তাৎপর্য প্রকাশ করে যা আনুমানিক, অকাট্য ও দৃঢ় প্রত্যয়মূলক নয়–আর তাও একারণে যে, ব্যবহৃত শব্দের বহু সংখ্যক অর্থই হতে পারে; কিংবা তা গৃহীত এমন সব 'নচ্ছ্' থেকে যা তার অর্থ অকাট্যভাবে প্রকাশ করে, কিন্তু সে সবের প্রামানিকতা ও শরীয়াতদাতার কথা হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্য নয়, যেমন 'খবরে ওয়াহিদ'। সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের মাসলায় ইজতিহাদ হতে পারে নচ্ছ্-এর ভিত্তিতে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কাজ হল 'নচ্ছ্' প্রমাণ করার জন্যে।

হুকুম-আহকাম যদি এমন হয় যা কোন 'নচ্ছ্' থেকে প্রমাণিত নয়, যা নয় মুজতাহিদদের ইজ্‌মা করার উপযুক্ত কোন বিষয়, যা মুজতাহিদগণ 'নচ্ছ্' ও

www.amarboi.org

'ইজমা' না থাকার ফলে নিজেদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ভিত্তিতে ও সামগ্রিক শরীয়াতের আলোকে বুঝতে পেরেছেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, সংকলিত ফিকাহ্‌র অধিকাংশ মাসলার হুকুম এই পদ্ধতিতেই উদ্ভাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ বিপুল ও বিশাল। এ ইজতিহাদ মেনে নেয়ার জন্যে মুজতাহিদ নিজে বাধ্য আর সেও যে তার নিকট ফতোয়া চাইবে।

মোটকথা, প্রত্যেকটি আইনগত মৌল নীতিই কুরআন মজীদ ও সহীহ্ সপ্রমাণিত সুন্নাহ্ বা হাদীস থেকেই উৎসারিত ও গৃহীত অথবা তা দ্বীনের অনিবার্য কারণে জানা গেছে এবং তার উৎসও দ্বীন ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া আর যে মৌল নীতিই রয়েছে, ফিকাহ্ই তার উৎস।

এককথায়, ইসলামী ফিকাহ্য় সব হুকুম-আহকামই এমন সব উৎস থেকে পরিগৃহীত, যা অহীর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের নিকট এসেছে। এর মধ্যে কুরআনই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান উৎস, যার শব্দ ও অর্থ বা মূল বক্তব্য—সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া। আর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাত। সুন্নাত হচ্ছে কেবলমাত্র তা যা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত ও বিবৃত হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম এইরূপ; তা-ও মূলগতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া। কেননা রাসূলে করীম (স) নিজ ইচ্ছামত কখনও কোন কথা বা আইন-বিধান ব্যক্ত করেননি। তৃতীয় হচ্ছে ইজমা। এটিও শরীয়াতের অকাট্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে যে মুসলিমদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করবার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইজমা সেই পর্যায়ের জিনিস, যা অনুসরণ করা অনিবার্যভাবে কর্তব্য। এ ছাড়া আর যা কিছু, তা শুধু ইশারা-ইঙ্গিত; শরীয়াতের হুকুম বের করার সময় সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিই এই ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে সে পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়াতের অকাট্য-স্পষ্ট দলীল—'নচ্ছ্'ই হচ্ছে হুকুম-আহকাম জানার উপায়। সে 'নচ্ছ্' কুরআন ও সুন্নাতে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে এমন সব দলীলও উপায়, যা নচ্ছ্-এর অনুপস্থিতির কারণে আইনপ্রদাতা হিদায়েত লাভের জন্যে তা দাঁড় করিয়েছে।

ফিকাহ্‌র মূলনীতি সংক্রান্ত ইল্‌ম (عِلْمُ اُصُوْلِ الْفِقْهِ) বলতে এমন সব নিয়ম বুঝায়, যা অনুসরণ করে মুজতাহিদ ফিক্‌হী হুকুম-আহকাম বের করতে পারে। এ মূলনীতি সমূহই ইজতিহাদের কাজকে সহজ ও সরল বানিয়ে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফিকাহ্‌র আসল উৎস ও আনুসঙ্গিক উৎস পর্যায়ে আমরা এরপর খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব।

www.amarboi.org

ইসলামী আইনের মৌল উৎস
(Principal source of Islamic Laws)

কুরআন ও সুন্নাতই হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত তথা ইসলামী আইনের মৌল উৎস। এ দুটি উৎস স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত। এ দুটির যে কোন একটি থেকে ইসলামী আইন ও শরীয়াত লাভ করা যেতে পার। (এ দুটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরই করা হচ্ছে।) ইজতিহাদও বহু সংখ্যক হুকুম-আহকামের উৎস বটে; কিন্তু তার মর্যাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য-নিরপেক্ষ নয়। ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইন বের করা এবং তদনুযায়ী আমল করার অপরিহার্যতা কুরআন-সুন্নাহ্ থেকেই প্রমাণিত। কাজেই ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামী আইন রচনার এক আনুষঙ্গিক উৎস (تبعى)।

প্রথমঃ কুরআন মজীদ

কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম—আল্লাহ্‌র কিতাব। মূলতঃ তা-ই হচ্ছে নভোমণ্ডলের গভীর ও গোপন রহস্যের উদঘাটক, বিশ্বলোকের উপর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বিচ্ছুরিত নির্মল আলোক-ধারা। এ এমন একখানি কিতাব, যার আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়া এবং তাতে বিবৃত সব কিছুর পরম ও অকাট্য সত্য হওয়ায় একবিন্দু সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় করে যারা আল্লাহ্‌র বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত, এ গ্রন্থ তাদেরই জন্যে জীবন-বিধান, তাদেরই প্রদর্শন করে নির্ভুল সত্য ও শাশ্বত পথ। শুধু প্রদর্শনই করে না, সে পথে চালিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার ব্যাপারেও এই গ্রন্থ পুরোপুরি আনুকূল্য দান করে।

আল্লাহ্ তা'আলা অহীর মাধ্যমে এই গ্রন্থখানি তাঁর প্রিয় নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাজিল করেছেন। এর শব্দ-ভাষা-অর্থ-মর্ম সবই আল্লাহ্‌র, তাঁরই নিকট থেকে অবতীর্ণ। এই গ্রন্থের ভাষা আরবী। যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থ একদিকে বিপথগামীদের সাবধান ও সতর্ক করে। অন্যদিকে আল্লহ্‌হানুগত লোকদের জন্যে বিরতণ করে সুসংবাদ, শুভফল ও পরিণতির আশ্বাসবাণী।

এই গ্রন্থখানি ঠিক যেভাবে নবী করীম (স)-এর প্রতি নাজিল হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে এখন পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর নিকট বর্তমান রয়েছে। নাজিল হওয়ার সময় থেকে তা লক্ষ লক্ষ লোকের মাধ্যমে লিখিত আকারে ও পাঠ আকারে বর্তমান

www.amarboi.org

সময়ের লোকদের নিকট পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ হাফেয কুরআন মজীদ মুখস্থ করে রেখেছেন। মূল কুরআন রাসূলের নিজস্ব প্রযত্নে ও ব্যবস্থাপনায় নিঃখুতভাবে লিখিত ও গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্ত হয়েছিল। সাহাবীদের সময়ও এই গ্রন্থখানি এমনি রূপেই বর্তমান ছিল যেমন রয়েছে আজকের এই মূহূর্তে। কুরআনে এ দীর্ঘ সময়ে একটি শব্দও এদিক-ওদিক হয়নি। রদ্-বদল বা বিকৃতির বিন্দুমাত্র স্পর্শও লাগেনি এর কোন একদিকে।

কুরআন মজীদেই এ গ্রন্থের আর এক নামের উল্লেখ হয়েছে। সে নামটি হল আল-ফুরক্বান। কেননা এ গ্রন্থই স্পষ্ট অকাট্যভাবে বলে দেয় হক্ কি, বাতিল কি এবং এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য কি ও কোথায়। হযরত আবূ বকর এই গ্রন্থের যে অনুলিপি তৈরী করেছিলেন নিজ হাতে, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন مُصْحَفٌ মাছহাফ।

দলীল বা প্রমাণ হিসেবে এই গ্রন্থ অকাট্য। এ গ্রন্থের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। এ গ্রন্থের অংশ-বিশেষ কিংবা সম্পূর্ণটা যে লোক অমান্য বা অস্বীকার করবে এর স্পষ্ট ঘোষণানুযায়ীই সে কাফির। আইন ও শরীয়াত রচনার বিচারে এ গ্রন্থই হচ্ছে সর্বপ্রথম উৎস। অন্য কোন কারণে বা অন্য কোন কিছুর খাতিরে এই গ্রন্থকে উপেক্ষা করা চলবে না, তা এড়িয়ে যাওয়াও (by-pass) যাবে না।

এই মহাগ্রন্থে যে সব নির্দেশসূচক কথা আছে তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো যদি নির্দিষ্ট একটি অর্থই প্রকাশ করে, তাহলে তা থেকে যা প্রমাণিত হবে,তা হবে একান্তই দৃঢ় অকাট্য। পক্ষান্তরে সে শব্দ সমষ্টি কিংবা একটি শব্দও যদি স্বতঃই একাধিক অর্থের ধারক ও প্রকাশক হয়, তা হলে তা থেকে যা প্রমাণিত হবে তা অকাট্য হবে না। প্রথম অবস্থায় তা দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অবস্থায় তা দৃঢ় প্রত্যয়মূলক হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা অসীম শক্তি ও ক্ষমতার মালিক। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান, কোন অক্ষর, ধ্বনি বা ইঙ্গিত ছাড়াই তাকে জরুরী ইল্‌ম বা জ্ঞান দান করতে সক্ষম। কেননা আল্লাহ্র কালাম সর্বোতভাবেই মানবীয় কালাম থেকে ভিন্নতর।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্র নিকট থেকে আরবী ভাষায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাজিল হয়েছিল। এই মূল আরবী ভাষার গ্রন্থই কুরআন নামে অভিহিত। তা যদি দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয়, তাহলে সেই অনুবাদকে মূল 'কুরআন' মনে করা যাবেনা। কেননা তাতো আর নাজিল হয়নি আল্লাহ্র কাছ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি। বড়জোর এ তার অনুবাদ বা তরজমা হতে পারে, আসল কুরআন নয়। আসল কুরআন আল্লাহ্র কালাম। তার অনুবাদ

www.amarboi.org

অনুবাদকের। এ কারণে কুরআনের কোন অনুবাদকেই শরীয়াতের আইনের উৎস মনে করা যেতে পারে না। শরীয়াতের আইন রচনার ব্যাপারেও কোন অনুবাদের উপর নির্ভরতা গ্রহণ করা চলে না। কেননা অনুবাদক আরবী ভাষার উপর যতটা দক্ষতাসম্পন্নই হোক না কেন, তাতে তার ভুল হয়ে যাওয়ার আশংকা অত্যন্ত প্রকট। ভুল হওয়ার আরও বেশী আশংকা সে অনুবাদকরণে ও লিখনে।–শব্দের তাৎপর্য ও মুল বক্তব্য অনুধাবনে ভুল বা ত্রুটি কিংবা অসম্পূর্ণতা বা অযথার্থতার আশংকা সমানভাবেই বর্তমান। কুরআনে ব্যবহৃত এক-একটি শব্দ অর্থ ও ভাবের সাগর-বিশেষ। সে অর্থ ও ভাব সাধারণ আরবী ভাষায়ও পুরাপুরি রক্ষা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। ভিন্নতর ভাষায় তা আরও অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কুরআনের এক একটি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বহু ব্যাপক। ভিন্নতর কোন ভাষায়ই সেই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য ধারণ করা সম্ভব হতে পারে না। এজন্যে কুরআনের অনুবাদকে 'কুরআন' মনে করা সমীচীন নয়। তবে সে অনুবাদ যে হেদায়েত লাভের জন্যে সেই ভাষাভাষীদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

কুরআন নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া

কুরআন মজীদ নামক যে গ্রন্থখানি দুনিয়ার মানুষের নিকট রয়েছে,তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একদিন একসঙ্গে নাজিল হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে তা একটু একটু ও অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। এ সময়টির মোট মিয়াদ হচ্ছে বাইশ বছর এক মাস বাইশ দিন। কুরআন বিভিন্ন উপলক্ষে নাজিল হয়েছে। এর কিছু নাজিল হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুম লোকদের জানাবার উদ্দেশ্যে, কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব স্বরূপ এবং কিছু অংশ ফতোয়া চাওয়ার দরুণ।

এক সঙ্গে গ্রন্থাকারে নাজিল না হওয়ার এ-ও একটা কারণ যে, কুরআন তৎকালীন জনগণের নিকট একটা ব্যাপকতর আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিল। নবী করীম (স) তা দাওয়াতী ভাষণ রূপেই জনগণকে পড়ে শুনাতেন। জনগণ বিপরীত মতাবলম্বী ছিল বলে তাঁকে তাদের সাথে রীতিমত বাগ-বিতন্ডায় নামতে হয়েছিল। তিনি কুরআনের ভাষায়ই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এ বলে যে, তোমরা যদি এ গ্রন্থকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে না-ই বিশ্বাস কর, তা হলে অনুরূপ কালাম তোমরা তৈরী করে নিয়ে এস। এ চ্যালেঞ্জ তাঁকে বার বার দিতে হয়েছে–দিতে হয়েছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। একারণে তার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে নাজিল হওয়ার প্রয়োজন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। এক সময়ে একখানি গ্রন্থাকারে তা নাজিল হয়ে গেলে এ অবস্থার মুকাবিলা করা সম্ভবপর হত না।

www.amarboi.org

অল্প অল্প করে ও বিভিন্ন সময়ে নাজিল হওয়ার কারণে কুরআন মজীদ মুখস্থ ও আয়ত্ত করা রাসূলে করীম (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছিল। সেই সঙ্গে তা কুরআন অনুধাবন ও তার আইন-বিধান পালন-অনুসরণ অধিক সহজ ও অনুকূল বানিয়ে দিয়েছিল। রাসূলে করীম (স) প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াত কটি নাজিল হয়েছিল, তার প্রথম শব্দটিই ছিল 'পাঠ কর'- اِقْرَأْ। এবং মানুষ যা জানেনা কলমের সাহায্যে তা-ই জানিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ লেখনী চালনার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাতে মানুষ সৃষ্টি ও মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত ছিল। এই ঘটনা যে দিন সংঘটিত হয়, সেদিন ছিল রমযান মাসের সতের বা সাতাইশ তারিখ। এই সময় রাসূলে করীম(স) মক্কার হেরা পর্বত গুহায় আল্লাহ্র ইবাদাতে গভীরভাবে তন্ময় হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর। এ ঘটনার পর প্রায় তিনটি বছর পর্যন্ত নতুন কোন অহী নাজিল হয়নি। এরপর প্রথম যে অহী আসে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (স)-কে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের কাজ শুরু করার এবং জনতাকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করার নির্দেশ দেন।[১] এরপর কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ ক্রমাগত নাজিল হতে থাকে এবং তা চলতে থাকে ১০ম হিজরীর ৯ই যিল্হজ্জ পর্যন্ত। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

কুরআন নাজিল হয় দুটি পর্যায়। একটি মক্কী এবং দ্বিতীয়টি মাদানী। মক্কী পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতসমূহে প্রধানতঃ বিশ্বলোক ও বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইসলামী আকীদা সুনির্ধারণ এবং নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠুতা বিধান ও মানোন্নয়নের কথা বিবৃত করা হয়।

কিন্তু মদীনায় আসার পর অবতীর্ণ কুরআনের অবশিষ্টাংশের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের সামাজিক-সামষ্টিক ও আন্তর্জাতিক বিধান পেশ করা হয়। আর তারই সঙ্গে উপস্থাপন করা হয় ইসলামের রাষ্ট্র দর্শন ও অর্থ দর্শন তথা অর্থ ব্যবস্থা। এক কথায় এটা ছিল কুরআনের আইন-বিধান উপস্থাপনের পর্যায়।

কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ

পূর্বেই বলেছি (এবং বিশ্ববাসীর নিকটও সুবিদিত) যে, কুরআন মজীদ রাসূলে করীম (স)-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে চলে এসেছে–চলে এসেছে লিখিত আকারে যেমন,

১. সূরা আল-আলাক্ব ও সূরা আল-মুদ্দাস্সির-এর প্রাথমিক ৫টি আয়াত দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

লোকদের মুখে মুখেও তেমনি। তা সর্বাবস্থায় ও সর্ব পর্যায়েই সুরক্ষিত ছিল এবং আছে।

কুরআন নাজিলের ধারা শুরু হওয়ার পর থেকেই এবং বিশেষ করে মদীনায় পৌঁছার পর রাসূলে করীম (স) কিছু সংখ্যক সাহাবীকে কুরআন লিখবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কুরআনের কোন অংশ নাজিল হতেই রাসূলে করীম (স) তা সমবেত সাহাবীদের সম্মুখে উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। এই সময় সাধারণভাবে প্রায় সব সাহাবী এবং বিশেষভাবে রাসূল (স) কর্তৃক নিয়োগকৃত সাহাবীগণ তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। রাসূলে করীম (স) যেমন তা লিপিবদ্ধকরণের তদারক করতেন, তেমনি তার স্থানও তিনি আল্লাহ্র ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করে দিতেন। বলতেন, এ আয়াত বা সূরার স্থান অমুক আয়াত বা সূরার পূর্বে বা পরে। এই লিখন কার্যে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ ইত্যাদি ভিন্নতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে সময় সময় চলে যেতেন বলে সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধকরণ সেই সব লোকের পক্ষে সম্ভব হত না। কেননা তাঁরা যখন নবী করীম (স)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন তখন কুরআনের যে অংশ নাজিল হত তা লেখার তাঁরা সুযোগ পেতেন না। তা লিখতেন অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত থাকতেন তাঁরা। এর ফলে মূল কুরআনের অনুলিপি তৈরী হওয়ার কাজ কোনক্রমেই ব্যাহত ও বিঘ্নিত হত না। এইভাবে একদিকে কুরআন লিপিবদ্ধ হয়ে যেত, অন্যদিকে সাহাবীগণ তা মুখস্থ করে ফেলতেন। ফলে লিখন ও মুখস্থকরণ উভয় প্রকারেই কুরআন সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছিল।[১]

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা নিজস্ব ব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে কুরআন মজীদ পড়িয়ে দিতেন। ফলে তিনি তা কখনই ভুলে যেতেন না। কুরআন মজীদেই বলা হয়েছেঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ،

---

১. (ক) অহী লেখার জন্যে নিযুক্ত সাহাবীদের নামঃ (১) হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (২) আলী ইবনে আবূ তালিব (৩) উসমান ইবনে আফ্ফান (৪) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৫) আনাস ইবনে মালিক (৬) উবাই ইবনে কায়াব (৭) মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (৮) জুবাইর ইবনুল আওয়াম (৯) আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (১০) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)

(খ) রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মুখস্থকারী কয়েকজন মুহাজির সাহাবীর নামঃ আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, সায়াদ ইবনে আবূ অক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরাইরা, আমর ইবনুল আস, মুয়াবিয়া, আয়েশা। আর আনছার হাফেযদের নামঃ উবাই ইবনে কায়াব, জায়েদ ইবনে সাবিত, মুয়ায ইবনে জাবাল, আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ।

www.amarboi.org

আমরা তোমাকে কুরআন পড়িয়ে দেব। অতঃপর তুমি তা কখনই ভুলে যাবে না।

আল্লাহ্‌র একটি ব্যবস্থা এ-ও ছিল যে, হযরত জিবরাঈল প্রতি এক বছর অন্তর পিছনে নাজিল হওয়া সমস্ত কুরআন রাসূলে করীম (স)কে একসঙ্গে ও পরম্পরানুযায়ী পাঠ করে শুনাতেন। ফলে রাসূলে করীম (স)-এর স্মৃতি-পটে কুরআন প্রতি বছর নতুন করে জাগ্রত হয়ে যেত। অতঃপর তাঁর পক্ষে তা ভুলে যাওয়ার আর কোন প্রশ্নই থাকত না। এই সম্পর্কে একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ

أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ أَنَّ جِبْرِيْلَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي،

নবী করীম (স) গোপনে আমাকে বললেনঃ হযরত জিবরাঈল প্রতি বছর সমস্ত কুরআন আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু এ বছর এই ব্যতিক্রম হয়েছে যে, আমাকে দু'বার কুরআন শুনানো হয়েছে। আমি মনে করি, আমার মৃত্যু আসন্ন বলেই এই রূপ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন কারণ হতে পারে না।

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখা কুরআন একত্রিত করা হয়, অংশগুলো পরস্পর একত্র করে মিলিয়ে একটি সূতা দিয়ে গেঁথে সেলাই করে একখানি গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়। আর তার নাম দেয়া হয় 'মাছ্‌হাফ'-. مَصْحَف। তাতে রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আয়াত ও সূরসমূহ পরস্পর সংযোজিত সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়। তাতে নাজিল হওয়ার পরম্পরা রক্ষিত হয়নি, বিষয়বস্তু হিসাবেও আয়াত বা সূরাসমূহ সাজানো হয়নি। এটা সম্পূর্ণ রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশানুক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেছেনঃ

কুরআন মজীদ রসূলে করীমের নিকট সাহাবাগণ যেভাবে শুনতে পেয়েছিলেন সেভাবেই লিখে রেখেছিলেন। হযরত উসমানের খিলাফত কালে তারই অনুরূপ কয়েকখানি অনুলিপি গ্রন্থ তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চল-রাজ্যে তা পাঠিয়ে দেয়া হয়। যেন লোকেরা একই ধরনে তা সমভাবে পাঠ করতে পারে এবং কুরআনের হাফেয না থাকলেও লোকেরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং তার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করবার সুবিধা পায়।

www.amarboi.org

বর্তমানে কুরআন ত্রিশটি পারায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি পারা আট-চার ভাগে ভাগ করা। এ কাজ রাসূলে করীম (স) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম করেননি। তা করেছেন পরবর্তী কালের লোকেরা। সম্ভবতঃ এ কাজটি করা হয়েছে হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দীতে। লক্ষণাদি দেখে মনে হয়, এর পূর্বে তা অন্য এক পন্থায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হত। সে যাই হোক, এর ফলে কুরআনের শব্দ, আয়াত ও সূরার পূর্ব-নির্ধারিত পরম্পরায় (ترتيب) কোন রূপ পার্থক্য করা হয়নি। ফলে কুরআনের মূল বক্তব্যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন দেখা দেয়নি।

কুরআনে আইন-বিধান উল্লেখের পদ্ধতি

কুরআন মজীদ মূলত একখানি সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থ। তার প্রতিটি অংশ-প্রতিটি আয়াত পূর্বাপর সম্পৃক্ত। এর ফলে পাঠক মাত্রেরই মনে এ ধারণা স্বতঃই জন্মে যে, কুরআনের দেয়া আইন-বিধান সুসংবদ্ধ, একত্র সন্নিবদ্ধ, সর্বদিক একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত। আর সেই সবদিকেরই উল্লেখ কুরআনে এক সঙ্গে হয়েছে। মানব-রচিত গ্রন্থাদির ন্যায় তাতে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়নি। একই প্রসঙ্গে তাতে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ একই স্থানে ও একই ধারাবাহিকতায় করা হয়েছে-যেন পাঠক তার যে-কোন স্থান পাঠ করে বহু বিষয়ে অবহিত হতে পারে। মানবীয় গ্রন্থাদির ন্যায় বিষয়-ভিত্তিক ভাগ করা হলে এবং এক-একটি বিষয় এক-এক স্থানে সম্যকভাবে রাখা হলে পাঠক শুধু সেই বিষয়টুকু জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট স্থানটুকু পাঠ করেই ক্ষান্ত হতে ও সংশ্লিষ্ট সব কিছুই সর্বদিকসহ জানা হয়ে গেছে বলে মনে করে নিতে পারত। ফলে সে অন্যান্য বিষয় মোটেই জানবার সুযোগ পেত না। তাতে কুরআনের মৌল উদ্দেশ্য ব্যাহত হত। এই কারণে কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে সমস্ত বক্তব্য একই স্থানে পর পর সাজিয়ে দেয়া হয়নি। ফলে যে-কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যে পাঠককে সমস্ত কুরআন অধ্যয়ণ ও আলোচনা করতে হয়।

কুরআনের মূল বিষয় হল তার উপস্থাপিত মৌল আকীদা ও বিশ্বাস। কুরআন চায়, সে আকীদা সত্য বলে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া হোক এবং মুখেও তার সত্যতার স্বীকৃতি ঘোষণা করা হোক। কুরআনী দৃষ্টিকোণের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন। কেননা কুরআন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে মানুষের হৃদয়-মন-মগজ, দৃষ্টিকোন্ ও মূল্যমান পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধকরণের উপর। কুরআন চায়, মানুষের মন থেকে আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা-দ্বেষ ও অন্য মানুষকে হেয় জ্ঞান ইত্যাদি বড় বড় অমানবিক দোষাবলী দূর হয়ে যাক এবং তাতে মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে মহান ইসলামী

www.amarboi.org

বৈশিষ্টাবলী পুরাপুরি স্থান পাক। কুরআন বিধৃত শরীয়াতের দিকটি সম্পূর্ণতঃ মানুষের আমল–তার বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্ক দুশ্ছেদ্য। সে শরীয়াত ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিদের এবং ব্যক্তিদের সাথে সমাজ ও সমষ্টির গভীর ও সুদৃঢ় বন্ধন সংস্থাপন করে। কুরআন যেমন যুদ্ধের কথা বলে, তেমনি বলে সন্ধি, শান্তি ও বন্ধুতা-মিত্রতার কথাও। সর্বোপরি কুরআন এই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত কর দেয় তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে। আর এই সব কিছুরই ভিত্তি হচ্ছে কুরআনেরই উপস্থাপিত মৌল আকীদা বিশ্বাস। কাজেই কুরআনের বিশেষ একটা দিক বাস্তবায়িত করা হলে এবং অন্যান্য দিকগুলোকে বাদ দিলে সেই পরম কল্যাণ লাভ কখনই সম্ভব হবে না, যা কুরআন মানুষকে দিতে চায় ও দিতে পারে।

কুরআনে উল্লেখিত বিষয়াবলী মূলতঃ একটি অখণ্ড জিনিসের মত। যেমন একটা পূর্ণাঙ্গ দেহ। তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত, সম্পৃক্ত। একটি অপরটির মধ্যে শামিল হয়ে আছে। একটিকে অপরটি থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যে, বিচ্ছিন্ন অংশটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যটির সাথে তার কোন দিক দিয়েই বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তা হচ্ছে একটা প্রাচীরের মত। তাতে বহু সংখ্যক ইট গ্রথিত রয়েছে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে। ইটগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তাকে আর প্রাচীর বলা চলে না। অন্যদিকে একটি দেহের অবস্থা এই যে, তার একটা অংগ অসুস্থ হলে সমগ্র দেহটি অসুস্থ–রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কুরআনে উপস্থাপিত শরীয়াত–শরীয়াতের বিধানাবলী পরস্পরের পরিপুরক, পরস্পরের সহযোগী, সাহায্যকারী ও শক্তি বর্ধনকারী। শরীয়াতের সে বিধানগুলো মানুষকেও পরস্পর সম্পৃক্ত করে তোলে।

কুরআনের বিষয়াবলীর মধ্যে একই সঙ্গে দ্বীন সংক্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, জীবন সংক্রান্ত আইন-বিধান, পূর্বকালের ঐতিহাসিক কাহিনী, আল্লাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, সৎকর্মে উৎসাহিত-আগ্রহান্বিতকরণ ও পরকালের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্তকরণ এবং সেজন্যে মনকে সর্বক্ষণের জন্যে জাগ্রত ও সচেতন করে রাখা–এই কথাও জানিয়ে দেয়া যে, কোন গোপন বস্তুইই আল্লাহ্র নিকট গোপন নয়, বাহ্যিক আমলের হিসাব-নিকাশ তিনি এই দুনিয়ায়-ই করেন এবং অভ্যন্তরীণ আমলের হিসাব-নিকাশ করবেন পরকালে–এই সব কথাই এক সঙ্গে সজ্জিত রয়েছে। কেননা কুরআনের আইন-বিধান সংক্রান্ত কথাবার্তা একস্থানে বলে দিলে তা একখানা আইন-গ্রন্থে পরিণত হয়ে যাবে, যা পাঠ করতে গিয়ে মানুষ একঘেয়েমির দরুণ বিষণ্ন হয়ে পড়বে। আসলে কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি। মানুষ তা পাঠ করে জীবনের সার্বিক কল্যাণ-পথ চিনে নেবে, অন্তর

www.amarboi.org

দিয়ে আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করবে, তার নছীহতমূলক কালাম পাঠ করে সে সদাচরণ গ্রহণ করবে, বিবেক-বুদ্ধির উদ্বোধক কালাম সমূহ পড়ে ঘুমন্ত অন্তরকে সচেতন ও বিচক্ষণ করে তুলবে, তার যুক্তি ও প্রমাণসমূহ পড়ে সে হবে যুক্তিবাদী। ফলে কোন পাঠকই কুরআন পড়ে বিমর্ষ-বিষন্ন বা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে না। কুরআনের কোন শ্রোতাই ভিন্ন দিকে মনোযোগ দিতে পারে না–শুধু কুরআন শুনা ছাড়া।

শরীয়াত উপস্থাপন পদ্ধতি

কুরআন মজীদের যে অংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে তার আয়াতসমূহ খুবই ক্ষুদ্রাকার, সংক্ষিপ্ত। আর মদীনায় অবতীর্ণ অংশের আয়াত দীর্ঘাকার, বিস্তৃত ও বেশ লম্বা। তার কারণ এই যে, মক্কী পর্যায়ের আয়াতসমূহের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল লোকদের মনে ঈমান সৃষ্টি করা, তাদেরকে কুরআন পাঠে আকৃষ্ট ও অভ্যস্থ করা। এই কারণে তখন যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে তা যেমন সহজ-পাঠ্য, তেমনি সহজ-শ্রাব্য। তা আয়ত্ত ও মুখস্ত করতেও কোন রূপ অসুবিধে হয় না। উপরন্তু তার পঠন-ঝংকার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। তা মানুষকে সহজেই তন্ময় করে দেয়। পক্ষান্তরে মদীনায় কুরআনের প্রধানতম কাজ ছিল জীবন-ব্যবস্থা উপস্থাপন, আইন ও বিধান দান। এজন্যে মদীনীয় আয়াতসমূহ দীর্ঘাকার হয়েছে। কেননা আইন-বিধান ও জীবন-ব্যবস্থা বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার উদ্বোধন করে, মানুষের সূক্ষ্মদর্শীতা ও অন্তঃদৃষ্টির তীক্ষ্মতা জাগায়। যে আইন বিধানই দেয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার যৌক্তিকতা বলে দেয়ারও প্রয়োজন হয়। তাই এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের দীর্ঘতা অনিবার্য, অপরিহার্য।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদ কেবলমাত্র মৌল-নীতি (اَلْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ)ই দিয়েছে, যেন তা মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপকতর আইনের উৎস হতে পারে। সর্বকালে সর্বদেশে ও সব রকমের সমাজ-পরিবেশেই তা প্রযোজ্য হতে পারে। তার ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করে মানুষকে সমুখের দিকে এগিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইন বের করতে যেন তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। এই কারণে হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের বিশাল ও সমস্যা-সংকুল জীবনের প্রয়োজন পুরণ ও সমস্যার সমাধান করতে খুবই সক্ষম। কুরআনের এ আয়াতসমূহের সম্প্রসারণযোগ্যতা (Elasticity) যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অমোঘ-অব্যর্থ।

www.amarboi.org

কুরআনের আইন-বিধান উপস্থাপন পদ্ধতি বিচিত্র। এর ফলে তার হৃদয়গ্রাহীতা ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা খুবই প্রকট। কোথাও তা আদেশসূচক শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে, কোথাও হয়েছে নিষেধসূচক শব্দে। কোথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজটি লোকদের জন্যে লিপিবদ্ধ বাধ্যতামূলক (ফরয) করে দেয়া হয়েছে। অথবা বলা হয়েছে, এ কাজটা খুবই উত্তম। কিংবা বলা হয়েছে একাজটা বেজায় খারাপ। অথবা কল্যাণমূলক কিংবা পূণ্যকাজ নয়। কোথাও কোথাও বর্ণনার ভঙ্গি এরূপ গ্রহণ করা হয়েছে যে, এই কাজটির ফল অতীব কল্যাণময়; কিংবা একাজটির পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। অথবা এ কাজটিতে যথেষ্ট লাভ রয়েছে বা এ কাজটিতে অনেক ক্ষতি নিহিত।

দ্বিতীয়, হাদীস বা সুন্নাত

'সুন্নাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ اَلطَّرِيْقَةُ পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নিয়ম। শরীয়াতের দৃষ্টিতে সুন্নাত হচ্ছে নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ কিংবা তাঁর সমর্থিত কথা বা কাজের বিবরণ। অনেকের মতে 'হাদীস' সুন্নাতের প্রতিশব্দ, দুটো একই জিনিসকে বুঝায়। অনেকে রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথাকে-ই শুধু 'হাদীস' বলে অভিহিত করেছেন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহী সূত্রে পাওয়া যে কথা রাসূলে করীম (স) নিজের ভাষার পোষাক পরিয়ে ব্যক্ত করেছেন, তা-ই হাদীস। এ জিনিসকেই বলা হয়েছে اَلسُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ। রাসূলের 'আমল' বা কাজকে বলা হয়েছে اَلسُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ - উদ্দেশ্য, মুসলমানরা রাসূলে করীম (স)-এর করা কাজ চিন্তা-বিবেচনার মাধ্যমে অনুধাবন করবে, বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করে চলবে। আর 'তাক্‌রীরী সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর অনুমোদিত কথা ও কাজ, যা সাহাবীদের ইজতিহাদের জন্যে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কিংবা যে নিয়ম পদ্ধতির উপর রাসূলে করীম (স) লোকদেরকে সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই সব ক্ষেত্রেই–রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথা, করা কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদন দেয়া কথা বা কাজ–এর কোনটিই তাঁর নিজের মনগড়া নয়। সব কিছুই অহী সূত্রে পাওয়া জ্ঞান থেকে উৎসারিত। তবে রাসূলে করীম (স)-এর নিজস্ব ব্যক্তিগত আদত অভ্যাস–পানাহার ইত্যাদি–সুন্নাত নয়। কিন্তু তার মধ্যে অনুসরণযোগ্য গুণ বা নিয়ম-পদ্ধতি যা, তা অবশ্যই সুন্নাতের মধ্যে গণ্য।

সুন্নাত সংকলন

রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছিল তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাধীন। কিন্তু সুন্নাত বা হাদীস তখন সংকলিত

www.amarboi.org

বা গ্রন্থাকারে সংযোজিত হয়নি। বরং তখন তো কোন কোন সাহাবী বর্ণনা করতেন যে, নবী করীম (স) হাদীস বা সুন্নাত সংকলিত বা লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। মনে করা যেতে পারে, এ নিষেধ ছিল একেবারে প্রাথমিক কালে–যখন সাহাবীগণ কুরআন ও হাদীসের মাঝে পার্থক্য করার মত বিচক্ষণতা লাভ করতে পারেন নি। এসময় হাদীস লিপিবদ্ধ করা হলে কুরআন-হাদীসের সংমিশ্রিত হয়ে পড়ার আশংকা ছিল। অথবা এ নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের অহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকা কালে। কেননা এই সময় যদি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হত, তাহলে এক সঙ্গে দুটো দোষ সৃষ্টি হতে পারত। একটি এই যে, এতেও কুরআন হাদীসের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকা ছিল। আর দ্বিতীয় হল, এই সময় হাদীসের প্রতি কুরআনের চাইতেও বেশী গুরুত্ব প্রদান এবং সমধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল। আর তা কক্ষণই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

কিন্তু তাই বলে রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় হাদীস লিখিতই হয়নি, এমন কথা নয়। নিষেধ থাকলেও সাধারণভাবে সকলের জন্য ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর মুখে যা-ই শুনতে পেতেন, তা-ই লিখে রাখতেন। তা দেখে অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁকে তিরস্কার করলেন। পরে ব্যাপারটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট গেলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ

أُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ مَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمَا اِلاَّ حَقٌّ

তুমি লিখ–লিখতে থাক। আল্লাহ্‌র কসম! আমার দুই ওষ্ঠের মাঝখান দিয়ে প্রকৃত সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।

মক্কা বিজয়ের বছর একজন ইয়েমেনবাসী রাসূলে করীম (স)-কে অনুরোধ করলেন তাঁর একটি বাণী লিখিয়ে দিতে। রাসূলে করীম (স) তার অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে কুরআন মজীদ একটি মাত্র গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয় এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে সুন্নাত বা হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার চিন্তা সাহাবীদের মনে জাগে। তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। কেননা দেশের পর দেশ বিজিত হওয়ার কারণে ইসলামী খিলাফতের পরিধি দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত ও বিশালতর হতে শুরু হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম নানা দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে মদীনার বাইরে চলে যেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই সময়কার চেষ্টা বেশী দিন চলেনি এবং কাজও খুব অগ্রসর হয়নি। হযরত

www.amarboi.org

উসমানের খিলাফত কালে কুরআনের লিপি (নোসখা) তৈরী ও তা বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়ার কাজ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার আমলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ খুব বেশী প্রবল ও জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই সময় একদিকে শীয়া ফিরকা গড়ে উঠে অপর দিকে আত্মপ্রকাশ করে খাওয়ারিজ ফিরকা। বহু সংখ্যক সাহাবী ও হাদীসের হাফেয এই সময় মৃত্যুবরণ করেন। তখন বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা বিকৃত, রদবদলকৃত কিংবা মনগড়াভাবে রচিত হয়ে ব্যাপক প্রচার হতে লাগল। এই অবস্থা দেখে সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁদের জানা ও শুনা হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার তাকীদ অনুভব করলেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের খিলাফত কালে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার প্রয়োজন আর একবার তীব্রভাবে অনুভূত হয়। খলীফা মদীনার বিচারপতিকে এই কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু খলীফার এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। তাঁর পরে কোন খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানই হাদীসের এই আনুষ্ঠানিক সংকলনের জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। তখন একটা ভয় সকলের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। আর তাহল, যা হাদীস নয় তা হাদীসের নামে সংকলিত হওয়া এবং বহু যথার্থ হাদীস পরিত্যক্ত হওয়া ও সংকলনের বাইরে থেকে যাওয়া।

তাবেয়ী যুগের শেষ ভাগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ ব্যাপক হয়ে উঠে। সংগ্রাহক ও সংকলকদের মনে তখন বিশেষ সাহস ও উদ্যমও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে একারণে যে, সেটা ছিল আব্বাসীয় শাসন আমল এবং সে আমল শুরু হয়েছিল এই ঘোষণা সহকারে যে, তারা ক্ষমতায় এসেছে দ্বীনের নামে ও দ্বীনের সমর্থন সাহায্য ও শক্তিবর্ধনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা একাজে বহু বিশেষজ্ঞকেও নিয়োজিত করে। ফলে এই সময় হাদীস সংগ্রহের একটা ধারা চলতে শুরু করে এবং তার আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম জাহানের সর্বত্র–সব শহর, নগর এবং জনপদে। বহু লোক একান্তভাবে এই কাজে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন।

এই সময় হাদীস সংগ্রহ অভিযান চলার মূলে একটা বড় উদ্যম এজন্যও দেখা দিয়েছিল যে, তা থেকে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম খুব সহজেই জানা ও বের করা যায়। বিশেষ করে হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্র জন্য এই হাদীস সংকলন ছিল একান্তই অপরিহার্য। একেতো এ সংকলনের ভিত্তিতে এ ফিকাহ্র উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ কিয়াস ও রায়বাদী ফিকাহ্র জবাবে হাদীসবাদীরা

www.amarboi.org

সর্বক্ষেত্রে হাদীস পেশ করে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারেন। ঠিক এ কারণেই এসময় হাদীস সংগ্রহীত ও সংকলিত হয় ফিকাহ্‌র বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী। সেই সঙ্গে সাহাবীদের মত ও কথা এবং তাবেয়ীদের দেয়া ফতোয়াও সংকলিত হতে থাকে। এ ধরনের সংগ্রহ-সংকলনের নাম দেয়া হয় اَلْمُصَنَّفَاتُ –মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ পর্যায়ের একখানা প্রখ্যাত গ্রন্থ। এঁদের ছাড়া আরও বহুলোক হাদীস সংগ্রহ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা ফিকহী দৃষ্টিকোণ ও ফিকহী পদ্ধতিকে অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে সাহাবী পর্যায়ের বর্ণনাকারী নামের ভিত্তিতে হাদীস সংগ্রহ করেন। এভাবে এক-একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত সব হাদীস তাঁরা এক সঙ্গে ও একই স্থানে সাজিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের গ্রন্থ-প্রণয়ণ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে اَلْمَسَانِيْدُ এ পর্যায়ে মুসনাদে উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আব্বাসী, মুসনাদে নয়ীম ইবনে হাম্মাদ আল খাজায়ী এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল–এ কখানি অত্যধিক প্রখ্যাত গ্রন্থ।

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস সংগ্রহ অভিযানে নবতর উদ্যম ও নতুন দৃষ্টিকোণ জেগে উঠে। প্রতিটি বর্ণনা সূত্রকে নতুন করে যাচাই-বাছাই করা, কোন্‌টি সহীহ কোন্‌টি যয়ীফ তার নির্ধারণ করা এবং বর্ণনাকারীদের ব্যাখ্যা, ভাষ্য ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হয়। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবূ দায়ূদ, তিরমিযী, নাসায়ী-এই ছয়খানি গ্রন্থ এ পর্যায়ে শিরোমনি রূপে বিশ্বের নিকট স্বীকৃত। এসব গ্রন্থের সংকলকরা হাদীস সংগ্রহকরণ, তার শুদ্ধতা নির্ধারণ, অতঃপর সংকলিত সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় তাকে বিভিন্ন অধ্যায় (كِتَابٌ) ও পরিচ্ছেদে (بَابٌ) সুবিন্যস্তকরণে প্রানান্তকর চেষ্টা-সাধানা, শ্রম ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনব্যাপী সাধনার ফল হিসেবে তাঁরা এক-এক খানি গ্রন্থ দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করেছেন।

শীয়া মতে হাদীসের যে সংকলন হয়েছে, তার নাম اَلْكَافِىْ এবং তার সংকলক হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব-আল-কালবী (মৃত্যুঃ ৩২৮ হিঃ)।[১]

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন পর্যায়ে যত কাজ হয়েছে, তার সনদ যাচাই-বাছাই ব্যাপারে যত বিচক্ষণতা ও সাধনা নিয়োজিত হয়েছে, ফিকাহ-শাস্ত্র রচনায় তার একটা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। বহু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ চিন্তা-বিবেচনা ধারার ফিকাহ্ ত্যাগ করে হাদীস-ভিত্তিক ফিকাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর সত্যি কথা হচ্ছে, ফিকাহ্‌বিদদের আসল মূলনীতি ও আদর্শই ছিল এই। সাহাবী

১. হাদীস সংকলন পর্যায়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য পাঠ করুন মৎপ্রণীত 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস']

www.amarboi.org

ও তাবেয়ীগণ এই নীতিরই প্রবর্তন করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর নিম্নোদ্ধৃত কথাটিই তার প্রমাণ। তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ الْعُلَمَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَزَلْ شَأْنُهُمْ أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا تَمَسَّكُوا بِنَوْعٍ آخَرَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالِ ثُمَّ إِذَا ظَهَرَ الْحَدِيثُ بَعْدُ رَجَعُوا عَنْ اِجْتِهَادِهِمْ إِلَيْهِ،

সাহাবা ও তাবেয়ী আলিমগণের স্থায়ী পদ্ধতি ছিল এই যে, যে-কোন সমস্যা, প্রশ্ন বা বিষয় তাঁদের সামনে আসত, তাঁরা সে সম্পর্কে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হাদীস তালাশ করতেন। কিন্তু তা যখন পেতেন না, তখন তাঁরা ভিন্ন ধরনের দলীল ও প্রমাণের আশ্রয় নিতেন। তারপরে সেই সংক্রান্ত হাদীস যখন পাওয়া যেত, তখন তাঁরা তাঁদের পূর্বকৃত ইজতিহাদ ত্যাগ করে হাদীসই গ্রহণ করতেন।

শরীয়াত ও কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্নাতের গুরুত্ব

ইসলামী আইন প্রণয়নে সুন্নাত বা হাদীস হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। ইসলামের সব কয়টি মাযহাবেই তার গুরুত্ব স্বীকৃত এবং তা অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া একান্তই কর্তব্য বলে ঘোষিত। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)-এর আনুগত্য স্বীকার, বাস্তবভাবে তাঁকে অনুসরণ এবং সব বিষয়ে তাঁর নিকট থেকেই পথ-নির্দেশ গ্রহণের জন্য আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ করেছেন।[১] স্বয়ং নবী করীম (স) বিদায় হজ্জ-এর ভাষণে ঘোষণা করেছেনঃ

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا أَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ،

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দুটি থাকা অবস্থায় তোমরা কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হতে পারনা। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।

১. সূরা আন্-নিসা-৫৯ ও ৮০ আয়াত এবং সূরা আল হাশর-৭ আয়াত দ্রষ্টব্য

কোন বিষয়ে সুন্নাত বা হাদীস যখন অকাট্যভাবে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা

www.amarboi.org

বস্তুতঃ রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনের সব কাজে যে কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা দরকার, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি স্বতঃই স্বীকার করবে। কেননা রাসূলের সুন্নাত শরীয়াতের হুকুম-আহ্কাম নির্ধারণে একান্তই অকাট্য, স্পষ্ট। কেবলমাত্র সুন্নাতের আনুগত্য করেই আল্লাহ্র আনুগত্য করা যেতে পারে। আল্লাহ্র নিকট থেকে যে বিধান নাজিল হয়েছে বিশ্ব-মানবের জন্য, তার বাস্তবতা এভাবেই সম্ভব।

করবে-করবে এমন শব্দে ও ভাষায়, যার অর্থ স্পষ্ট-অকাট্য, তখন তা শরীয়াতের হুকুম নির্ধারণে চূড়ান্ত। অবশ্য তার রাসূলের হাদীস হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা বা শোবাহ-সন্দেহ থাকা চলবে না। যদি তেমন কিছু থাকে, তাহলে তার প্রমাণটা অকাট্য বিবেচিত হবে না।

শরীয়াতের উৎস বিচারে সুন্নাতের স্থান কুরআনের ঠিক পরে-পরে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই। কেননা কুরআন তার প্রমাণের দিক দিয়ে অকাট্য—সমাগ্রিকভাবেও যেমন, বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবেও তেমনি। কিন্তু সুন্নাত শুধু সামগ্রিকভাবেই অকাট্য, খুঁটিনাটি হিসেবে নয়। উপরন্তু সুন্নাতের বর্ণনা কেবলমাত্র শাব্দিকভাবেই চলেনি, তার ভাবাত্মক বর্ণনা—মূল শব্দের পরিবর্তে মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনা করাও বৈধ বিবেচিত হয়েছে। কেননা তার শব্দ ও ভাষা অহীর মাধ্যমে আসেনি, এসেছে তার মূল বক্তব্যটি মাত্র। কিন্তু কুরআন তার মূল বক্তব্য এবং শব্দ ও ভাষা—এ সবই অহীসূত্রে লব্ধ। তার যা অর্থ ও তাৎপর্য তা-ই কুরআন নয়, তাকে কুরআন বলে চালিয়ে দেয়াও জায়েয হতে পারে না। তাই কুরআনের তাফসীর কুরআন নয়, তাফসীরকারের ব্যাখ্যা। আর কুরআনে মোটামুটি বর্ণিত কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে দেয়, তা তারই নিজস্ব। তা কখনও 'কালামুল্লাহ' নয়। এই কারণে ফিকাহ্র প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুন্নাত থেকে দলীল পাওয়া যায় এবং তা থেকে এমন সব হুকুম-আহকাম প্রমাণিত হয়, যে বিষয়ে কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, শরীয়াতের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী সমন্বয়েই সুন্নাত গড়ে উঠেছে। অতএব মোটামুটি একথা বলা চলে যে, সুন্নাত কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা হয় তা কুরআনেরই কোন মৌল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত খুঁটিনাটি হবে কিংবা হবে কুরআনেরই দেয়া কোন মূলনীতির (قَاعِدةٌ كلية) ব্যাখ্যা অথবা কুরআনের কোন অবিস্তৃত (مجمل) হুকুমের বিস্তারিত রূপ। আরও একটা অবস্থা হতে পারে, তা হয়ত কুরআনের কোন মৌল নীতি সমন্বিত ঘটনাবলী এবং খুঁটিনাটি ঘটনাবলী থেকে শক্তিপ্রাপ্ত কোন সাধারণ নীতি বা সুন্নাত আমাদের সামনে পেশ করে দেবে।

www.amarboi.org

মুসনাদ ও মুরসাল হাদীস বর্ণনা

রাসূলে করীম (স) থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনাকারীগণ একের-পর-এক মিলিত ও ধারাবাহিকতায় অবিচ্ছিন্ন হলে তার নাম হবে 'মুসনাদ' (مُسْنَد) আর যদি এই বর্ণনাকারী-ধারাবাহিকতা রাসূল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ রাসূলের নিকট শুনতে পেয়েছেন এমন সাহাবী বর্ণনা না করেন−বর্ণনা করেন কোন তাবেয়ী, যিনি কোন সাহাবীর নিকট থেকে শুনেছেন বটে; কিন্তু তিনি সেই সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই বর্ণনা করে দিয়েছেন, তাহলে একে বলা হবে 'মুরসাল' (مُرْسَل)।

মুসনাদ হাদীস (সুন্নাত) তিন প্রকার

(১) **'আল মুতাওয়াতির' (المتواتر)**ঃ তা সেই হাদীস, যা এমন বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী এক সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যাঁরা রাসূলের সময় থেকে সংকলিত হওয়ার সময় পর্যন্ত কোন এক সময়, কোন এক পর্যায়েও মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন−একমত হয়ে মিথ্যা বলেছেন, এমন কথা ধারণাও করা যায় না। এইরূপ হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা অকাট্য, দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ। এরূপ হাদীস বা সুন্নাত গ্রহণ করা ও মেনে নেয়ার ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। এ ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিমত বা মত-বৈষম্যের স্থান নেই। রাসূলে করীম (স)-এর কাজ সম্পর্কিত সুন্নাত বর্ণনায় এ ধরনের হাদীস বা 'সুন্নাত'ই অনেক ও বিপুল। যেমন, অযূ, নামায ও হজ্জ। কেননা সর্ব সাধারণ মুসলমানরা একত্রিত হয়ে এক সাথে একই সময়ে রাসূলে করীম (স)-কে অযূ করতে এবং নামায পড়তে দেখেছেন, দেখেছেন হজ্জ করতে। তাই এ সংক্রান্ত বর্ণনাবলীর মধ্যে 'মুতাওয়াতির' রয়েছে বিপুল সংখ্যায়। কিন্তু রাসূলের উক্তি বা বলা কথার 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার সংখ্যা খুবই কম। কোন মুতাওয়াতির' বর্ণনায় শব্দের বিভিন্নতা তার মুতাওয়াতির মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করেনা−যদি তার দরুণ অর্থের পার্থক্য না ঘটে। এসব হাদীস বা সুন্নাতকে 'মুতাওয়াতিরুল মা'না' -مُتَوَاتِرُ الْمَعْنٰى বা 'অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির' বলা হয়।

(২) **'আল-মশহুর'**ঃ 'মশহুর' সেই হাদীস যা রাসূলে করীম (স) থেকে এমন সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যা মুতাওয়াতির হওয়ার সংখ্যা থেকে কম; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কম সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে কোন মিথ্যা কথা বর্ণনা করেছেন বলে সাধারণতঃ কল্পনা করা যায় না। অবশ্য পরবর্তী স্তরে সংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত তা এমন সংখ্যক লোক বর্ণনা করবেন, যাঁদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অন্য কথায়, প্রথম স্তরে

www.amarboi.org

'মুতাওয়াতির' হওয়ার মত সংখ্যক বর্ণনাকারী না থাকলেও পরবর্তী স্তরে তা হয়ে গেছে। এ ধরনের বর্ণনায় মন আশ্বস্ত হতে পারে, যদিও তার প্রতি ইয়াকীন বা দৃঢ় প্রত্যয় জাগেনা। এই কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ এই ধরনের হাদীসও লিখে রাখবার জন্য সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, রাসূলে করীম (স)-এর কথাঃ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ 'এক-তৃতীয়াংশ এবং এই এক-তৃতীয়াংশই অনেক' একটি 'মশ্‌হুর' হাদীস। এই হাদীসের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌র এই রায় নির্ধারিত হয়েছে যে, অসীয়াত কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উপরই কার্যকর হবে, তার বেশীর উপর নয়, যদিও এ হাদীসটি 'মুতাওয়াতির' শ্রেণীর নয়। অথচ কুরআন মজীদে অসীয়াতের যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা সাধারণ ও শর্তহীন অনুমতি। তাতে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। ফিকাহ্‌বিদগণ এই মত নির্দিষ্ট করেছেন একটা মূলনীতির ভিত্তিতে। সে মূলনীতি হল, কুরআনে যা সাধারণ বা শর্তহীন, 'মশ্‌হুর' হাদীসের ভিত্তিতেও তাতে শর্ত আরোপ করা কিংবা 'সাধারণ'কে 'বিশেষ' করা সম্পূর্ণ শরীয়াতসম্মত। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই কুরআন মজীদে মীরাসের আয়াতসমূহ সাধারণ ও শর্তহীনভাবে উদ্ধৃত হলেও এবং কোন উত্তরাধিকারীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার কথা তাতে না বলা হলেও একটি 'মশ্‌হুর' হাদীস বলে হত্যাকারী যাকে হত্যা করেছে, সে তার উত্তরাধিকারী হলেও তাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের এটা সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত মত।

(৩) **'খবরে ওয়াহিদ'ঃ** 'খবরে ওয়াহিদ' বলা হয় এমন হাদীসকে যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতটা নয় যতটা হলে তাকে 'মুতাওয়াতির' বলতে হয় কিংবা এতটাও নয়, যতটা হলে সে হাদীসকে 'মশ্‌হুর' মেনে নিতে হয়। সত্যি কথা হচ্ছে, রাসূলে করীম (স)-এর মুখের কথা বা উক্তিমূলক হাদীসের বিরাট অংশ এই পর্যায়ের। এই পর্যায়ের হাদীস থেকে 'ইয়াকীন' বা 'অকাট্য বিশ্বাস' লাভ করা যায় না; বরং তাকে মনে করতে হয় 'সত্য সম্ভব' অর্থাৎ সম্ভবতঃ সত্য হবে–কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় নয়। পরিভাষায় একেই বলা হয় ظن (Presumption) বা অণুমান–প্রাকপ্রত্যয়, যে বিষয় ধরে নেয়া হয়েছে (An idea which is taken for granted)

'খবরে ওয়াহিদ' ধরনের হাদীস গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে শরীয়াতের রায় নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত নন। হানাফী মাযহাবে এই ধরনের হাদীস গ্রহণে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এই ধরনের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে যদি তার বর্ণনাকারী নিজেই তার বিপরীত আমল না করে থাকেন এবং তা কিয়াস ও শরীয়াতের মূলনীতি পরিপন্থী হবেনা–হবে অনুকূল। উপরন্তু তা এমন

www.amarboi.org

হতে হবে যা বার বার সংঘটিত হয়ে থাকে। কেননা তা হলে তা 'মশ্‌হুর' বলে প্রতিপন্ন হবে।

ইমাম মালিকের মতে 'খবরে ওয়াহিদ' হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে কেবল তখন, যদি তা মদীনাবাসীর আমল অনুরূপ হয়। আর ইমাম শাফেয়ী হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হওয়া ও তার সহীহ্ হওয়ার উপরও মুহাদ্দিসের বিশ্বাস্য, প্রখ্যাত ও সুপরিচিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন 'খবরে ওয়াহিদ' হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে। সর্বোপরি জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ

إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ يُعْمَلُ بِهِ إِذَا حَفَّتْ بِهِ الْقَرَائِنُ،

একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সুনীতিবাদী বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল করা যাবে–তা গ্রহণ করা যাবে–যদি বিপুল মাত্রার অনুকূল লক্ষণ পাওয়া যায়।

কোন কোন মুহাদ্দিস ও মুলনীতিবাদী ফিকাহ্‌বিদদের মতে 'মুরসাল' (مرسل) ও 'মুনকাতা' (منقطع) বলতে একই ধরনের হাদীস বুঝায়। এ দু'য়ের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তাবেয়ী যদি সরাসরি রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তবে তা-ই হবে 'মুরসাল'। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন সাহাবী, তার একজন বর্ণনাকারীর নাম অজ্ঞাত থেকে গেলেও তাকে মুরসাল বলা যাবে না। কোন সাহাবীর 'মুরসাল' হাদীস–অর্থাৎ সাহাবী যদি নিজে রাসূলের নিকট থেকে না শুনে, অন্য একজন সাহাবীর নিকট থেকে শুনতে পেয়ে সেই সাহাবীর নামে বর্ণনা না করে নিজেই রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, তবে সে হাদীস গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে সব ফিকাহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত। হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে এইরূপ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কেবল তখন, যদি অন্যান্য বর্ণনাও তার সমর্থন করে।

www.amarboi.org

আনুসঙ্গিক উৎস

শরীয়াত প্রবর্তনকারী আর যে যে জিনিসকে 'দলীল' ও সত্যপথ প্রদর্শক রূপে গণ্য করেছেন এবং মুজতাহিদগণও যার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান জানতে পারেন, তা-ই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরে ইসলামী শরীয়াতের আনুসঙ্গিক উৎস।

এই পর্যায়ে একটা বিশেষ নীতির অনুসারী হিসেবে আমি তিনটি ভাগে আমার বক্তব্য পেশ করব। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনা করা হবে পূর্ববর্তী লোকদের কাছ থেকে পাওয়া আনুসঙ্গিক উৎস সম্পর্কে। তাতে থাকবে আগের কালের শরীয়্যত প্রসঙ্গ। অর্থাৎ আগের কালের শরীয়াতের সাথে আমাদের যতটা সম্পর্ক রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ইজমা–যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে কিংবা কোন সাহাবীর কথা বা উক্তি কিংবা মত অথবা আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে যে-সব নিয়ম-প্রথা প্রচলিত, সুস্থ-স্বচ্ছন্দ আদত-অভ্যাস–যা শরীয়াতের কোন অকাট্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বিপরীত নয় কোন ইজমা'র–ইত্যাদি বিষয়।

আর দ্বিতীয় আলোচনা হবে বিবেক-বুদ্ধিসম্মত উৎস বা সূত্র সম্পর্কে। এ পর্যায়ে থাকবে কিয়াস, ইস্তিহ্‌সান, আল-মাসালিহ্‌, আয্‌ যারায়ে ও আল-ইস্তিসহাব। আর শেষের দিকে আলোচনা করা হবে ইজ্‌তিহাদ সম্পর্কে।

প্রথম প্রসঙ্গঃ পূর্বকাল থেকে পাওয়া আনুসঙ্গিক উৎস

পূর্ববর্তীদের শরীয়াত, আগের ইজমা, সাহাবীর মত বা কথা, প্রচলন

পূর্ববর্তীদের শরীয়াতঃ

ইসলামী শরীয়াতের, অর্থাৎ শরীয়াতে মুহাম্মদীর, পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যান্য আরও কয়েকটি শরীয়াত নাজিল্ল করেছিলেন। তাতে রয়েছে অনেক হুকুম-আহকাম। তার মধ্যে কোন কোনটির উল্লেখ কুরআনে ও সুন্নাতে পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমাদের শরীয়াত নাজিল হওয়ার পর তা মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেছে। যেমন কতকগুলো হারাম খাদ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে ইয়াহুদীদের প্রতি হারাম করা কয়েকটি খাদ্যের। সূরা আল-আনয়াম-এ বলা হয়েছেঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّآ اَنْ

www.amarboi.org

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

বল হে নবী! আমার প্রতি যে অহী নাজিল করা হয়েছে তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্য যা খাওয়া হারাম করা হয়েছে, তা শুধু একটিঃ মরা জন্তু, প্রবাহিত করা রক্ত কিংবা শুকরের গোশ্ত। কেননা এগুলো অপবিত্র কিংবা শরীয়াতের সীমালংঘনমূলক–আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কাটা হয়েছে।

এরপর ইয়াহুদীদের প্রতি বিশেষভাবে যা হারাম করা হয়েছিল, তার উল্লেখ হয়েছে এ ভাষায়ঃ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ،

যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের প্রতি হারাম করেছি সব নখরধারী আর গরু ও ছাগলের চর্বিসমূহ, তবে যা ঐ দুটি জন্তুর পৃষ্টদেশে রয়েছে বা নাড়ি-ভুড়িতে রয়েছে কিংবা যা অস্থির সঙ্গে মিলে-মিশে আছে তাছাড়া।

কুরআনে পূর্ববর্তী শরীয়াতের এমন কিছু জিনিসেরও উল্লেখ হয়েছে যা সে কালের লোকদের প্রতি ফরয ছিল এবং আমাদের প্রতিও ফরয করা হয়েছে। যেমনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ،

তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী (শরীয়াতধারী) লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।

এমন কিছু জিনিসেরও উল্লেখ হয়েছে যা পূর্ববর্তীদের আমলে মনসুখ করা হয়েছিল একথা বলা হয়নি। কিংবা এমন কিছুর উল্লেখ হয়েছে যা তাদের জন্যে বৈধ ছিল, আমাদের জন্য তা বহাল আছে কিনা সে বিষয়ে কোন হুকুম দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায়–কুরআন বা সুন্নাতে সে জিনিসের শুধু উল্লেখ হওয়ায়ই–তা আমাদের শরীয়াতেরও উৎস বা সূত্র হিসেবে গণ্য হবে কি?

www.amarboi.org

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন যে, তা আমাদের শরীয়াতের জন্য আইনের উৎস হবে। এ কারণেই তাঁরা রায় দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম (যিম্মী)-কে হত্যা করে, তাহলে এই হত্যাপরাধে তার কিসাস হবে। কেননা 'তওরাত' গ্রন্থের এই আয়াতটি কোনরূপ ইতিবাচক মন্তব্য ছাড়াই কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ،

প্রাণের বদলে প্রাণ ও চোখের বদলে চোখ।

কুরআন মজীদ এই বাণীটির উল্লেখ করেছে মাত্র। এর সাথে ইতিবাচক কোন কথা জুড়ে দেয়া হয়নি বা এই প্রসঙ্গে আমাদের জন্যে কিছুই বলা হয়নি। তা ছাড়া আমাদের শরীয়াতে এমন কিছুর উল্লেখ হয়নি, যা তওরাতের এ বিধানটি বাতিল (Omit) করে দেয় কিংবা এর সাধারণ ও সর্বাঙ্গীণ প্রায়োগিকতাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে বলে মনে করা যায়।

শাফেয়ী মাযহাবের কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তওরাতের এই বিধানটি কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে বলেই তা সাধারণভাবে আমাদের জন্যেও শরীয়াতের উৎস রূপে গণ্য হবে তার কোন কারণ নেই। কেননা তা যাদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল, বিশেষভাবে তাদেরই অণূসরণীয় বিধান। দ্বিতীয়তঃ রাসূলে করীম (সঃ) হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়ামেনে বিচার-ফয়সালার দায়িত্বসহ প্রেরণ কালে তাঁর সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তাতে কুরআন, সুন্নাত ও ইজতিহাদের কথাই বলা হয়েছিল, আমাদের শরীয়াতের কোন অকাট্য দলীল না-পাওয়া অবস্থায় পূর্বকালীন শরীয়াতকে উৎস রূপে গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি। হযরত মুয়াযও বলেন নি, স্বয়ং রাসূলে করীম (স)ও তাঁকে তা জানিয়ে দেন নি। রাসূলে করীম (স) কুরআন ও সুন্নাতের পর ইজতিহাদ করার মতকেই সমর্থন করেছেন; কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়াতকে আইনের উৎস রূপে গ্রহণ করতে বলেননি।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের দুটি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি মত তা-ই যা এইমাত্র বলা হল। এছাড়া কালামশাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে আশায়েরা (الأشاعرة) ও মুতাজিলাদের মতও উক্ত রূপ।

তবে জমহুর ফিকাহবিদগণ যে মত গ্রহণ করেছেন, মন সান্ত্বনাদায়ক মত হচ্ছে তা-ই। কেননা তাঁরা পূর্ববর্তী শরীয়াতকে কেবলমাত্র সেই গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে গ্রহণ করেছেন, যেখানে আমাদের শরীয়াতে স্পষ্ট অকাট্যভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু তা বর্জন করতে বলা হয়নি। আর হযরত মুয়ায ও নবী করীম

www.amarboi.org

(স)-এর পারস্পরিক কথোপকথনে এ জিনিসের উল্লেখ না হলেও তা প্রমাণ করে না যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতকে সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করতে হবে। কেননা পূর্ববর্তী শরীয়াত এই মত অনুযায়ী গ্রহণ করা হলে তাতে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল প্রদত্ত গ্রহণ-সীমা অতিক্রম করা হয় না।

আল-ইজমা (Consensus of opinion)

রাসূলে করীম (স)-এর পর কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মাতের সমস্ত মুজ্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়াতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তা-ই হল ইজমা। ইজমার এ সর্বসম্মত সংজ্ঞা হলেও ইমাম মালিক বলেছেন যে, কেবলমাত্র মদীনার ফিকাহ্বিদদের ইজমাই গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনমান্য হতে পারে, অন্য কোন ইজমা নয়। আর দায়ূদ জাহেরী মনে করেছেন, কেবলমাত্র সাহাবীদের ইজমাই ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম উৎস হতে পারে, অন্য কারো ইজমা নয়।

আর সাহাবীদের ইজ্মার বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মুসলমান মেয়েকে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিবাহ দেয়া জায়েয নয়, দাদীকে মীরাসের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হবে এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

প্রখ্যাত ফিকাহ্বিদ নাজ্জাম (মৃতঃ ৩৩১ হিঃ) ইজমাকে শরীয়াতের একটা উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মত হল, ইজমা যদি কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের উপর ভিত্তিশীল হয় তাহলে সেই দলীলটিই তো শরীয়াতের মত গ্রহণের ভিত্তি হতে পারে; সেখানে আবার ইজমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে! কিন্তু তা যদি কোন অপ্রত্যয়সম্পন্ন দলীলের (دليل ظنى) উপর ভিত্তিশীল হয়, তাহলে সেখানে ইজ্মা সংঘটিত হতে পারে না। কেননা সব মানুষের বুঝ-সমঝ এক ও অভিন্ন নয়। তারা যখন কোন মাসলা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির বলে বের করতে যাবেন, তখন তাতে মত-বিরোধ দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

অন্য দিকে শীয়া মতের লোকদের নিকট ইজমার কোন মূল্য বা স্থান নেই। কেননা তাদের মতে তাঁদের মাসূম ইমামদের বাইরে এমন কেউ নেই, শরীয়াতে যার মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ইজমার বিভিন্ন রূপঃ

মুজতাহিদদের মতৈক্য কখনও কথার সূত্রে প্রকাশিত হয়, কখনও প্রকটিত হয় বাস্তব কাজের মাধ্যমে। প্রথমটি কথার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ইজমা– إجماع قولى

www.amarboi.org

আর দ্বিতীয়টি বাস্তব কর্মের মাধ্যমে জানা ইজমা (اجماع عملى) তবে মুজতাহিদদের ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে এ দুটির কোনটিই শর্তরূপে গণ্য নয়। ইজমার ব্যাপারে একমাত্র শর্ত হল, একটিমাত্র মতে সব মুজতাহিদের একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর একথা মুজতাহিদদের পারস্পরিক কথা-বার্তা থেকেও জানা যেতে পারে; জানা যেতে পারে এভাবেও যে, কেউ কোন কাজ করবেন, সমকালীন সব মুজতাহিদ তা জেনে যাবেন, অতঃপর একটা ভাল মিয়াদ-কাল অতিবাহিত হয়ে যাবে; কিন্তু এর মধ্যে মত প্রকাশে কোনরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে কারো কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি কিংবা অসম্মতি জানা যাবে না। জানা যাবে না, স্পষ্ট ভাষায় এর প্রতি দেয়া সমর্থনও। এরূপ হলেও তাকে ইজমা বলা যাবে এবং তাও শরীয়াতের একটি দলীল রূপে গণ্য হবে।

হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ উক্তরূপ ইজমাকে 'নির্বাক ইজমা' (اجماع سكوتى) নামে অভিহিত করেছেন। আর মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাবের কিছুলোক, কালাম শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশ এবং কোন কোন হানাফী ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, এটা কোন ইজমা নয়, নয় শরীয়াতের কোন দলীল।

কিন্তু জমহুর মুসলমানদের ঐক্যমতে অ-বাকহীন ইজমা শরীয়াতের দলীল রূপে গণ্য ও গ্রহণীয়। যে বিষয়ে একবার ইজমা সম্পন্ন হয়, অতঃপর তা আর ইজতিহাদের ক্ষেত্র হতে পারে না। কেননা মুসলমানদের গৃহীত পথ ও পন্থা অনুসরণ না করার উপর আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। ইজমাকে না মানলে সেই কঠোর বাণীরই সম্মুখীন হতে হবে। সূরা আন-নিসায় বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا*

(النساء: ١١٥)

হিদায়াতের বিধান ও পথ উজ্জ্বল-স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে লোক রাসূলের বিরুদ্ধতা করবে এবং মুমিন লোকদের গৃহীত ও অবলম্বিত পথ ছাড়া ভিন্নতর পথ অনুসরণ করবে, তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে গেছে এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেব। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান। (আন-নিসা-১১৫)

www.amarboi.org

এ থেকে জানা গেল, দ্বীন-ইসলামের উজ্জ্বল প্রতিভাত হয়ে উঠার ও তার ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের থেকে ভিন্নতর পথ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম এবং তাদের অুসরণ করা ওয়াজিব।

তাই রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الْخَطَاءِ،

আমার উম্মাত কোন ভুলের উপর একতাবদ্ধ হতে পারে না।

তবে যাঁরা ইজমাকে শরীয়াতের একটা দলীল রূপে গ্রহণে বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন, সর্বসম্মত মতটির কোন-না-কোন সনদের উপর ভিত্তিশীল হওয়া আবশ্যক। তাঁরা এও মনে করেন যে, ইজমা দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে না, তা সত্ত্বেও তা ইজতিহাদ গ্রহণ করে–তা কোন অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে হোক কিংবা বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে। তবে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে একবার ইজমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে তা অকাট্য হয়ে যায়। তখন সনদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন তার বিরুদ্ধতা সহীহ হতে পারে না। কোন বিশেষ কল্যাণ-বিবেচনার ভিত্তিতে যদি ইজমা অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে কল্যাণ-বিবেচনায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ইজমার ফয়সালাও পরিবর্তিত হবে।

ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন, যাঁরা ইজমার জন্য কোন সনদের প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে ইজমা ইজমা হিসেবেই গ্রহণীয় হওয়া উচিত।

সাহাবীর মতঃ

এখানে যে সাহাবীর কথা বলা হচ্ছে, যাঁর কথা বা মত শরীয়াতের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়, তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁর সাথে মিলে একটি কিংবা একাধিক যুদ্ধ করেছেন এবং সেই সময়ই ফিকাহ্‌র জ্ঞান ও ফতোয়া দানের যোগ্যতাসম্পন্ন বলে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং যাঁর ফিক্‌হী বিষয়ে বিপুল দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে।

একজন সাহাবীর মত অপর সাহাবীর জন্যে অবশ্য মান্য বা বাধ্যতামূলক হয় না। কিন্তু সাহাবী ছাড়া অন্যান্য লোকদের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা কি?......ব্যাপার যদি এমন হয় যা বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে না, তাহলে সেই

www.amarboi.org

ব্যাপারে সাহাবীর মত অবশ্যই শরীয়াতী দলীল রূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মিয়াদ বা পরিমাণ সম্পর্কিত ব্যাপারে সাধারণ মানুষের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি কোন কাজ করে না। এখানে সাহাবীর মত পাওয়া গেলে তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। কেননা এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে যে, সাহাবী নিশ্চয়ই স্বয়ং নবী করীম (স) থেকে তা শুনে থাকবেন। শুনতে পেয়েছেন বলেই তিনি তা বলেছেন। যথা হায়যের কম-সে-কম সময়-কাল নির্ধারণ। এক্ষেত্রে রাসূলে করীম (স) থেকে কিছুই বর্ণিত হয় নি, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির জোরেও তা নির্ধারণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে যে কোন সাহাবীর কথা গ্রহণীয় হতে পারে। তার বিরুদ্ধতা সঙ্গত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে এবং যাতে ইজতিহাদও চলে, তাতে যদি কোন সাহাবীর কোন মত পাওয়া যায় আর যদি দেখা যায় যে, অপর কোন সাহাবী সে কথা জানতে পারা সত্ত্বেও তার কোন বিপরীত মত দেন নি–তার বিরুদ্ধতাও করেন নি, তাহলে সেক্ষেত্রেও সাহাবীর কথা দলীল রূপে গ্রহণ করা হবে। কেননা দ্বীনী বিষয়ে সাহাবীদের বিচার-বিবেচনা শরীয়াতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুরূপ হবে বলে সাধারণভাবেই মনে করা যেতে পারে। তবে যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যেই বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছিল, তা হলেও এক শ্রেণীর ফিকাহ্‌বিদের মতে তা শরীয়াতের দলীল হবে এবং 'কিয়াসে'র উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা শরীয়াতের প্রকৃত মৌল ভাবধারা (روح) অনুধাবনে সাহাবী অধিকতর নিকটবর্তী। সাহাবী সে কথা খোদ রাসূলের নিকট থেকে শুনতে পেয়েছেন, তার নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু তিনি ভুলের ভয়ে রাসুলের নামে প্রচার করেন নি। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল শরীয়াতের মাসলা বের করার ব্যাপারে সাহাবীর কথার উপর খুব বেশী নির্ভরতা গ্রহণ করেছেন। তবে তার স্থান ইজমার পরে এবং কিয়াস-এর আগে। অবশ্য শীয়া ফির্কা সহ কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ সাহাবীর মতকে দলীল রূপে গ্রহণ করতে রাযী নন। তাঁদের মতে তা গ্রহণ করা হলে তা হবে শুধু অনুসরণ ও তাকলীদ।

প্রচলন

শরীয়াতের দৃষ্টিতে প্রচলন বা عرف বলতে বুঝায় সে সব রীতি-নীতি যা মানব মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে এবং সুস্থ প্রকৃতি তা গ্রহণ করে নিত্যকার জীবনে অনুসরণ করে চলেছে–হয় কাজের মাধ্যমে, না হয় কথার মাধ্যমে। উপরন্তু তা এমন যে, শরীয়াতের কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল (نص) কিংবা পূর্বকৃত কোন

www.amarboi.org

ইজমা তার বিপরীত নেই। এই ধরনের প্রচলন বা عرف কেও শরীয়াতের একটা উৎস রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচলন হতে পারে সার্বিক ও সাধারণ পর্যায়ের। যেমন শ্রম বা ব্যস্ততা বিক্রী, নির্মাণ সংক্রান্ত কোন চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে সমাজের সাধারণ প্রচলন। এ পর্যায়ের প্রচলন দেশ, অঞ্চল, সমাজ বা শ্রেণী-শ্রেণীতে পার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার বিশেষ বিশেষ পেশার লোকদের মধ্যে এক-এক ধরনের প্রচলন হয়ে থাকে। যারা যে বিষয়ে অবহিত ও ওয়াকিফহাল, তাদের জন্যে এই প্রচলনটাই একটা অকাট্য দলীল। এমন কি তাতে যদি 'কিয়াস' বা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও বিপরীত করা হয়, তবুও তাতে দোষ নেই। এমন কি ইমাম আবূ ইউসুফ পূর্ববর্তী কোন প্রচলন-ভিত্তিক অকাট্য দলীলও এজন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

'প্রচলন' পর্যায়ে বিশেষ শর্ত হল, তাকে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা হতে হবে, হতে হবে সমাজের উপর বিজয়ী এবং সর্বাধিক মাত্রায় অনুসৃত। তা বহু আগে থেকে চলে আসা হতে হবে, যে বিষয়ে তার হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে, তার খুবই নিকটবর্তী ও সন্নিহিত হতে হবে। চুক্তির দুই পক্ষ সাধারণতঃ যে সব শর্ত আরোপ করে তার বিপরীত হতে পারবে না, বিপরীত হতে পারবে না কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের (نص) ও ইজমার। কেননা এর একটা দলীল হওয়াটা সকলের জন্যে প্রযোজ্য। প্রচলন অকাট্য দলীল হতে পারে কেবলমাত্র সেইসব লোকের জন্যে যারা সে বিষয়ে অবহিত–ওয়াকিফহাল। এ কারণে একই বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হতে পারে প্রচলনের বিভিন্নতার কারণে, আনুসঙ্গিকভাবে। ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, এই পার্থক্য যুগের ও কালের পার্থক্য, দলীল প্রমাণের নয়।

সমস্ত ফিকাহ্‌বিদই প্রচলনকে একটা সাধারণ দলীল রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়াতের হুকুম জানবার জন্যে তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে–যদি সে বিষয়ে শরীয়াতের কোন অকাট্য দলীল বর্তমান না থাকে এবং সে বিষয়ে কোন ইজমাও অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় সর্বজন পরিচিত সাধারণ প্রচলনের বিরুদ্ধতা করা হলে লোকদের জীবন যাত্রা কঠিন, সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। মূল শরীয়াত প্রদাতাও শরীয়াতের বেশ কয়েকটি দলীলে এই প্রচলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাতে হয় তিনি প্রচলনকে ঠিক হুবহু গ্রহণ করেছেন; কিংবা তাকেই পুনর্গঠন করে নিয়েছেন। যেমন بیع سلم "অগ্রীম মূল্য গ্রহণ করে মাল পরে দেয়া'র ক্রয়-বিক্রয় প্রচলনকে বহাল রাখা হয়েছে। মদীনার অধিবাসীরা ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতি সম্পর্কে খুবই অবহিত ও ওয়াকিফহাল ছিল।

www.amarboi.org

চিন্তা-বিবেচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আনুসঙ্গিক উৎস

কিয়াস, ইস্তিহ্সান, আল্-মুস'লিহাত, আয্-যরায়ে', আল্-ইস্‌তিসহাব

কিয়াস (Analogy)

কিয়াস বলতে বুঝায়, যে বিষয়ে কোন 'নচ্ছ' (نص) –অকাট্য-স্পষ্ট দলীল নেই–নেই কোন ইজমা সেই বিষয়টিকে অপর এমন একটি ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করা, যে বিষয়ে শরীয়াতের স্পষ্ট-অকাট্য দলীল আছে কিংবা যে বিষয়ে কোন ইজমা হয়েছে এবং এই শেষোক্ত বিষয়ে শরীয়াতের যে-হুকুম, সেই হুকুমকে প্রথমোক্ত বিষয়ে প্রয়োগ করা। এ-প্রয়োগের মূল কারণ হল এই যে, ঠিক যে-কারণে এই বিষয়ে কোন অকাট্য হুকুম হয়েছে, আলোচ্য বিষয়টিতে সেই কারণটি বর্তমান রয়েছে। তাই কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ

فَالْمُرَادُ بِالْقِيَاسِ هُوَ اِظْهَارُ اَنَّ حُكْمَ اللّٰهِ فِى الْفَرْعِ هُوَ حُكْمُهُ فِى الْاَصْلِ الْمُقِيْسُ عَلَيْهِ،

অতএব কিয়াস বলতে বুঝায় একথা প্রকাশ করা যে, শাখা বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম তা-ই যা মূল বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম। এই মূল বিষটি বিবেচনা করেই শাখা বিষয়েও অনুরূপ হুকুম আরোপ করাকেই বলা হয় 'কিয়াস'।

ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ

اِنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثْبِتٌ لَهُ،

কিয়াস হচ্ছে যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করা।

পূর্বোক্ত কথাটি ফিকাহ্‌বিদদের এই কথাটিরই অর্থ ও তাৎপর্য।

এর কারণ হল, শরীয়াতের অকাট্য-স্পষ্ট দলীল তো সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঘটনাবলী সীমাহীন। অথচ নিত্য-নতুন এমন সব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে যা পূর্বে সংঘটিত হয় নি এবং যে-বিষয়ে শরীয়াতের কোন-না-কোন হুকুম নির্ধারণ অবশ্যই করতে হয়। আর পূর্বে সংঘটিত ঘটনা ও বিষয়াবলী সম্পর্কেও কোন-না-কোন হুকুম রয়েছে। এরূপ অবস্থায় নিরূপায় হয়ে ফিকাহ্‌বিদগণকে সেই

www.amarboi.org

দলীলহীন নতুন বিষয়টিকে পূর্ববর্তী দলীলসম্পন্ন বিষয় বা ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করতে হয়েছে এবং দু'টি বিষয়ে-ই মৌল কারণে মিল ও সাদৃশ্য থাকায় দুটিতে একই হুকুম নির্ধারণ করতে হয়েছে। বস্তুতঃ কুরআন ও সুন্নাতে গভীর চিন্তা-বিবেচনা করে সাদৃশ্যপূর্ণ ও তুলনাযোগ্য বিষয়াদি যাচাই-পরখ করে ও সেসবের উপর বুদ্ধিবৃত্তি আরোপের সাহায্যে এরূপ করা যায়।

অতএব 'কিয়াস' সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য অন্ততঃ চারটি জিনিস অপরিহার্য। প্রথম مَقِيسٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে শরীয়াতের অকাট্য-স্পষ্ট দলীল রয়েছে এবং তাতে সেই বিষয়ে একটা হুকুমও রয়েছে। পরিভাষায় এটিকে বলা হয়, اصل। 'মূল'। দ্বিতীয় مقيس যে বিষয়ে নতুন করে হুকুম জানতে হবে। কেননা সে-বিষয়ে শরীয়াতের কোন হুকুম পাওয়া যায়নি, অথচ সে সম্পর্কে শরীয়াতের হুকুম যে কি, তা অবশ্য জানতে হবে। পরিভাষায় এটিকে বলা হয়, فرع বা শাখা।

তৃতীয় জিনিস হল علت -কারণ, নিমিত্ত। তা এমন একটা গুণগত দিক, যা মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে সমান-ভাবে বর্তমান এবং এই কারণটি থাকার দরুণই মূল বিষয়ে শরীয়াতের সেই হুকুমটি দেয়া হয়েছে। মুজতাহিদ সেই হুকুমটিকে শাখা বিষয়েও সংক্রমিত ও আরোপিত করতে চান। কেননা এর মধ্যেও ঠিক সেই গুণই পাওয়া যায়, যা মূলে বর্তমান রয়েছে। সেই গুণটিকে এমন হতে হবে যার কারণে এই হুকুমটি হয়েছে বলে মনে করা যাবে এবং তাকে প্রকাশ্য ও সুসংবদ্ধ হতে হবে। মূলের ব্যাপারে দেয়া হুকুমও হবে সাধারণ। কেননা যাতে ব্যতিক্রম রয়েছে, তাতে 'কিয়াস' চলে না।

'কিয়াস' একটা দলীল

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতে 'কিয়াস' শরীয়াতের দলীলসমূহের মধ্যে অন্যতম একটা দলীল। এই উপায়ে যে হুকুমটি পাওয়া যায় তাতে অপ্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মায় (غلبة الظن)। তদনুযায়ী আমল করা মূল শরীয়াতের উদ্দেশ্যের অনুরূপ ও পরিপূরক। কেননা যে দলীল সহীহ রূপে পাওয়া গেছে (المنقول الصحيح), তা যুক্তিমূলক ও বিবেকসম্মত অন্যান্য বিষয়ও শামিল করে—তা বর্তমান থাক আর না-ই থাক। এই কিয়াসও যে একটা দলীল এবং তা মেনে নেয়া উচিত, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা বলেছেনঃ যে বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানা লক্ষ্য হবে, তা যদি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের নিক্তিতে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সমাজের মধ্যে 'ইস্তিম্বাত' করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তা থেকে সে হুকুমটি অবশ্যই বের

www.amarboi.org

করতে পারবেন। তা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র দেখিয়ে দেয়া-জানিয়ে দেয়া ইল্মের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে আইন-বিধান প্রচার, চালু ও কার্যকর করতে। রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীদের অনেকের ব্যাপারেই অনেক কথা বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামও বহু কাজ করেছেন। কাজেই এসবের আলোকে 'কিয়াস'ও শরীয়াতের অন্যতম দলীল রূপে গ্রহণীয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্যে শরীয়াতের নির্দিষ্ট শাস্তি মদ্যপায়ীর প্রতিও আরোপ করার ব্যাপার নিয়ে হযরত উমর (রা) পরামর্শ চাইলেন। তখন এই ফর্মূলাটি (Formula) বলা হলঃ

نُطْبِقُ عَلٰى شَارِبِ الْخَمْرِ حُكْمَ الْمُفْتَرِىْ لِاَنَّهٗ اِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَاِذَا سَكِرَ هَذٰى وَاِذَا هَذٰى اِفْتَرٰى وَعَلَى الْمُفْتَرِىْ ثَمَانُوْنَ جِلْدَةً ،

মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্যে নির্দিষ্ট দন্ড মদ্যপায়ীর উপরও আমরা আরোপ করব। কেননা যখন কেউ মদ্যপান করে সে নেশাগ্রস্থ হয়। আর নেশাগ্রস্থ হলে সে বাজে বকে। আর যখন বাজে বকে, তখন সে মিথ্যাও বলে। আর মিথ্যা দোষারোপকারীর জন্যে (শরীয়াতের দলীল অনুযায়ী) আশীটি দোররা শাস্তি।

হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রা)-কে বলেছিলেনঃ

اَعْرِفِ الْاَمْثَالَ وَالْاَشْبَاهَ وَقِسِ الْاُمُوْرَ عِنْدَكَ ،

সাদৃশ্যপূর্ণ ও পরস্পর তুলনাযোগ্য বিষয়াদি চিনতে ও জানতে চেষ্টা কর এবং তোমার সমুখে উপস্থিত বিষয়াদি তার উপর রেখে বিবেচনা (কিয়াস) কর।

হানাফী মতের ফিকাহ্বিদগণ 'কিয়াস'কে খুব বেশী ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এমনকি তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ' বাদ দিয়েও 'কিয়াস'কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এতদূর বলেছেনঃ

اِنَّ مُجَرَّدَ الشِّبْهِ فِى الْاَوْصَافِ كَافٍ لِلْقِيَاسِ وَاِنْ لَّمْ تَتَّفِقِ الْعِلَّةُ ـ

www.amarboi.org

দুটি বিষয়ের গুণগত সাদৃশ্যই 'কিয়াস' করার জন্যে যথেষ্ট, মূল কারণ এক না হলেও কোন ক্ষতি নেই।

কিন্তু ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল কেবলমাত্র প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই 'কিয়াস'-এর আশ্রয় নেয়ার পক্ষপাতী, অন্যথায় নয়। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে মধ্যম নীতির অনুসারী। আর জাহেরী মতের ফকীহগণ 'কিয়াস' গ্রহণ করতে সাধারণভাবেই নিষেধ করেন। কেননা তা একটা ধারণাই দেয়, প্রত্যয় সৃষ্টি করে না। এ বিষয়ে তাঁদের মতের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

'আল্-ইস্তিহ্সান'

'ইস্তিহ্সান' استحسان শব্দের অর্থ, 'কোন জিনিসকে উত্তম ও ভাল মনে [illegible] হয়েছেঃ عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا কোন জিনিসকে উত্তম ও ভাল করা। বলা হয়েছেঃ [illegible] এর অর্থঃ গণ্য করা। আর পার[illegible]

هُوَ الْعُدُوْلُ عَنْ قِيَاسٍ وُضِحَتْ عِلَّتُهُ اِلٰى قِيَاسٍ خُفِيَتْ عِلَّتُهُ اَوْ اِلٰى دَلِيْلٍ اٰخَرَ،

কিয়াসের একটা স্পষ্ট কারণ বাদ দিয়ে কিয়াসেরই অপর একটি কারণের দিকে–যা অস্পষ্ট রয়ে গেছে কিংবা অপর কোন দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা

কিংবা

هُوَعُدُوْلُ الْمُجْتَهِدِ عَنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ اِلٰى حُكْمٍ اِسْتِثْنَائِىْ لِدَلِيْلٍ رُجِّحَ لَدَيْهِ هٰذَا الْعُدُوْلُ۔

একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোন দলীলের ভিত্তিতে কোন ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা, যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকারী বানিয়ে দিয়েছে–তাকেই ইস্তিহ্সান বলা হয়।

ইস্তিহ্সান-এর এই সংজ্ঞায় দুটি জিনিস শামিল রয়েছেঃ

প্রথম, একটি কিয়াস-এর 'কারণ' অস্পষ্ট রয়ে গেছে তা মন থেকে দূরে পড়েছিল বলে, আর অপর একটি কিয়াস–এর 'কারণ' প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট হয়েছে

www.amarboi.org

এজন্যে যে, মন সেদিকে দ্রুত ও প্রথমতঃই ছুটে গেছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিকে বাদ দিয়ে প্রথমটিকে গ্রহণ করা 'ইস্তিহ্সান'। যেমন কৃষি জমি ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে সাধারণ জনকল্যাণের অধিকারকে শামিল করা সংক্রান্ত মত। এতে কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল নেই। এটা সম্পূর্ণ 'ইস্তিহ্সান'-এর ভিত্তিতেই করা হয়েছে। কেননা জমিন দ্বারা কোন ফায়দা পাওয়া এছাড়া সম্ভবপর নয়। যদিও 'ওয়াক্ফ' ও 'বিক্রয়' দুটিই একই রকম কাজ। কেননা দুটি ক্ষেত্রেই মূল মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। 'ওয়াক্ফ'কে বিক্রয়-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা কোন দলীল ছাড়াই অনুসরণ করার দাবি করে।

দ্বিতীয়, কোন সামগ্রিক মূল্য বা সাধারণ নিয়ম থেকে কোন খুঁটিনাটি মাসলা বাদ দিয়ে (Exception) নেয়া এমন একটি বিশেষ মূলের কারণে, যা এরূপ করার দাবি করে। যেমন রোযাদারের পানাহার করা রোযা ভঙ্গকারী কাজ। কেননা পানাহার থেকে বিরত [illegible] কাজ। [illegible] থাকাই [illegible] রোযার স্তম্ভ-মৌল ভিত্তি। কিন্তু ফিকাহ্‌বিদগণ এ সাধারণ নিয়ম থেকে ভুলবশতঃ খাওয়ার ব্যাপারটিকে বাদ দিয়েছেন 'ইস্তিহ্সান'-এর ভিত্তিতে। কেননা রাসূলে করীম (স) নিজেই বলেছেনঃ

مَنْ اَكَلَ اَوْشَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،

যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় কিছু খায় বা পান করে ভুলবশত, সে যেন তার রোযা সম্পূর্ণ করে।

আইনের ক্ষেত্রে 'ইস্তিহ্সান'-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের প্রয়োজনের পরিধি এত বিশাল এবং তার স্বরূপ এত জটিল যে, কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ কতকগুলো আইন দ্বারাই মানুষের সামগ্রিক ও সর্বপ্রকারের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। এমন কি, 'কিয়াস' অনেকটা প্রশস্ততা বিধানকারী হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের সমস্যা সমাধান পর্যায়ে অ-প্রতুল হয়ে পড়ে অনেক সময়। তাই ইস্তিহ্সান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এই কারণে 'ইস্তিহ্সান' সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

اَلْاِسْتِحْسَانُ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْاَخْذُ بِمَا هُوَ وَفْقُ لِلنَّاسِ،

কিয়াস পরিত্যাগ করে জনগণের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণকেই 'ইস্তিহ্সান' বলা হয়।

www.amarboi.org

বলা হয়েছেঃ

اَلْاِسْتِحْسَانُ طَلَبُ السُّهُوْلَةِ فِى الْاَحْكَامِ فِيْمَا يَبْتَلِىْ فِيْهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ (المبسوط :ج-١، ص-١٤٥)

আইন-বিধানের ক্ষেত্রে নির্বিশেষে সব মানুষ যাতে জড়িত, তাতে সহজতা গ্রহণ করাই হল ইস্তিহ্সান।

আর এসবের সার কথা হল, কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা গ্রহণই হল ইসলামী শরীয়াতের লক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্র ইচ্ছাও এতেই নিহিত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٢)

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কঠোরতা–কঠিনতা গ্রহণ করতে চান না। তিনি তোমাদের জন্যে সহজতা বিধান করতেই ইচ্ছুক।

স্বয়ং নবী করীম (স) হযরত আলী ও হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا اَقْرِبَا وَلَا تُنَفِّرَا

তুমি লোকদের জন্যে সহজতার ব্যবস্থা করবে, তাদের কঠিন ও দুর্বিসহ অবস্থায় ফেলবে না। লোকদেরকে নিকটে টেনে আনবে। তাদের বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন বানাবে না।

এরূপ সহজতা বিধান প্রত্যেক আইনেরই ধর্ম। গ্রীক আইনে Epic keia ও রোমান আইনে Aequita নামে যে নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তা এ পর্যায়েরই ব্যবস্থা। আধুনিক ইউরোপীয় আইন-দর্শনে Natural justice বলতে যা বুঝানো হয়, মোটামুটিভাবে তা-ও এই জিনিসই।

ইস্তিহ্সান-এর প্রকার-ভেদঃ

যে দলীলের ভিত্তিতে 'ইস্তিহ্সান'কে শরীয়াতের একটা উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বিভিন্ন। এই কারণে মূল 'ইস্তিহ্সান'টিও নিম্নলিখিত রূপে বিভিন্ন ভাগে বিভক্তঃ

(১) যে-ইস্তিহ্সান কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের উপর ভিত্তিশীল। যেমন শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি (عقد الاجارة)। কেননা 'কিয়াস' এটির যথার্থতা স্বীকার

www.amarboi.org

করে না, যেহেতু মুনাফা নিত্য-নতুন রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু ইস্তিহ্সান-এর ভিত্তিতে এ কাজটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পিছনে দলীল রয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর কথাঃ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

চুক্তিসম্পন্ন শ্রমিককে তার চুক্তি-ভিত্তিক মজুরী দিয়ে দাও তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই।

(২) যে-ইস্তিহ্সান কোন ইজমার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। যেমন কোন কাজ করার জন্যে কারো সাথে চুক্তি করা। যদিও মূল চুক্তিটা হচ্ছে যে কাজের উপর সেই কাজটি চুক্তির মূহূর্তে অনুপস্থিত-অস্তিত্বহীন, তা সত্ত্বেও ফিকাহ্বিদগণ এই চুক্তিকে জায়েয বলেছেন।

(৩) প্রয়োজনের ভিত্তিতে গৃহীত ইস্তিহ্সান। যেমন, যে-সব পাখী পা দিয়ে ছিঁড়ে খায় তার খাদ্যাবশিষ্টকে পবিত্র মনে করা–যদিও সে পাখী নাপাক জিনিস খায়।

(৪) প্রচলনের ভিত্তিতে গ্রহীত 'ইস্তিহ্সান'। যেমন, প্রকৃত জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা। এ রকম চুক্তি করার সাধারণতঃ রেওয়াজ বা প্রচলন রয়েছে, যেন পরে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়।

(৫) কেবলমাত্র কল্যাণ-বিবেচনায় গৃহীত 'ইস্তিহ্সান'। যেমন কারিগরকে জিনিসপত্রের জন্যে দায়ী করা। শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি হলঃ

إِنَّ الْأَمِيْنَ لَا يَضْمَنُ

আমানতদারকে আমানতী জিনিসের ব্যাপারে দায়ী করা যায় না

'কারিগর'ও আমানতদারই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে সমর্পিত জিনিস-পত্রের জন্যে–যদি তা খোয়া যায়–দায়ী করা যাবে এই ইস্তিহ্সান-এর ভিত্তিতে। কেননা কারিগররা প্রায়ই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ কারণেই এই মত গ্রহণ করা হয়েছে।

'ইস্তিহসান' শরীয়াতের উৎস (Jurist enquity)

হানাফী ফিকাহ্বিদগণই 'ইস্তিহ্সান'কে শরীয়াতের মস্লা নির্ধারণে প্রয়োগ করেছেন অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশী। মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে এর নাম

www.amarboi.org

নিয়ে মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি তাঁরাও এটির প্রয়োগ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী এর ভিত্তিতে শরীয়াতে কোন দলীল পেশ করাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

যে লোক ইস্তিহ্সান-এর ভিত্তিতে শরীয়াতী ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সে যেন নিজেই শরীয়াত রচনার অপরাধ করল।

ইমাম শাফেয়ীর এই কথাটির মূলে রয়েছে তাঁর এই ধারণা যে, ইস্তিহ্সানটা বুঝি মুজতাহিদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং তার পিছনে কোন শরীয়াতী দলীলের ভিত্তি নেই। এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো তার প্রতি কোন আস্থাই স্থাপন করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আসল কথা হল গ্রহণযোগ্য ও গণনীয় 'ইস্তিহ্সান' তো তা-ই যা কোন দলীলের উপর ভিত্তিশীল, যদিও তা এমন 'কিয়াস'-এর বিপরীত যার কারণটি প্রকাশমান। এরূপ 'ইস্তিহ্সান' গ্রহণ ও গণনা করা এবং এর ভিত্তিতে শরীয়াতী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে জায়েয, তার দলীল হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাঃ

اَلَا اِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ فَاَوْغِلُوْا فِيْهِ بِرِفْقٍ وَلَا تُبَغِّضُوْا عِبَادَ اللّٰهِ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَاِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا اَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا اَبْقٰى،

জেনে রাখ, দ্বীন-ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ। অতএব তোমরা তাতে বিশেষ নম্রতা, সহজতা সহকারে প্রবেশ কর। আর আল্লাহ্র বান্দাহগণকে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাতের প্রতি বিদ্বেষী বানিয়ে দিওনা।

আর সত্যি কথা হচ্ছে, ইস্তিহ্সান মূলত এমন একটা নিয়ম-পদ্ধতি যা সব রকমের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। এ কারণেই ইমাম মালিক (র) বলেছেনঃ

اَلْاِسْتِحْسَانُ تِسْعَةُ اَعْشَارِ الْعِلْمِ،

'ইস্তিহ্সান' শরীয়াতী জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ।

মুসলিহাত (Public good)

'মুসলিহাত' বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে যে বিষয়ে শরীয়াত দাতার তরফ হতে এমন কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল এসে পৌছায়নি, যা তাকে

www.amarboi.org

গণ্য করার আহ্বান জানায় কিংবা গণ্য না করার এবং যার এমন কোন মূলও নেই, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোন-না-কোন ফায়দা অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ফিকাহ্‌বিদগণ এমন মুসলিহাত গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, যা প্রকৃত এবং সাধারণ এবং যা গণ্য করা হলে কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের সাথে বিরোধকারী হবেনা; অথবা হবেনা কোন ইজমার বিরোধী। এ বিষয়ে [illegible] বিস্তারিত আলোচনা [illegible] করা হবে।

সাহাবা ও মুজতাহিদদের বহু সংখ্যক লোক প্রাথমিক যুগসমূহে এই মুসলিহাত অনুযায়ী অনেক আমল করেছেন। তাঁরা মুসলিহাতকে গ্রহণ করতে গিয়ে কিয়াস পরিহার করেছেন। মালিকী মাযহাব এবং অন্যান্য তিনটি মাযহাবের জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ ও খাওয়ারিজ মতাবলম্বীরা 'মুসলিহাত'কে গণ্য ও গ্রহণ করেছেন। নাজমুদ্দীন তুফী (মৃতঃ ৮১৬ হিঃ) এই ক্ষেত্রে খুব ব্যাপকতা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য জাহেরীয়া, শীয়া জাফরীয়া ও অন্য কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ 'মুসলিহাত' গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, শরীয়াতে এভাবে 'মুসলিহাত' গ্রহণের অবাধ সুযোগ থাকলে একেতো স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ সুযোগ হবে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকেরা এই নীতির আড়ালে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করার সুযোগ পাবে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে পেশ করা হবে।

যারায়ে

'যরীয়া' বলা হয় কোন জিনিস পর্যন্ত পৌছার একটা অসীলা বা পথ ও পন্থা। শরীয়াতের হুকুম নাজিল হওয়ার দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। তা হয় মূল লক্ষ্য হবে, যে সব ক্ষেত্রে মূল জিনিসেই কোন-না-কোন কল্যাণ রয়েছে কিংবা তা বিপর্যয়কারী এবং সে পর্যন্ত পৌছার উপায় রয়েছে। বস্তুতঃ 'অসীলা'ও অনেক সময় চরম লক্ষ্যের মর্যাদা গ্রহণ করে। যেমন আমাদের শত্রু পক্ষ যদি আমাদের সপক্ষের কোন লোক বন্দী করে এবং এমনিই তাকে ছেড়ে দিতে রাযী না হয়; বরং আমাদের দেয়া মাল-সম্পদ পেয়েই তাকে মুক্ত করতে রাযী হয়, তাহলে শত্রু পক্ষকে মাল-সম্পদ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনার অনুমতি দিয়েছেন ফিকাহ্‌বিদগণ, যদিও শত্রু পক্ষকে মাল-সম্পদ দিলে তাকে আরও শক্তিশালী করে দেয়া হয়। অথবা বিদ্রোহী বা ডাকাত শ্রেণীর লোকেরা যদি আমাদের নিকট থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, তাদের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রী করা হারাম। কেননা তা একটা কঠিন বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যম হতে পারে।

www.amarboi.org

সমস্ত ফিকাহ্‌বিদই নীতিগতভাবে 'যারায়ে' গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তবে তা কতটা গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে এবং তার সাহায্যে কোন হুকুম পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী পন্থা গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ উপায়কে চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেন [illegible] এবং চরম লক্ষ্যের যে গুরুত্ব, তা-ই তাকে [illegible] আরোপ করেন। তাও তখন, যখন তার জন্যে একটা পন্থা নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন নির্ণিত হবে না, তখন কি করা হবে? এ বিষয়ে ইমাম মালিকের প্রখ্যাত মত হল, তা মৌলিকভাবে গণ্য করা যাবে। ইমাম আহমাদও প্রায় এই মতই পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা এই মত গ্রহণ করেন নি। জাহেরী মতের ফিকাহ্‌বিদগণ 'যারায়ে' (ذرائع) গ্রহণ করতেই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কোন হারাম কাজে ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে সব রকমের সংশয়-সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে সরে থাকার নীতিই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ যে মত গ্রহণ করেছেন, তা-ই অন্য সব মতের তুলনায় অধিক সহীহ্ বলে মনে হয়। কেননা এ মতের ভিত্তি হচ্ছে এ হাদীসটির উপরঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

আমলের বিচার ও মূল্যায়ন হওয়ার একমাত্র মানদন্ড হল নিয়্যাত।

আল-ইস্তিসহাব اَلْاِسْتِصْحَابُ

অতীত কালে শরীয়াতের যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হুকুমটাকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয় 'ইস্তিসহাব' (Presumption [illegible] arising from accompanying Circumstances)। সে হুকুমটাকে কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোন দলীল পাওয়া যাবে যা সেটিকে বদলে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দিবে। যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসাবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এক ব্যক্তি কোন যুবতী মেয়েকে বিয়ে করল এই কথা জেনে নিয়ে যে, সে মেয়ে কুমারী পরে স্বামী যৌন মিলন কালে যদি দাবি করে যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তা হলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে তার পক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ পেশ করবে। কেননা মেয়েটি মূলতঃ কুমারী ছিল বলেই আগে থেকে জানা ছিল। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ফিকাহ্ বিজ্ঞানে বলা হয় 'ইস্তিসহাব'।

'ইস্তিসহাব' কয়েকটি ভাগে বিভক্তঃ

www.amarboi.org

(১) বস্তুসমূহের জন্যে মূলত যে হুকুম-যে সিদ্ধান্ত-অর্থাৎ সে সবের ব্যবহার মুবাহ্-অনিষিদ্ধ, তা-ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কোন অকাট্য দলীল পাওয়া যাবে। পরিভাষায় এটিকে বলা হয় استصحاب الحكم الاصلي।

(২) মূলতঃ প্রত্যেকটি মানুষই অঋণগ্রস্থ। কেউ যদি অপর কারো উপর কোন ঋণ আছে বলে দাবি করে এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে সে ব্যক্তিকে (যাকে দায়ী করা হচ্ছে) ঋণমুক্তই ধরে নিতে হবে। কেননা 'ইস্তিস্হাব' নীতিতে প্রত্যেকটি মানুষ তার আসল অবস্থায়ই স্বীকৃত হওয়ার দাবি রাখে। তবে দাবিকারীর দাবি যদি তার উপর প্রমাণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। একে বলা হয়ঃ

اِسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ

(৩) যে জিনিসের স্থিতি কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তা-ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কথা প্রমাণিত হবে। যেমন, কেউ যদি একটা ঘর খরীদ করে কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তখন তার দখল ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বসবাস তার সত্যতার ও যথার্থতার সাক্ষ্য দেয়। এ সাক্ষ্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। কেননা এ ব্যাপারটি সামনেই উপস্থিত। এই প্রমাণটি 'ইস্তিস্হাব' পদ্ধতির। যদিও এ অবস্থায় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু

مَا ثَبَتَ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

যা দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণিত,তা সন্দেহ-সংশয়ে দূরীভূত হয় না।

মালিকী, হাম্বলী মাযহাব এবং শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ লোক এটাকেও একটা অকাট্য দলীল রূপে গণ্য করেছেন। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ এবং অন্যান্য কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এই মত পোষণ করেন যে, কোন সিদ্ধান্তের স্থিতির জন্যে এই একটাই যথেষ্ট দলীল হতে পারে না। এটাকে দলীল রূপে গণ্য করার জন্যে কতিপয় নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে আসল নিয়মটি হলঃ

بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ حَتَّىٰ يَثْبُتَ مَا يُغَيِّرُهُ

যা যে অবস্থায় আছে, তা সেই অবস্থায়ই অপরিবর্তিত থাকবে যতক্ষণ না তাকে পরিবর্তন করে দেয় এমন কোন জিনিস প্রমাণিত হবে।

আর

www.amarboi.org

اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ

সমস্ত বস্তু ও জিনিসের ব্যাপারে মূল কথা হল, তা মুবাহ্-অ-নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবেঃ

اَلْاَصْلُ فِي الذِّمَّةِ الْبَرَاءَةُ

দায়িত্বের ব্যাপারে মূল কথা হল, মানুষ মাত্রই ঋণমুক্ত

এবং

اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

দৃঢ় প্রত্যয় সন্দেহ-সংশয়ের দ্বারা অবসিত হতে পারে না।

www.amarboi.org

ইজ্‌তিহাদ
(Exposition of the Law)

ভূমিকাঃ

ইসলামী শরীয়াত ও আইন প্রণয়নের ইতিহাসে ইজতিহাদ একটা অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য কার্যকারণ (Factor)। কেননা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন এমন বহু বিষয় ও ব্যাপারই আছে, যে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে শরীয়াতদাতা এমন বহু নিদর্শন দাঁড় করে দিয়েছেন, এমন কিছু নিয়ম-পন্থা বলে দিয়েছেন, যা সেই ব্যাপারে পথ-প্রদর্শন করতে পারে।

'ইজতিহাদ' (الاجتهاد) শব্দের অর্থ ফিকাহ্‌বিদ ও ফিকাহ্-নীতিবিদদের মত অনুযায়ী এইঃ

بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ مِنْ اَدِلَّتِهَا بِالنَّظْرِ الْمُؤَدِّىْ اِلَيْهَا

শরীয়াতের দলীলসমূহের ভিত্তিতে সে পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন দৃষ্টি ও চিন্তা-বিবেচনা সহকারে শরীয়াতের হুকুম বের করার জন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করাই হল ইজতিহাদ।

শরীয়াতী হুকুমের উৎস পর্যায়ে আমরা যখন ইজতিহাদের উল্লেখ করি, তখন তা এমন একটা কথা দাঁড়ায় যা শর্তহীন নয়। কেননা মুজতাহিদের নিজের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ এমন একটা কাজ যা সংঘটিত হয় শরীয়াতের পূর্বোল্লেখিত উৎসসমূহে গভীর চিন্তা-বিবেচনা পরিচালনার সাহায্যে। কিন্তু মুজতাহিদের নিকট থেকে যে-লোক শরীয়াতের হুকুম গ্রহণ করে, সে 'মুকাল্লিদ'-তাক্বলীদকারী অর্থাৎ অন্য লোকের নিকট থেকে যা জানতে পারে তা সে নির্বিচারে মেনে নেয়। কেননা সে নিজে মাসলা বের করতে সক্ষম নয়। এহেন লোকের নিকট ইজতিহাদ শরীয়াতের একটা উৎস বটে। কেননা সে তো এই ইজতিহাদটি শরীয়াত মুতাবিক করা হয়েছে বলেই তা মেনে নিচ্ছে।

মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে ও বিষয়ে শরীয়াতের কোন-না-কোন হুকুম অবশ্যই রয়েছে। এখন শরীয়াত পালনে বাধ্য লোকেরা সে হুকুম জানতে হয় সে সম্পর্কিত অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের (نص) ভিত্তিতে, অথবা সেই হুকুম জানা যায় যে দলীল দ্বারা তৎসংক্রান্ত লক্ষণ বা ইশারা-ইঙ্গিত থেকে। এই হিসাবে ইজতিহাদ তিন প্রকারেরঃ

www.amarboi.org

(১) শরীয়াতের দলীল থেকে সুস্পষ্ট-অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না কিংবা সরাসরি বুঝায় না, এমন হুকুম লাভ করার জন্যে পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা পরিচালনা করা। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কাজ শরীয়াতের দলীল অনুধাবন, দলীলের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দান কিংবা কতিপয় দলীলের মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ দেখা দিলে তখন তার একটি দলীলকে অগ্রাধিকার দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) যে বিষয়ে শরীয়াতের কোন দলীল বা ইজমা' উদ্ধৃত হয়নি, সে বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম কি তা জানার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা [illegible] চালানো। এই কাজ সম্পন্ন হয় শরীয়াতের বিভিন্ন ইশারা [illegible] -ইঙ্গিতের ভিত্তিতে আর তা বুঝাবার জন্য শরীয়াতদাতা [illegible] যে-পথ দেখিয়েছেন সেই পথে। এই ইজতিহাদকে বলা হয়ঃ اِجْتِهَادُ بِالرَّأْى চিন্তা-ভাবনা-বিবেচনা-ভিত্তিক ইজতিহাদ।

(৩) কিয়াস ও ইস্তিহ্সান প্রভৃতির সাহায্যে যেখানে শরীয়াতের হুকুম লাভ করা যায় না, সেখানে শরীয়াতের সামগ্রিক নিয়ম-কানুনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করে শরীয়াতের কোন হুকুম লাভ করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো।

এই ইজতিহাদ কিয়াসের তুলনায় সাধারণ ও ব্যাপক। কেননা এই ইজতিহাদ যেমন চলে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে শরীয়াতের দলীল পাওয়া যায়, তেমনি সেখানেও যেখানে শরীয়াতের কোন দলীল পাওয়াই যায় না। কিয়াসের সাহায্যে যে হুকুম লাভ করা যায়, তাও এর মধ্যে শামিল। এ থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইবাদাত, দণ্ডবিধান, কাফ্ফারা এবং ইবাদাত পর্যায়ের অন্যান্য ব্যাপারের ক্ষেত্রসমূহে 'কিয়াস' ব্যবহৃত হতে পারে না; কেননা এগুলো সেই পর্যায়ের জিনিস যা কারণ-এর উপর নির্ভরশীল নয়। অথচ কিয়াস-এর ভিত্তিই হল 'কারণ' সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করা। কেননা তাতে একটি ক্ষেত্রে দেয়া হুকুমকে তার কারণের সাথে সাদৃশ্য দেখে অপর একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ চলে?

যে-সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাত থেকে শরীয়াতের সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীল রয়েছে এবং যা সুস্পষ্টভাবে 'হুকুম' প্রকাশ করে, অথবা যে-সব বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেসব বিষয়ে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। এ সব ক্ষেত্রে বরং শরীয়াতের সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীলের বিরুদ্ধতা করাই সুস্পষ্টরূপে হারাম। যে-সব বিষয়ে স্পষ্ট-অকাট্য দলীল নেই অথবা যে-সব বিষয়ে কোন দলীলই নেই—নেই কোন ইজমা, ইজতিহাদ কেবলমাত্র সেসব

www.amarboi.org

ক্ষেত্রেই করা হয়। কেননা সে সব ক্ষেত্রে শরীয়াতের দলীল অনুধাবন করা কিংবা তা থেকে কোন হুকুম জানা যায় কিনা, এ বিষয়ে মত নির্ধারণে আলোচকদের বিভিন্ন মত হয়ে থাকে। অথবা অন্যান্য ইশারা-ইঙ্গিত বা নিদর্শনাদির সাহায্যে আল্লাহ্‌র হুকুম জানতে পারার ব্যাপারেও নানা মতের সৃষ্টি হয়। এ কারণেই সেখানে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কথা থেকে আর একটা কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তা হল, ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত-পার্থক্য বা মত-[illegible] হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। তাকে এড়িয়ে যাওয়া [illegible] কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ শরীয়া[illegible]তের আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ হল একটি গুরুত্বপর্ণ–বিরাট ও বিপুল সম্ভাবনাময় একটি [illegible] উৎস। ইজতিহাদ থেকে [illegible] না-শরীয়াতের যেসব হুকুম-আহকাম জানা যায় তা যদি অকাট্য ও সন্দেহাতীত[illegible]ও হয়ে থাকে, তবু ইজতিহাদ এক একক উৎস হয়েই থাকবে। কেননা মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে একটিমাত্র মতে ঐক্যবদ্ধ হবেন ও একই মত পোষণ করবেন, তা ধারণা করা যায় না। এই কারণে ইজতিহাদ শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি প্রার্থিত উৎস ও ব্যবস্থা। যে-সব বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানা দরকার, তাতে 'ইস্তিম্বাত' করেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জেনে নিতে হবে, যদিও তার উপর বহু প্রকারের শর্ত আরোপিত হয়েছে। ইজতিহাদকে সর্বাবস্থায় তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে রাখা আবশ্যক। তাকে সদা কার্যকর না রাখা হলে আল্লাহ্‌র বিধানকেই নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর করে দেয়া হবে; আল্লাহ্ তা'আলা মোটামুটিভাবে যে শরীয়াত পালনের দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়েছেন, তা চিনতে ও জানতে পারাকেও ব্যর্থ করে দেয়া হবে। আর এ কাজ যে নিতান্তই হারাম, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মুজতাহিদের বিশেষ গুণাবলী

ইসলামী আইন তত্ত্ববিদদের মতে ইজতিহাদের কঠিনতর কাজে যে লোক হাত দিতে ইচ্ছুক, তার কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা একান্তই আবশ্যক। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় জরুরী গুণ হল তাকে কুরআন ও সুন্নাতের যাবতীয় বিধান এবং শরীয়াতের আইন প্রণয়নের সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও বিদ্যার অধিকারী হতে হবে। কুরআনের আয়াতসমূহের নাজিল হওয়ার এবং হাদীসসমূহের বিবৃত হওয়ার কার্যকারণ তাকে জানতে হবে। কোন্ আয়াত কোন্ আয়াত দ্বারা রহিত বা মনসূখ হয়েছে এবং মুতাওয়াতির হাদীস কি কি, এসব বিষয়ে তাকে বিশদ জ্ঞানী হতে হবে। শরীয়াতের যে-সব হুকুম-আহকামের ইজমা হয়েছে আর যে সবে রয়েছে বিভিন্ন মত, সেসব বিষয়েও তাকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। আহকামের 'ইল্লাত' বা কারণ, সে সবের মৌল লক্ষ্য এবং শব্দসমূহ থেকে গৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও তার জানা থাকতে

www.amarboi.org

হবে। এছাড়া শরীয়াতের দলীলাদি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ বিধায় তা নির্ভুলভাবে বুঝবার জন্য জরুরী আরবী ভাষা জ্ঞানও তার আয়ত্তাধীন হতে হবে। সেই সঙ্গে জরুরী হল মুজতাহিদকে নিজের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি, ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান, নীতিনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ সুবিচার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। শরীয়াতের হুকুম-আহকাম প্রণয়নে কোন রূপ প্রতারণামূলক আচরণ করতে পারে এরূপ [illegible] তার সম্পর্কে থাকতে পারবে না।

হানাফী মাযহাবের লোকেরা অতিরিক্ত এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, মুজতাহিদের ইজতিহাদের ফলে যা প্রকাশিত হল, তার নিজের আমলও তদনুযায়ী হতে হবে।

ফিকাহ্ চর্চায় নিবেদিত লোকেরা যদি শরীয়াতের সমস্ত ব্যাপারে কিংবা অধিকাংশ বিষয়ে ইজতিহাদ করেন, তবে তা হবে সামগ্রিক ও সর্বাত্মক ইজতিহাদ। আর যদি বিশেষ একটি বা কয়েকটি বিষয়ে ইজতিহাদ করেন, তবে তা হবে আংশিক ইজতিহাদ। এরূপ ক্ষেত্রে এই বিশেষ হুকুমের বা হুকুম ক'টির সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে তাকে অবশ্যই জ্ঞানবান হতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে তেমন না জানলেও কোন ক্ষতি নেই।

ইজতিহাদী হুকুম পালন করা কখন জরুরী

মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে শরীয়াতের যে হুকুম জানতে পারেন তা পালন করা তার নিজের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য-যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের সেই ইজতিহাদী মতে অবিচল থাকবেন। অনুরূপভাবে তাঁর নিকট যে লোক ফতোয়া চাইবে, তার পক্ষেও তা পালন করা কর্তব্য হবে। কেননা সে যখন তারই নিকট ফতোয়া চেয়েছে, তখন তার এই ফতোয়া চাওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ইজতিহাদের প্রতি তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ঐকান্তিক বিশ্বাস রয়েছে। অন্যথায় সে তার নিকট নিশ্চয়ই ফতোয়া চাইত না। শরীয়াতের মূলনীতি বিশারদ ও বিশেষজ্ঞদের এ-ই মত। মুজতাহিদ কোন্ দলীলের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন বা ফতোয়া দিয়েছেন, ফতোয়া প্রার্থীর পক্ষে সে দলীলটিও জেনে নেয়া জরুরী শর্ত নয়। কেননা মুজতাহিদ নিজেই তার জন্যে দলীলের স্থলাভিষিক্ত। তা সত্ত্বেও মুজতাহিদ যখন লক্ষ্য করবেন যে, ইতিপূর্বে তিনি যে মত গ্রহণ করেছেন, অধিকতর চিন্তা-বিবেচনা ও ব্যাপক জ্ঞান-গবেষণার ফলে সে মতের বিপরীতটাই সত্য ও নির্ভুল রূপে প্রতীত, তখন তাঁর কর্তব্য হল তাঁর প্রথম ইজতিহাদের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়ে এই নবতর ইজতিহাদকে অনুসরণ করা এবং ফতোয়া প্রার্থীর কর্তব্য হল ফতোয়াদাতার ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর এই নতুন মতকে জানা মাত্রই অনুসরণ করতে শুরু করে দেয়া।

www.amarboi.org

মুজতাহিদ তাঁর কোন কোন ইজতিহাদী ফয়সালায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করতে পারেন, এ কথাকে একটা প্রকৃত সত্য কথা রূপে মানতে হবে। জমহুর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহর একটা হুকুম—একটা ফয়সালা অবশ্যই বর্তমান। কাজেই প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি মতই সত্য হতে পারে-একাধিক নয়। এখন যে লোক ইজতিহাদের মাধ্যমে সেই মূল কথাটি জানতে পারবেন, বুঝতে হবে, তিনি নির্ভুল ইজতিহাদ করেছেন আর তা না হয়ে থাকলে তিনি ভুল করেছেন। এর দলীল হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন কুরআন মজীদে উদ্ধৃত একটি ক্ষেত সংক্রান্ত মামলার বিচার-ফয়সালায় হযরত দায়ূদ (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ)-এর পারস্পরিক মত-বিরোধের কথা। এ পর্যায়ে কুরআনে হযরত সুলাইমানের নির্ভুল বুঝ-ক্ষমতা ও বিচারে নির্ভুলতা গ্রহণের সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন এবং এই গুণে তিনি গুণান্বিত বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর মতের-বিচার-ফয়সালার-বিপরীত যা, তা অ-যথার্থ, বেঠিক। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ * فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (الانبياء ٧٨-٧٩)

'তাদের বিচার কার্য আমরা লক্ষ্য করছিলাম। তখন আমরা সঠিক নির্ভুল ফয়সালা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছি, অথচ বিচার-ক্ষমতা ও জ্ঞান আমরা উভয়কেই দান করেছিলাম।

অর্থাৎ দু'জনই আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'জনার ফয়সালা ও বিচারের রায় অভিন্ন হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত নির্ভুল রায় ও মত হযরত সুলাইমানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তা হলে সুলাইমানের বিচার-ফয়সালার বিপরীত যা ছিল, তা নিশ্চয়ই নির্ভুল ছিলনা।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

বিচার ফয়সালাকারী যখন ইজতিহাদের সাহায্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তার জন্যে থাকে দুটি শুভ প্রতিফল। আর সে যদি ভুলও করে, তবু সে একটি শুভ প্রতিফল অবশ্যই পাবে।

জমহুর বিশেষজ্ঞগণ একথাও বলেছেন যে, মুজতাহিদ যদি প্রাণপণে চেষ্টা চালায় এবং দলীল-প্রমাণ আলোচনা-পর্যালোচনা ও চিন্তা-গবেষণায় কোনরূপ ত্রুটি না রেখে থাকে, তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

খুঁটিনাটি মাস্‌লায়ই নির্বিচার অনুসরণ ও তাক্বলীদ করতে হয়ঃ

ইজতিহাদ পর্যায়ে আরও কথা এই যে, ইজতিহাদের বিপরীত কথা হল 'ইত্তেবা' ও 'তাক্বলীদ' (اتباع وتقليد)। পূর্বেই বলেছি, মুক্বাল্লিদের জন্যে ইজতিহাদই হল শরীয়াতের উৎস। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে গণ্য তাক্বলীদের সংজ্ঞা হলঃ

هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ اَحَدِ الْمُجْتَهِدِيْنَ دُوْنَ بَحْثٍ عَنِ الدَّلِيْلِ مَادَامَ الْمُقَلِّدُ عَاجِزًا عَنِ الْاِجْتِهَادِ،

মুজতাহিদের মধ্যে যেকোন একজনের কথানুযায়ী আমল করা-মুজতাহিদের ইজতিহাদের দলীল সম্পর্কে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা করা ছাড়াই, যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্বাল্লিদ নিজে ইজতিহাদ করতে অক্ষম থাকবে।-এই হল তাক্বলীদ।

তাক্বলীদ কেবলমাত্র খুঁটিনাটি ব্যাপারে চলতে পারে, মৌলিক ও আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে তাক্বলীদ অচল, অবৈধ। কেননা আল্লাহ্, নবী-রাসূল, পরকালীন জীবন এবং অন্যান্য যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান গ্রহণ একান্তই কর্তব্য-ওয়াজিব, সেক্ষেত্রে তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। জম্হুর ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের এটাই চূড়ান্ত মত। খুঁটিনাটি মাসলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত মত এই যে, যারা নিজেরা ইজতিহাদ করতে অক্ষম, তাদের কর্তব্য হল মুজতাহিদদের মত মেনে নেয়া, তদনুযায়ী আমল করা এবং তাঁর কাছ থেকেই ফতোয়া গ্রহণ করা। বিশেষতঃ কুরআন মজীদও এই নির্দেশ দিয়েছে তাদের প্রতি যারা নিজেরা আল্লাহ্‌র বিধান জানেনা, জানতে পারেও না। বলা হয়েছেঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ* (النحل)

তোমরা নিজেরা যদি না-ই জান, তাহলে যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস কর।

আল্লাহ্‌র এ সুস্পষ্ট আদেশ অনুযায়ী যারা শরীয়াতের মাসলা জানেনা তাদের কর্তব্য হল যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা; জিজ্ঞেস করার পর যা-ই জানতে পারবে, তা মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা তার জন্যে ওয়াজিব। যে-লোক ইজতিহাদ করেন, যিনি মুজতাহিদ বলে পরিচিত, তার কাছেই ফতোয়া জিজ্ঞেস করা যেতে পারে-করা উচিত। যে-লোক মুজতাহিদ রূপে পরিচিত নয়, তবু

www.amarboi.org

ধারণা করা যায় যে, সে হয়ত-বা মুজতাহিদ হবে, এমন লোকের নিকটও ফতোয়া চাওয়া যেতে পারে। তবে তার সঙ্গে সে বিষয়ে বিতর্ক করা জরুরী নয়।

বিশেষ একটি শহরে যদি বহু সংখ্যক মুজতাহিদ একসঙ্গে বর্তমান থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ অ-শ্রেষ্ঠ হন, কেউ বেশী দক্ষ এবং কেউ হন অ-দক্ষ, তাহলে তাঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যাকে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু ও বেশী দ্বীনদার মনে হবে, ফতোয়া চাওয়ার জন্যে তাকেই বাছাই করা বাঞ্ছনীয়। কোন মুক্বাল্লিদ যদি একটা বিষয়ে একজন মুজতাহিদের নিকট থেকে ফতোয়া গ্রহণ করে এবং সেই বিষয়ে সে তার কথা মতই কাজ করে থাকে, তা হলে সেই বিষয়ে অপর মুজতাহিদের মত অনুযায়ী কাজ করা তার উচিত বা কর্তব্য নয়। অবশ্য অপর কোন বিষয়ে অপর একজন মুজতাহিদের মত গ্রহণ করা তার জন্যে কিছু মাত্র অবৈধ নয়। তবে তাও বৈধ কেবল তখন, যদি সে মুজতাহিদগণ পরস্পর পরস্পরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত না হন।

www.amarboi.org

মানব কল্যাণ ও ইসলামী শরীয়াত

ইসলামী শরীয়াতের যাবতীয় বিধি-বিধান বিশ্ব-মানবতার সাধারণ কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন রচয়িতাগণ এই সাধারণ কল্যাণকে আইনের অন্যতম উৎস রূপে গ্রহণ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মানব কল্যাণ একটা পরিবর্তনশীল ব্যাপার। তাই যেখানে কল্যাণের পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে আইনেও অনিবার্যভাবে সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই পরিবর্তিত আইন যদি কোন অকাট্য দলীল কিংবা ইজমা থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, তা হলে কল্যাণের পরিবর্তনের কারণে কি অবস্থা দেখা দেবে, সে বিষয়ে আইনবিদ্‌দের বিভিন্ন মত রয়েছে। আমরা এখানে এই পর্যায়ে বিশদ আলোচনা পেশ করছি।

ইসলামী শরীয়াতে 'কল্যাণ' (مصلحت) একটা বিশেষ পরিভাষা। শব্দটি দ্বারা বুঝায়ঃ

جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ فِيْ حُدُوْدِ الْمُحَافِظَةِ عَلٰى مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ ·

শরীয়াতের লক্ষ্য সংরক্ষণের সীমার মধ্যে থেকে ফায়দা ও উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ।

এই কাজ হতে পারে কেবলমাত্র সেখানে, যেখানে শরীয়াতকে বাস্তবায়িত করার জন্যে চেষ্টা-যত্ন নেয়া হবে। শরীয়াতের বিধান কার্যকর করার প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে থেকে মানব-কল্যাণ উপযোগী আইন প্রনয়ণ করা সম্ভব। কোন্ অবস্থায় শরীয়াতের কোন্ বিধান কতখানি কার্যকর করা মানব কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, তা অনুধাবন করা কেবল সেখানেই সম্ভবপর।

ফিকাহ্‌বিদগণ ইসলামী শরীয়াতের ব্যাপক ও গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। তাঁরা নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছেন, সাধারণভাবে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণই হচ্ছে শরীয়াতের চরম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই শরীয়াত বিরচিত। কুরআন মজীদেও শরীয়াতের এই লক্ষ্যের কথাই বিঘোষিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়াতের উপস্থাপক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

www.amarboi.org

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ (الانبياء: ١٠٧)

হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমরা রাসূলরূপে পাঠিয়েছি কেবলমাত্র বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার পরিণতি রূপেই তাঁর নবী-রাসূলগণকে, বিশেষ করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আয়াতের শব্দ 'রহমাত' (رحمة)-এর ভিত্তি হল جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ -কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতির প্রতিরোধ। আর তা একটি বিশাল ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রটি ততই বিস্তীর্ণ, যতটা বিস্তীর্ণ স্বয়ং মানুষের জীবন।

কুরআন মজীদে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদেরকে কোন কষ্ট বা দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করতে চান নি। তিনি তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে নির্দেশ দেননি; এমন কোন কাজের বিধান দেন নি, যা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। সূরা আল-মায়েদায় শরীয়াতের নানা বিধি-বিধানের উল্লেখ করার পর সে সবের মূলে নিহিত আল্লাহ্র মানব-কল্যাণ-উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ (المائده: ٦)

আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়াতের এসব বিধি-বিধান দিয়ে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চান নি; বরং তিনি চেয়েছেন তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিতে-যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পার।

এ আয়াতে মোটামুটি তিনটি কথা বলা হয়েছেঃ (১) মানুষকে কোন সংকীর্ণতা কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন না করা (২) মানুষকে পবিত্র করা এবং (৩) আল্লাহ্ নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে বান্দাহদেরকে দেয়া। আর এর সর্বশেষ লক্ষ্য হল, বান্দাহ যেন আল্লাহ্র এসব নিয়ামত পেয়ে যথাযথ শোকর আদায় করতে পারে।

বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়াত আমাদের জন্যে যেসব বিধি-বিধান চালু করেছে, সে গুলোর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এ সব বিধান পালনের দায়িত্ব মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়েছে। মানবতার কল্যাণ ও

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের প্রকৃত যে সম্পর্ক, তা রক্ষা করাই হল শরীয়াতের মূল লক্ষ্য। যেমন কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে এবং এ আদেশের কার্যকারণ বিশ্লেষণ পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিঃসন্দেহে নামায মানুষকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখে।

রোযা ফরয করে তার কারণ বলা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

যেন তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে পবিত্র জীবন যাপন করতে পার।

যাকাতও ইসলামের একটা মৌলিক বিধান। তাতে মানবতার কল্যাণ, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা কার্যকরকরণই হল মৌল উদ্দেশ্য। এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, মানবতার কল্যাণই হচ্ছে শরীয়াতের প্রধান লক্ষ্য। আর একারণেই যে সব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ কোন বিধান দেয়া হয়নি, সেখানে কিয়াস ও ইজতিহাদ করে শরীয়াতের বিধান নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এভাবেও শরীয়াতের সেই মৌল লক্ষ্য-মানবতার সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা হচ্ছে।

শরীয়াতের মৌল লক্ষ্য

শরীয়াতের দর্শন অবহিত মনীষীগণ বলেছেনঃ বিশ্বলোকে শরীয়াতের লক্ষ্য তিন প্রকারেরঃ

(১) 'জরুরী'। দ্বীন-ইসলামের ও বৈষয়িক জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এটি একান্তই অপরিহার্য। কেননা 'জরুরী জিনিস' রক্ষা করা না হলে দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না, বরং তখন সামগ্রিক বিপর্যয় সূচিত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেনঃ শরীয়াত প্রণয়নে জরুরী প্রয়োজনের সমষ্টি মোট পাঁচটিঃ

দ্বীনের হেফাযত, জান-প্রাণ রক্ষা, ধন-মাল রক্ষা, বংশ রক্ষা এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ রাখা।

(২) আবশ্যকীয়। ক্ষতির আশংকা দূরীকরণ ও বিশালতা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যেমন কোন কোন ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ

www.amarboi.org

কোন কারণের তাগিদে মাত্রা বা পরিমাণ হ্রাসকরণ, তীব্রতা-কঠোরতা হাল্কাকরণ।

(৩) সৌন্দর্য বিধান সংক্রান্ত'। উন্নত ও উত্তম চরিত্র গঠনে এটি প্রয়োজন। সুন্দর, নিঃখুত ও কল্যাণময় জীবন যাপন এর উপরই নির্ভরশীল। তাহারাত-পবিত্রা অর্জন, লজ্জাস্থান আবৃত রাখা, অলংকার ও শোভা বর্ধণ, বেহুদা খরচ বর্জন এবং কৃচ্ছ সাধন ও ব্যয় সংকোচন প্রত্যাহারকরণ।

ইসলামী শরীয়াতের মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। আর এর প্রত্যেকটিরই যৌক্তিকতা অনুধাবনীয়। মানুষের অনাবিল জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি শরীয়াতের বিধান জানবার আগেও যদি চিন্তা-বিবেচনা করে, তা হলে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে স্বতঃই জানতে ও বুঝতে পারে। এ কারণে অনেক আইন-দার্শনিক দাবি করেছেন যে, শরীয়াত অবতীর্ণ না হলেও মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির বলে এসবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারত। মুসলিম মনীষীদের অনেকে বুদ্ধিবাদের প্রশংসা করেছেন, অনেকে তার দোষ বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়াতের বিধানসমূহ এ ক'টি পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণেই রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় যখন আসল ও প্রকৃত বিধানদাতা আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই বিধান অবতীর্ণ হত, সেই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের সাহাবীগণ ও ইসলামের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন নি। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর মুহূর্তেই যখন তাঁর খিলাফতের সমস্যা দেখা দিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম একত্রিত হয়ে পরিস্থিতির মুকাবিলা করলেন এবং তাঁরা সম্মিলিতভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে খলীফা রূপে বাছাই করে তাঁর হাতে আনুগত্যের বয়'আত করলেন। এর পিছনে অন্যান্য দিক ছাড়াও এই দিকটিও বর্তমান ছিল যে, নবী করীম (স) নিজেই রোগসজ্জায় শায়িত থাকা অবস্থায় নামাযের ইমামতি করার জন্যে তাঁকেই মনোনীত করেছিলেন। আর নামায হচ্ছে দ্বীনী বিষয়াবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়াদির তুলনায় তা-ই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তখন খিলাফতের ইমামতী করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা তো নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হবে। ফিকাহ্‌র মৌলনীতির দৃষ্টিতে এটি কিয়াসের ব্যাপার হলেও আসলে এর মূলেও নিহিত ছিল সার্বিকভাবে সমস্ত মানবতার কল্যাণ সাধন।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে যখন বহু সংখ্যক 'হাফেযে কুরআন' শহীদ হয়ে গেলেন, তখন হযরত উমর ফারূক (রা)-

www.amarboi.org

এর পরামর্শক্রমে কুরআন মজীদ 'সংকলিত' করা হল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেনঃ

هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ

একাজ আল্লাহ্‌র শপথ বস্তুতঃই কল্যাণময়।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইসলামে 'কল্যাণ' প্রকৃতই এবং স্বতঃই কাম্য। যে বিষয়ে শরীয়াতের কোন দলীল উদ্ধৃত হয়নি, সেক্ষেত্রেও কল্যাণই কামনা করতে হবে। আর এই কল্যাণই হচ্ছে ইসলামী শরীয়াতের একটা অন্যতম উৎস-'মুসলিহাত'। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মূল গ্রন্থাবদ্ধ কুরআনের বহু অনুলিপি তৈরী করে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট স্বলিখিত ও সযত্ন রক্ষিত কুরআনের 'কপি'সমূহ জ্বালিয়ে দেয়ায়ও এই কল্যাণই নিহিত ও লক্ষীভূত ছিল। এই কারণে ইসলামী ফিকাহ্‌বিদ ইমামগণ এই কল্যাণকে শরীয়াত রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন।

শরীয়াতের মৌল নীতি কল্যাণের পরিপোষক

বস্তুতঃ 'কল্যাণ'কে শরীয়াতের অন্যতম মৌল উৎসরূপে গ্রহণ এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এটি এমন এক প্রদীপ্ত মশাল, যা ইসলামের রাজপথে চলার জন্যে বিশেষ সুবিধা বিধান করে দিয়েছে। এরই আলোকে ফিকাহ্‌বিদগণ ইজতিহাদের দুরূহ কাজ বিশেষ সুষ্ঠুতা সহকারে সুসম্পন্ন করেছেন এবং সর্বক্ষেত্রে শরীয়াতের মূল লক্ষ্য অনুপাতে আইন-বিধান রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক অজানা ব্যাপারই এ উপায়ে জানা হয়ে গেছে।

পূর্বে যেমন বলেছি, বহু আইন-বিধান এমন রয়েছে যার কারণও সঙ্গে সঙ্গেই এবং সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলে দেয়া হয়েছে অথবা বলে দেয়া হয়েছে ইশারা-ইঙ্গিতে। কুরআন ও সুন্নাতের প্রায় সর্বত্রই এ জিনিস বিধৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় জুয়া ও মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের আয়াতঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ (المائدہ: ٩٠)

হে ঈমানদার লোকেরা! নিশ্চয় জানবে, মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার উপায়াদি গ্রহণ শয়তানী কারসাজির মলিনতা। তোমরা সকলে

www.amarboi.org

এগুলো পরিহার কর। তা হলে আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

এ আয়াতে মদ্যপান ও জুয়া খেলা ইত্যাদিকে হারাম করা হয়েছে ও এসব সম্পূর্ণ বর্জন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এই হারাম ঘোষণার ও বর্জনের নির্দেশ দেয়ার মূলে কি কারণ নিহিত রয়েছে, তাও বলে দেয়া হয়েছে। আয়াত অনুযায়ী সে কারণ হল, তা অপবিত্র মলিনতা, তা নিতান্তই শয়তানী কাজ এবং তা প্রকৃত কল্যাণ লাভের পথের বিরাট অন্তরায়। এ কারণে তা পরিত্যাজ্য, নিষিদ্ধ ও হারাম।

সূরা আল-বাকারায় ইরশাদ হয়েছেঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ* (١٨٥)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সহজতা বিধান করতেই ইচ্ছুক, কঠোরতা ও অসুবিধা সৃষ্টি করতে তিনি চান না।

বিশেষ বিশেষ সময় কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন মজীদে। আয়াতটি এইঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ* .... وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ* (سورة النور: ٢٧-٢٨)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ কর না। যদি কর, তা হলে পূর্বেই ঘরের লোকদের সাথে পরিচয় কর ও তাদের প্রতি সালাম কর। এ নীতি তোমাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর। আশা করা যায়, তোমরা এ উপদেশ মেনে চলবে। ......যদি তোমাদের বলা হয় যে, তোমরা ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে। এ ফিরে যাওয়াই তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্রতা বিধানকারী ব্যবস্থা। তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ খুব বেশী অবহিত।

www.amarboi.org

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করা সংক্রান্ত বিধান দিয়ে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের কথাও বলে দিয়েছেন। বলেছেনঃ এ বিধান তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্রতা বিধানকারী এবং তোমাদের দিলের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাকারী।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ সময়ে অল্প বয়সী লোক ও খাদেম-সেবকদের জন্যে অন্যদের ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। সে ঘোষণা হলঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ*

(النور: ٥٨)

তোমাদের ও তাদের উপর কোন দোষ নেই এই সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে ঘরে প্রবেশ করায়। কেননা তোমরা তো পরস্পরের ঘরে এমনিভাবে আসা-যাওয়া করই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শন-সমুহ স্পষ্ট করে বলেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ।

বস্তুতঃ এ বিধানও সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষেই এবং তাদের জীবন যাত্রায় সহজতা বিধানের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ইয়াতীমের মাল বেকার বসিয়ে না রেখে তা দিয়ে ব্যবসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার কারণ স্বরূপ বলেছেন, তা না করা হলে যাকাত দিতে দিতে ইয়াতীমের মূলধনই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাসূলে করীম (স) তাঁর একজন সাহাবীকে বিপুল পরিমাণ ধনমাল দান করে নিঃস্ব হয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধের কারণ বর্ণনা করে তিনি নিজেই বলেছেনঃ

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً

তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল করে রেখে যেতে পার, তবে তা উত্তম এ অবস্থা থেকে যে তুমি তাদের নিঃস্ব ফকীর বানিয়ে রেখে যাবে।

এ ক'টি দৃষ্টান্ত থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাতে উদ্ধৃত প্রতিটি আইন ও বিধানের মূলে কোন-না কোন কারণ ও যুক্তি নিহিত

www.amarboi.org

রয়েছে। কারণ ও যুক্তি ছাড়া কোন আইন শরীয়াতে দেয়া হয়নি। আর সে সব কারণ মূলতঃ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলে করীম (স)-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও ফিকাহ্‌র ইমামগণ ফিকাহ্‌ রচনায় এই জন-কল্যাণকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শরীয়াতের খুঁটিনাটি বিধি-ব্যবস্থা তৈরী করেছেন।

ইসলামী শরীয়াতের এই যৌক্তিক ভিত্তিশীলতাকে সামনে রেখেই মুসলিম মিল্লাতের বিশিষ্ট আলেমগণ বলেছেনঃ

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ

শরীয়াতের প্রতিটি হুকুমই কারণ ও যুক্তির উপর ভিত্তিশীল।

এই কারণ ও যুক্তি দ্বিবিধ হতে পারে। হয় জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা কোন অকল্যাণ ও বিপর্যয় থেকে লোকদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে কিংবা কোন জিনিসকে মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে; অর্থাৎ তা করতে নিষেধও নেই, করার আদেশও নেই। এ থেকে অনেকে মনে করেছেন, শরীয়াতের সব হুকুম-আহকামেই এ কথা নিহিত রয়েছে এবং শরীয়াতের অকাট্য দলীল থাকলেও সবকিছু থেকে এই সার্বিক ও সাধারণ জন-কল্যাণই প্রার্থিত। এসব লোক এতদূর বলেছেন যে, প্রকৃত কল্যাণের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেলে শরীয়াতের হুকুমও তার অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে। তাতে শরীয়াতের স্পষ্ট দলীলের বিরুদ্ধতা হলেও কোন দোষ হবে না, সে বিরুদ্ধতাও জায়েয বলেই গণ্য হবে। শরীয়াত প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ী এ ধরনের হস্তক্ষেপ করেছেন বলে তাঁরা মনে করেছেন এবং তাকেই তাঁদের এমতের দলীল বা প্রমাণ রূপে পেশ করেছেন। এরা বলেছেন, শরীয়াতের অকাট্য দলীল যে গুণটির উপর ভিত্তিশীল হত, তা বদলে গেলে সাহাবীরা শরীয়াতের হুকুমটিও পরিবর্তন করে দিতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব-মন রক্ষার জন্যে যাদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হত, তাদের পর্যায়ে যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে তিনি এটাই করেছেন বলে তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে উদ্ধৃত বিধানটি এইঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ الخ (التوبة: ٦٠)

www.amarboi.org

সাদকা বা যাকাত হচ্ছে কেবলমাত্র ফকীর, মিস্‌কীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ও সে সব লোকের জন্যে, যাদের দিল রক্ষা করতে হবে....

কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত এ ফকীর, মিস্‌কীন ও যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও সেসব লোকও যাকাতের অংশ পেতে পারে যাদের দিল রক্ষা করা জরুরী বোধ হবে এবং যাদের অনিষ্ট ও দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এই অর্থ দিলে। বাহ্যতঃ এটা কুরআনের স্থায়ী ঘোষণা এবং কোনক্রমেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফত আমলে এই শ্রেণীর লোকদের জন্যে যাকাত ব্যয় করা বন্ধ করে দেন। এ দেখে কিছু লোক মনে করেছে যে, হযরত উমর (রা) কুরআনের স্পষ্ট-অকাট্য ঘোষণার বিরুদ্ধতা করেছেন।

কিন্তু এইরূপ ধারণা মূলতঃই ভুল। আসলে হযরত উমর (রা) কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার বিরুদ্ধতাও করেন নি, কুরআনের জারী করা কোন বিধি অকেজো করেও রাখেন নি। বস্তুতঃ কুরআনের এই বিধানটি ছিল বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে অবস্থা যখন বর্তমান থাকল না, তখন এ বিধানটা চালু থাকার কোন কারণও অবশিষ্ট রইল না। যেহেতু কারো কারো মন রক্ষার প্রয়োজন হতে পারে ইসলাম যখন তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, তাদের অনিষ্ট ও দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় না থাকে। কিন্তু উত্তরকালে ইসলাম যখন স্বতঃই শক্তিশালী ও বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল, কারো প্রতি মুখাপেক্ষীতাও থাকল না, তখন আর মন রক্ষার প্রয়োজন থাকল না এবং তাদের যাকাত দেয়ার প্রয়োজনও রইল না। তা হলে এর অর্থ দাঁড়াল, শরীয়াতের হুকুম এখানে বিশেষ একটা অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আর সে অবস্থা হল تَالِيْفُ الْقَلْبِ মন রক্ষার প্রয়োজন। বস্তুতঃ এ অতীব সূক্ষ্ম ফিকাহতত্ত্ব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বিশেষ ও নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তিদের উল্লেখ করেন নি। তিনি একটা গুণের-একটা বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করেছেন। কাজেই সেই গুণ বা বিশেষ অবস্থাটি যখন পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তখন তার ভিত্তিতে দেয়া শরীয়াতের হুকুমও যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে অতীব স্বাভাবিকভাবে, এ আর বিচিত্র কি? কাজেই বলতে হবে, হযরত উমর (রা) কুরআনের স্পষ্ট-অকাট্য বিধিকে অকেজো করে দেন নি। শরীয়াতের প্রতিটি হুকুম যে একটা কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট আর সে কারণটাই হচ্ছে উপযুক্ত যৌক্তিকতা ও নির্ভরযোগ্য কল্যাণ, তিনি শুধু এই তত্ত্বই উদ্‌ঘাটিত করেছেন মাত্র। এখানে তিনি শরীয়াতের ব্যাখ্যাদাতা মাত্র। আর তাঁর এই ব্যাখ্যা বা নীতিকে সাহাবায়ে কিরাম সমর্থন করেছেন। এখানে শরীয়াতের মুসলিহাত-জনকল্যাণ-ভিত্তিক হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

www.amarboi.org

জনকল্যাণ-নীতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মত

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে সম্ভবতঃ একথা অতীব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শরীয়াতের বিধান রচনার ব্যাপারে ইসলামের প্রাণশক্তি হচ্ছে এমন সূক্ষ্ম বিবেক-বুদ্ধির পরিপূর্ণ প্রয়োগ, যাতে সাধারণ জন-মানবের সামষ্টিক কল্যাণকে পুরাপুরি রক্ষা করা হয়েছে। আর তার মুলনীতি হলঃ 'যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর, তার বিধান করা এবং যা মানুষের জন্যে অকল্যাণকর, তার প্রতিরোধ করা'। শরীয়াতের মহান বিধানদাতা বিভিন্ন হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এ দিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। তিনি এমন সব কায়দা-কানুনও রচনা করেছন, যা থেকে এদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেক হুকুম-আহকামেই কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয় নি, তা অতি সাধারণভাবে বলা হয়েছে। বিশেষ করে মুয়ামিলাত-পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপার সংক্রান্ত হুকুম-আহ্‌কাম।

এতৎসত্ত্বেও ফিকাহ্ নীতিবিদ্‌গণ 'মুসলিহাত'কে নীতিগতভাবেই মেনে নিতে অমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, শরীয়াতের বিধান রচনায় এই 'মুস্‌লিহাত'কে কোনরূপ গুরুত্বই দেয়া হয়নি।

অনেকে মুস্‌লিহাত-সাধারণ জন-কল্যাণের দৃষ্টিতে শরীয়াতের বিধান রচনা করতেই প্রস্তুত নন। কেননা তা যদি করা হয়, তাহলে নিজের ইচ্ছে মত বিধান রচনা করে শরীয়াতের নামে চালানোর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। জাহেরী মাযহাব ও শীয়া মতের অনুসারীরাও 'মুসলিহাত'কে স্বীকার করেন না। জাহেরী মাযহাবের লোকেরা তো শরীয়াতের স্পষ্ট দলীলকেই নিজেদের মত বলে প্রকাশ করেন। তার বাইরে কোন কিছুতেই তাঁদের একবিন্দু আস্থা নেই। শীয়া মতের লোকেরা তো ইমামে মাসুমের উপরই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। ইমামে মাসুমের মতই তাঁদের জন্যে চূড়ান্ত ও সব কিছু।

রাফেজীরা 'মুসলিহাত'কে শরীয়াতের উৎস রূপে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এই দলীলের ভিত্তিতে যে, 'মুস্‌লিহাতে'র কথাটাই ভিত্তিহীন; এর সপক্ষে কোন দলীল নেই। অতএব তা ত্যাগ করাই কর্তব্য ও গ্রহণ করা অনুচিত। বিশেষ করে শরীয়াতের বিধানদাতার নিকট থেকেই যখন তা গৃহীত হয়নি, তখন ব্যাপারটি অনেক ব্যাপক ও বিশাল হয়ে উঠে এবং এর ফলে নিজের ইচ্ছামত আইন তৈরী করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

এদের জবাবে বলা যায়, মুসলিহাত যে শরীয়াতের একটা উৎস, এ সম্পর্কে শরীয়াতের দলীল আছে, যদিও তা কোন নির্দিষ্ট মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল নয়।

www.amarboi.org

প্রখ্যাত মনীষী নাজমুদ্দীন তুফী এ পর্যায়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার করা এবং অন্যের ক্ষতি করা-এ দুটির কোনটিই ইসলামের স্বীকৃত নয়।

এ হাদীস থেকে 'মুসলিহাত'ই প্রমাণিত হয় এবং এর ভিত্তিতে বলা যায়, যে-কাজেই কারো ক্ষতি হওয়ার আশংকা কিংবা একজনের যে কাজে অন্যজনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে তার কোনটিই জায়েয নয়। কেননা ক্ষতি যখন বন্ধ করতে বলা হয়েছে, তখন যে-কাজে উপকার বা কল্যাণ হয়, তা-ই করা যেতে পারে। তবে কেউ কেউ এক্ষেত্রে বলেছেন যে, যেখানে শরীয়াতের স্পষ্ট-অকাট্য দলীল রয়েছে, সেখানে 'মুসলিহাতে'র কোন স্থান নেই। শরীয়াতের বিপরীত হলেও 'মুসলিহাত'কে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। অবশ্য শরীয়াতের সাধারণ হুকুমকে 'মুসলিহাতে'র বিবেচনায় 'বিশেষ'ভাবে নির্দিষ্ট করা বা কুরআন ও সুন্নাতের বিধানে কল্যাণের সন্ধান করা ও তার আলোকে তার ব্যাখ্যা দেয়া সব সময়ই জায়েয। বস্তুতঃ ইবাদাত হচ্ছে শরীয়াতদাতার হক্ব-পাওনা, অধিকার। কাজেই সে ইবাদাত কি এবং কি নয়, তা কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই জানা যেতে পারে।

দ্বীন-ইসলামে মুসলিহাতের যে গুরুত্ব রয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু শরীয়াতের স্পষ্ট দলীলের উপর তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তার বিপরীত ও বিরোধী হলেও তাকে গ্রহণ করতে হবে, এমন কথা আমরা স্বীকার করি না। এ পর্যায়ে এ-ই হচ্ছে মধ্যম নীতি-মধ্যম পন্থা।

মধ্যম পন্থার ব্যাখ্যা

মধ্যম পন্থা হিসেবে বলা যায়, 'মুসলিহাত'কে গ্রহণ করতে হবে, তার উপর আস্থা ও নির্ভরতা করাও চলবে-যতক্ষণ তা শরীয়াতের স্পষ্ট-অকাট্য কোন দলীল ও ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। যদি সাংঘর্ষিক হয়,তা হলে তা মেনে নেয়া যাবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ এই মত প্রকাশ করেছেন।

এই মতের সমর্থনে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলোও অকাট্য, অনস্বীকার্যঃ

(১) কুরআন মজীদে যে-সব বিধান দেয়া হয়েছে, তার বহু সংখ্যক ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে তার মূলে নিহিত 'মুসলিহাত'কেও বলে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে

www.amarboi.org

আমরা তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। অনেকগুলো আয়াতেই এমন সব সাধারণ (General) নিয়ম বলা হয়েছে, যাতে এই মুসলিহাতের কথা রয়েছে এবং তাঁতে তার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যেমন আদ্‌ল ও ইহ্‌সান করার ও নিকটাত্মীয়কে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে আর নির্লজ্জতা, পাপাচার, অন্যায় কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(২) সুন্নাতে নববীঃ তাতে শরীয়াতের নির্ণায়ক কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে নানা রকমের মূলনীতিও দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

না নিজের ক্ষতি স্বীকার, না অন্যের ক্ষতি করা

اَحَبُّ عِبَادَ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِهٖ -

আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে যে লোক তাঁর বান্দাহদের জন্যে অধিক কল্যাণকারী, আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই অধিক প্রিয়।

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَفْرُغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ الْمُسْتَقِىْ -

প্রভৃতি হাদীসসমূহ শরীয়াতে 'মুসলিহাতে'র গুরুত্ব স্বীকৃতির স্পষ্ট-অকাট্য প্রমাণ। নবী করীম (স) যে কাজ লোকদের জন্যে কষ্টকর হবে বলে আশংকা বোধ করেছেন, সে কাজ তিনি চালু করেন নি; এরকমের কোন কাজের বিধান শরীয়াতেও জারী করেন নি। যেমন তিনি নিজেই বলেছেনঃ

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَ مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ،

আমার উম্মাতের পক্ষে কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি আমি বোধ না করতাম, তাহলে আমি মিসওয়াক করার জন্যে তাদের আদেশ দিতাম।

অর্থাৎ কষ্টকর হবে এই মনে করে তিনি আদেশ দেননি। কষ্টকর হবে না মনে করলে তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দিতেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর উম্মাতের কল্যাণ চান, অকল্যাণ নয়। কাজেই তাঁর দেয়া শরীয়াতের বিধানে যে 'মুসলিহাত'-'কল্যাণ' নিহিত, তাতে আর সন্দেহ কি? সাহাবায়ে কিরাম অনেক সময় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট রুখসুত (সুবিধা) চাইতেন। নবী করীম (স) অহী মুতাবিক শরীয়াতের ব্যাপারে তাঁদের সেই রুখসুত দিতেন। এর মূলেও সেই কল্যাণ বোধ

www.amarboi.org

বা কল্যাণ কামনাই নিহিত রয়েছে। এ থেকে শরীয়াতের মূল্য লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং বলা যায়, আল্লাহর প্রতিটি হুকুম-শরীয়াতের প্রতিটি বিধান ও ব্যবস্থাই 'মুসলিহাত' ও কল্যাণ-ভিত্তিক, তার মূলে সার্বিক কল্যাণই নিহিত।

(৩) 'ইজমা'-মুসলিহাতের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়ার নীতিতে সাহাবীগণ সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। কোন কোন সময় তাঁরা শরীয়াতী দলীলের বাহ্যিক (জাহেরী) হুকুমের বিপরীত মতও প্রকাশ করতেন। পূর্বে এ বিষয়ে বলা হয়েছে।

(৪) বিবেক-বুদ্ধিঃ মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়াতের বিধান রচনায় নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের সাধারণ কল্যাণকে সামনে রেখে থাকবেন। কেননা তিনিই তাঁদের সৃষ্টি করেছেন, গোটা বিশ্বলোককে তাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এর মূলে বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ্র যে দয়া ও রহমাত নিহিত ছিল, এক্ষেত্রেও সেই রহমাত নিহিত না থাকাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা শরীয়াত তো তাদেরই সৌভাগ্য রচনার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ কল্যাণ-দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়ে থাকলে আল্লাহ্র অনেক বিধানই বান্দাহ কর্তৃক অ-কৃত হয়ে থেকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কেননা বিধান রচনায় কল্যাণ দৃষ্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় তা মানুষের সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি ও নির্ভুল যৌক্তিকতারই বিরুদ্ধতা হয়ে যায়। আল্লাহ্র শরীয়াত সম্পর্কে একথা চিন্তাই করা যায় না।

'মুসলিহাতে'র ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর নীতিঃ

ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে বলা হয, তিনি 'মুসলিহাত'কে শরীয়াতের অন্যতম উৎস রূপে মেনে নেননি। তিনি এক্ষেত্রে 'ইস্তিহ্সানে'র কথা অবশ্য বলেছেন। এ সম্পর্কে বলা যায়, তিনি সেই 'মুসলিহাত'কে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন বটে, যা শরীয়াতদাতা কর্তৃক সমর্থিত নয়, যা মানুষকে খামখেয়ালী ও যথেচ্ছভাবে-নিতান্তই ইচ্ছেমত -শরীয়াতের বিধান রচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু যে মুসলিহাত শরীয়াতের সীমার মধ্যে রক্ষিত এবং যা শরীয়াতের বিধি-বিধান মুতাবিক, তার বিপরীত কিছু মাত্র নয়, প্রকৃতপক্ষে তেমন মুসলিহাতকে তিনি কখনই অস্বীকার করতে পারেনও নি।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদ্ ইজ্জুদ্দীন আবদুস সালাম (র) বলেছেনঃ

إِنَّ مِنْ تَتَبُّعَ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِيْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ.

www.amarboi.org

حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذٰلِكَ اِعْتِقَادٌ اَوْ عِرْفَانٌ بِاَنَّ هٰذِهِ الْمُصْلِحَةَ لَا يَجُوزُ اِهْمَالُهَا وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُفْسِدَةَ لَا يَجُوزُ قُرْبَانُهَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اِجْمَاعٌ وَلَا نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌّ فَاِنَّ فَهْمَ نَفْسِ الشَّرْعِ يُوجِبُ ذٰلِكَ -

কল্যাণ হাসিল করা ও বিপর্যয় বন্ধ করা পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াতে অনুসন্ধানের ফলে এই বিশ্বাস বা পরিচিত লাভ হয়েছে যে, এই মুসলিহাত-এই কল্যাণ-দৃষ্টি পরিত্যক্ত হওয়া জায়েয নয়। আর এই বিপর্যয়কে নিকটেও আসতে দেয়া জায়েয নয়-যদিও তাতে কোনো ইজমা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তার সমর্থনে পাওয়া যায় না কোন বিশেষ অকাট্য দলীল বা কিয়াস। শরীয়াত শুধু বুঝতে গেলেই এ জিনিসটি অপরিহার্য হয়ে উঠে।

এ কথা থেকে বোঝা গেল, 'শাফেয়ী মাযহাবে 'মুসলিহাত' স্বীকৃত হয়নি'-একথার অর্থ হল, যে 'মুসলিহাত' নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে খামখেয়ালী করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র সেই মুসলিহাত স্বীকৃত নয়। তবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যখন শরীয়াত আইন রচনার প্রশ্ন উঠবে, তখন 'মুসলিহাত'কে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলবে না। কেননা শাফেয়ী মাযহাবেও এমন সব খুঁটিনাটি মাসলা রয়েছে, যার সমর্থনে সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই-এই 'মুসলিহাত' ছাড়া।

মুসলিহাতের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার নীতি

ইমাম আবূ হানীফা (র) 'মুসলিহাত' বিশ্বাস করেন না, এরূপ একটা বলা হয়। তারও অর্থ এই যে, যে- 'মুসলিহাত' শরীয়াতের পরিপন্থী, কেবল তা-ই তিনি গ্রহণ বা বিশ্বাস করেন না। নতুবা তাঁর মাযহাবেরও বিপুল সংখ্যক মাস্‌লা এমন রয়েছে যার মূল উৎস মুসলিহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ইমাম মুহাম্মাদ হাসান দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اَحْكَامَ الْمُعَامِلَاتِ تَدُورُ مَعَ الْمُصْلِحَةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

পারস্পরিক লেন-দেন ও কাজ-কর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম-আহকাম তার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় দিক দিয়েই মুসলিহাতের সঙ্গে অবর্তিত হয়।

এরই ফলে বাজার থেকে দূরে এগিয়ে গিয়ে আগে-ভাগে বাজারগামী পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যদি এ কাজ সাধারণ জন-মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর

www.amarboi.org

হয়। কিন্তু পণ্য-দ্রব্য বাজারেই যদি প্রচুর আমদানী হয়, তাহলে তা করা মুবাহ হবে-যদি তা জন-সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। হানাফী মাযহাবে গৃহীত এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসলা। এ মাসলার মূলেও যে সেই সাধরণ জন-কল্যাণদৃষ্টি নিহিত, তা স্পষ্ট।

এই পর্যায়ে আরও একটা কথা উল্লেখ্য। ফিকাহ্‌র মাসলা-মাসায়েলে ফিকাহ্‌বিদ্‌দের যে পারস্পরিক মত-বিরোধ দেয়া যায়, তার মূলেও এই জন-কল্যাণ-দৃষ্টিই নিহিত। কেননা হুকুম বা শরীয়াতের ফয়সালা তো এই জনকল্যাণ-দৃষ্টির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তাতে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেছেন। স্থান ও কালের পার্থক্যে সে দৃষ্টান্তেও পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। কালের পরিবর্তনে ইমামদের ইজতিহাদেও পরিবর্তন ও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বলতে গেলে এর ফলেই ইসলামী শরীয়াত স্থবির, অচলায়তন ও বন্ধ্যা হয়ে থাকেনি। তা হয়েছে এক সদা চলমান ও নিত্য প্রবাহমান উৎস। তাই ইসলাম সর্বকালে ও সর্বদেশেই এক কর্মোপযোগী জীবন বিধান। এই কারণে ফিকাহ্ নীতি-বিশারদ ক্বিরাফী বলেছেনঃ

إِنَّ الْقَوْلَ بِالْمُصْلِحَةِ عَامٌّ فِيْ جَمِيْعِ الْمَذَاهِبِ

'মুসলিহাত ফিকাহ্‌বিদদের প্রত্যেক মাযহাবেই স্বীকৃত, কোন বিশেষ মাযহাবে নয়।'

'মুসলিহাত' বদলে যাওয়ার কারণে হুকুম বদলে যাওয়া

ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে হুকুম-আহকাম দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে রয়েছে সে সব আহকাম, যাকে বলা হয় تَعَبُّدِى -আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বন্দেগীমূলক। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সে সব আহকাম, যা এই প্রত্যক্ষ বন্দেগী পর্যায়ে পড়েনা, যা অ-প্রত্যক্ষ বন্দেগীমূলক, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ, সুনির্দিষ্ট আকার সম্পন্ন নয়। প্রথম ভাগের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সমগ্র ফিকাহ্‌বিদের ঐকমত্যমূলক সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ

إِنَّهَا لَا تَقْبَلُ تَبْدِيْلًا وَلَا تَغَيُّرًا بِحَالٍ.

সেগুলো কোন অবস্থায়ই রদ-বদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন গ্রহণ করে না।

কেননা সেগুলো হল احكام توقيف. আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আগত সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের হুকুম। এমন কি, তাতে যৌক্তিকতার কথা বলা সত্ত্বেও তা কখনই পরিবর্তন গ্রহণ করে না। তা সর্বাবস্থায় ও সর্বকালেই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু

www.amarboi.org

সমাজের লোকদের পারস্পরিক লেন-দেন সংক্রান্ত যে সব হুকুম-আহকাম, তা প্রথমোক্ত হুকুম-আহকাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ হুকুম-আহকাম সর্বতোভাবে মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণ-দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল। এ পর্যায়ের হুকুম-আহকাম ও আইন-বিধানসমূহ অতীব বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহারিক দিক দিয়েও তার অনেক অর্থ হতে পারে। এ কারণেই এ পর্যায়ের বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাতে মোটামুটি ও সাধারণ (General) প্রকৃতিসহ এসেছে। সেগুলোকে বলা হয় قاعدة كلية 'সামগ্রিক ধরনের মৌল বিধি।' ফলে তা সাধারণ জন-কল্যাণের অধীন এবং তারই সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই কারণে কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ মত প্রকাশ করেছেন, এ পর্যায়ের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান পরিবর্তন করা জায়েয, যদিও তার বিপরীত অকাট্য দলীল পাওয়া যাবে-পাওয়া যাবে এমন ইজমা যা বাহ্যতঃ তার পরিপন্থী। তার কারণ এই যে, এ পর্যায়ের মূল হুকুম অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় দিক দিয়ে কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে আবর্তিত হয়। ফলে ঐ ফিকাহ্‌বিদগণ কোন কোন বিষয়ে এমন ফতোয়া দিয়েছেন, যা শরীয়াতের দলীল ও বক্তব্যের পরিপন্থী। তবে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ কেবলমাত্র সেসব ব্যাপারেই এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে প্রস্তুত, যাতে কোন অকাট্য দলীল (نص) বা বিশুদ্ধ ইজমা অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু যে বিষয়ে শরীয়াতের অকাট্য দলীল এসেছে বা কোন বিশুদ্ধ ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে অবস্থার পরিবর্তনে হুকুম-আহকামের পরিবর্তনকে মেনে নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। আমরাও মোটামুটি এই মতকেই সমর্থন করি। কেননা এর বিপরীত যে মত-যে মতে সর্বপ্রকার আইন-বিধানেই পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নেয়া হয়েছে-তাতে আল্লাহ্‌র শরীয়াত নিয়ে হাসি-তামাসা কিংবা চরম খামখেয়ালী প্রদর্শনের খুব বেশী আশংকা রয়েছে। স্বার্থপর ও উদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তির এর সুযোগ নিয়ে নিজের ইচ্ছামত আইন-বিধান রচনা করে শরীয়াতের নামে চালানোর চেষ্টা করতে পারে।

তবে যে-সব আইন-বিধানের সাথে সাধারণ অবস্থা জড়িত তা জনকল্যাণের দৃষ্টিতে পরিবর্তন করার মতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই বলিষ্ঠ। যে-সব ফিকাহ্‌বিদ মনীষী ইসলামী শরীয়াতের মৌল ভাবধারা সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত, তাঁরাই এর সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা ইব্‌নুল কাইয়্যেম বলেছেনঃ

إِنَّ تَغَيُّرَ الْفَتْوٰى بِحَسْبِ الْاَمْكِنَةِ وَالْاَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ
مَعْنِيٌّ عَظِيمُ النَّفْعِ جِدًّا وَقَعَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِهِ غَلَطٌ عَظِيمٌ عَلَى

www.amarboi.org

الشَّرِيعَةِ أَوْجَبَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا يَعْقِلُ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ'

স্থান, পারিপার্শিক অবস্থা, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ঘটনার আবর্তন-বিবর্তন অনুযায়ী ফতোয়া পরিবর্তন হওয়ার মূলে একটা বিরাট ও বিপুল কল্যাণকর তাৎপর্য রয়েছে। একথা না-জানা থাকার কারণে বিরাট ভুল-ভ্রান্তি সাধিত হয়ে গেছে। শরীয়াত পালনকে বিরাট অসুবিধাজনক ও কষ্টসাধ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ শরীয়াত যে মানুষের উপর কোন অসুবিধা ও কষ্টসাধ্যতা চাপিয়ে দেয় না, তা জানাই হয়নি।

এই উক্তিটি আমাদের পূর্বোক্ত মত সমর্থন করছে। আমাদের কথা হল, সাধারণ জন-কল্যাণমূলক আইন-বিধান কল্যাণকরতার রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে জনগণের সাধারণ অবস্থা ও তাদের কল্যাণকরতা এবং আইন-বিধান যেন পরস্পর সঙ্গতিহীন-পরস্পর বিপরীত না হয়। কেননা এই রূপ সঙ্গতিহীনতা ও পরস্পর বৈপরিত্য ইসলামী আদর্শ সম্পর্কিত ধারণার সাথেও সঙ্গতিশীল নয় -নয় সামঞ্জস্যশীল। দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে এই ধারণা শাশ্বত ও চিরন্তন যে, ইসলামী শরীয়াত সকল দেশ ও সর্ব কালের সাথে সঙ্গতিশীল। কোন দেশ বা কোন কালে সাথেই তা সামঞ্জস্যহীন নয়। কালের বিবর্তন যতই হোক, যে কোন দেশই হোক, সেই কালে ও সেই দেশেই ইসলামী শরীয়াত প্রয়োগযোগ্য। তাই শরীয়াত মানুষের বাস্তব অবস্থার ও কল্যাণের সাথে সঙ্গতি রেখেই চলবে, যতক্ষণ তা শরীয়াতের মৌল ভাবধারার পরিপন্থী হয়ে না যাবে। শরীয়াত-বিশারদ ফকীহ্ ও ইমামগণ সর্বসম্মতভাবেই এই কথা ঘোষণা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্যে যে, শরীয়াতের মৌল উদ্দেশ্যেই হলঃ

الْيُسْرُ عَلَى النَّاسِ وَرَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُمْ.

জনগণের জীবনে সহজতা বিধান-জীবন যাত্রা সহজীকরণ এবং তাদের সব অসুবিধা দুরীভূতকরণ।'

কিন্তু এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল তখন, যখন শরীয়াত সম্পর্কিত কথার বহু সংখ্যক তাৎপর্যের মধ্যে কোন একটি তাৎপর্যের উপর তা ভিত্তিশীল হবে। পরে সে তাৎপর্য বদলে যাবে এবং এমন এক নতুন তাৎপর্য উদ্ভূত হবে, যা পূর্ববর্তী হুকুমের বিপরীত হুকুম দাবি করবে। অন্য কথায় পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত বিধানের ব্যবস্থা করবে। বস্তুতঃ শরীয়াতের পূর্বোদ্ধৃত উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এরূপ হলেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

হানাফী ফকীহ জায়লায়ী (زيلعى) বলখের ফিকাহ্‌বিদদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

إِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ

কালের-যুগের পরিবর্তনে শরীয়াতের বিধানেও পরিবর্তন সূচিত হবে অবশ্যাম্ভাবী রূপে।

মালিকী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদ আল-ক্বিরাফী বলেছেনঃ

إِنَّ الْجُمُودَ عَلَى الْمَنْقُولَاتِ أَبَدًا إِضْلَالٌ فِي الدِّيْنِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالسَّلَفِ.

শরীয়াত রূপে বর্ণিত কথার উপর স্থবিরতা, জড়ত্ব ও বন্ধাত্ব এবং চিরস্থায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হলে দ্বীন-ইসলামের প্রতি লোকদের বিভ্রান্ত করে তোলা হবে। আর তা হবে মুসলিম জনগণ ও আগের কালের লোকদের জীবন-উদ্দেশ্যের প্রতি চরম অজ্ঞতামূলক আচরণ ও ভূমিকা।

এই পর্যায়ে বড় নিদর্শন হল, শরীয়াত প্রদাতা আল্লাহ্ তা'আলা যে সময় থেকেই কুরআন মজীদ নাজিল করতে শুরু করেছেন, সেই সময় থেকেই তিনি কোন কোন হুকুম মনসুখ করে নতুন হুকুম জারী করার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। উপরন্তু তিনি জনগণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সহজতর এবং তুলনামূলকভাবে কম কষ্টসাধ্য বিধান দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। অনুরূপভাবে মানুষের মন ও মানসের পরিশুদ্ধতা বিধান ও নৈতিক চরিত্র বিনষ্টকারী ভাবধারা দূরীভূতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবশতঃই অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বিধানও দেয়া হয়েছে কখনও কখনও। আল্লাহ্ তা'আলার আইন-বিধান প্রদানের এই রূপ নীতি অবলম্বনে দুনিয়ার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারী লোকদের জন্যে বিরাট ও তাৎপর্যপূর্ণ পথ-নির্দেশ বিদ্যমান। সমাজকে একটি আদর্শিক মান অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্যে হিকমাতের সাথে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে কর্তব্য-এরূপ করা যে সম্পূর্ণ জায়েয, তা এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। জনগণের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশোধনের উদ্দেশ্যে কঠিনতর বিধান প্রয়োগ শরীয়াত দাতারই শিক্ষা।

www.amarboi.org

নবী করীম (স)-এর সুন্নাত থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ফিকাহ্‌বিদদের মনেও একথা দৃঢ় হয়ে থাকা আবশ্যক যে, কোন ইজতিহাদী মতই জনগণের উপর এমনভাবে চেপে বসা উচিত নয়, যা কোনরূপ রদ-বদল বা হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রহণ করে না। হযরত আলী (রা) রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا بَعَثْتَنِىْ فِىْ شَىْءٍ أَ اَكُوْنَ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ اَمِ الشَّاهِدِ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟

হে রাসূল! আপনি যখন আমাকে কোন বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তখন আমি কি ধাতুর উপর মুদ্রিত মুদ্রার ন্যায় হব?

অর্থাৎ আমি কি তখন এক নিষ্প্রাণ হাতিয়ারের ন্যায় কাজ করব? (জনকল্যাণের দৃষ্টিতে বা পরিস্থিতির তাগিদে ভিন্নতর কিছু করার আমার কোন ইখতিয়ারই তখন থাকবে না?) কিংবা আমি হব এমন প্রত্যক্ষদর্শী যে সে জিনিস দেখতে পায় যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখে না?

এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করলেনঃ

بَلِ الشَّاهِدِ يَرٰى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ (مسنداحمد)

না, তখন তুমি হবে এমন প্রত্যক্ষদর্শী যে এমন জিনিস দেখতে পায়, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় না।'

রাসূলে করীম (স)-এর এ জবাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জনগণের কল্যাণের প্রতি সদা দৃষ্টি জাগ্রত রাখা একটা অতিবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এমন কি অহী নাজিল হওয়া কালেও প্রয়োজন অনুপাতে আইনের রদ-বদল করে জনগণের প্রতি দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামী আইনের মূলেই নিহিত রয়েছে এই দয়া-সহানুভূতি ও সহজতা বিধান।

এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছে। প্রাথমিক যুগে শরীয়াতের বিধান ছিল, কারিগরকে কোন কিছু নির্মানার্থে কাঁচা মাল দেয়া হলে তা যদি হারিয়ে যেত, তাহলে তার নিকট থেকে তার ক্ষতিপূরণ নেয়া হত না। কেননা কারিগর এ ক্ষেত্রে 'আমানতদার' মাত্র। আর শরীয়াতের বিধান এই যে, আমানতদারের হাত থেকে আমানতী জিনিস বিনষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে (আমানতদারকে) বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু হযরত আলী (রা) উত্তরকালে ফিকাহ্‌র এই মত বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেন। তিনি

www.amarboi.org

রায় দেন যে, কারিগর যদি আমানতী জিনিসের বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তার নিজের ইচ্ছার দখল নেই এবং সে নিজে ঐ জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোনরূপ সীমালংঘন করেনি, এ কথার অকাট্য প্রমাণ ও সাক্ষ্য পেশ না করে, তাহলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে। এটা পূর্বতন বিধানের স্পষ্ট পরিবর্তন। কিন্তু তিনি এরূপ মত প্রকাশ করলেন কেন?... কোন্ যুক্তিতে? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন যে, লোকেরা আমানত সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করছে না; বরং এ ব্যাপারে যথেষ্ট অসতর্কতা অবলম্বন করছে ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। এর ফলে অনেক মাল-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে এবং তদ্দরুণ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, ক্ষোভ ও হিংসা-দ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠার উপক্রম হয়েছে। বস্তুতঃ লোকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায় ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববর্তী অবস্থা বদলে গেছে, অথচ কারিগরকে কোন জিনিস নষ্ট হওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার দরুণ দায়ী করা হত না। অবস্থার এই পরিবর্তনে জন-কল্যাণের দৃষ্টিতেই শরীয়াতের আইন ও হুকুমেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ হযরত আলী (রা) এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শরীয়াতের আসল বিধানে কোন পরিবর্তন আনেন নি। এক্ষেত্রে শরীয়াতের মূল ভিত্তি ছিল অবস্থার উপর; সেই অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ও সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থার উদ্ভব হওয়ার ফলে তিনি তদুপযোগী বিধানই প্রবর্তন করেছেন মাত্র।

মালিকের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া কোন উষ্ট্র পাওয়া গেলে সেটাকে যে লোক দেখতে পাবে সে সেটিকে ধরে রাখবে কিনা, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, যে-লোক সেটিকে ধরে রাখবে, সে সেটির ব্যাপারে বে-পরোয়া হয়ে যাবে। তাই সেটিকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সেটি যেন সে বেঁধে না রাখে; বরং ছেড়ে দেয়। সেটি নিজেই পানি ও ঘাষ খেয়ে বেড়াবে। এই আইনটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে এবং হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত এটাই ছিল শরীয়াতের বিধান। কিন্তু তাঁর খিলাফত আমলে দেখা গেল, সাধারণভাবে লোকদের চরিত্রের অবনতি ঘটছে এবং হারামের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে, তখন হযরত উসমান (রা) এ আইনটি বদলে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, মালিকের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া উষ্ট্রটিকে যে লোকই দেখতে পাবে, তার কর্তব্য হবে সেটিকে বেঁধে রাখা ও ন্যায্য মূল্যে সেটিকে বিক্রী করে ফেলা। মালিক তালাশ করে পাওয়া গেলে তাকে সে মূল্য দিয়ে দিবে। এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত উসমান (রা) শরীয়াতের মূল বিধানকে বদলে দেন নি, শরীয়াতের কোন স্পষ্ট-অকাট্য দলীলকে তিনি বদলেও দেননি কিংবা তার

www.amarboi.org

অবাধ্যতাও করেন নি; বরং তিনি শরীয়াতের হুকুমকে দলীলের মূল লক্ষ্যের উপর সংস্থাপিত করেছেন মাত্র। জনগণের সাধারণ চরিত্রে যে বিপর্যয় ও পতন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি যদি এ বিধানটিকে পূর্ববৎই চালু রাখতেন, তাহলে শরীয়াতের মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হয়ে যেত, শরীয়াতের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল দেখা দিত। কেননা এট সুস্পষ্ট যে, শরীয়াতের এ বিধানটি তদানীন্তন জনগণের সাধারণ অবস্থা ও নৈতিক চরিত্রকে লক্ষ্য করেই চালু করা হয়েছিল। উত্তরকালে সেই অবস্থার পরিবর্তনের কারণে হুকুমটিরও বদলে যাওয়া জরুরী ছিল।

অনুরূপভাবে সাহাবীগণ শরীয়াতের এ পর্যায়ের আইন-বিধানে যে সব রদ-বদল করেছেন, সে ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে দেখা যায়, হযরত উমর (রা)ও এই মুসলিহাতের বিচারে বহু আইনকে পরবর্তীকালে বদলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সে আইনটি যে দলীলের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল, তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এসব বিবেচনা করলে এ ব্যাপারে আর কোনই সন্দেহ থাকেনা যে, ইসলামী শরীয়াতে মুসলিহাতের একটা বিরাট গুরুত্ব রয়েছে; বাহ্যতঃ তাকে কোন কোন দলীলের বিরোধী মনে হলেও কার্যতঃ 'মুসলিহাত'কেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'-এর কথা পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজিত এলাকার জমি-ক্ষেত যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে না দেয়ার ব্যাপারটিও এ ধরনেরই একটা কাজ। মানুষের কাজ অনুপাতে শাস্তি দান ও এক সঙ্গে দেয়া তিন তালাককে কার্যকরকরণও এ রকমেরই কাজ। স্ত্রীলোকদের মসজিদে গমন প্রথম দিক দিয়ে শরীয়াতের দৃষ্টিতেই বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর আমলে তা-ও নিষেধ করে দেয়া হয় এই 'মুসলিহাতে'র দৃষ্টিতে। কেননা তখনকার পরিবর্তিত পরিবেশে মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দানের মূলে নিহিত উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছিল। তাই এ পরিবর্তন ছিল একান্তই অপরিহার্য।

শুধু সাহাবীগণই নন তাবেয়ীগণও এই পর্যায়ে বহু অবদান রেখেছেন। যেমন পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেয়া। রাসূলে করীম (স) তা করতে নিজে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং সাধারণভাবে নিষেধও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাবেয়ীগণ পণ্য-দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দেয়া জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এরূপ মত দেয়ার কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেছেনঃ

إِنَّ النَّاسَ قَدْ فَجَرُوا بِمَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْجَشَعِ

www.amarboi.org

জনগণের লোভ-লালসা বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ার কারণে মূল্য গ্রহণে সীমা-লংঘণ করে গেছে।

পণ্য-দ্রব্যের ইচ্ছেমত বাড়তি মূল্য গ্রহণের প্রবণতা সমাজে যখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তখন সাধারণ জন-মানুষের জীবন যে কতটা দুর্বিসহ ও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। উত্তরকালে ফিকাহ্‌বিদগণ এই অবস্থা দেখে ঘোষণা করলেনঃ 'দ্রব্যমূল্য সরকারীভাবে বেঁধে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয'। এ ব্যাপারে তাদের সামনে ছিল রাসূলে করীম (স)-এর এ হাদীসঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ক্ষতি স্বীকারও নয় ও ক্ষতি করাও নয়-ইসলামের নীতি।

এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। কেননা রাসূলে করীম (স)-এর এই সাধারণ নীতিমূলক হাদীস অনুযায়ী অর্থের ব্যাপক লুট-পাট বন্ধ করা ও মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেনঃ

إِنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّسْعِيْرِ لِعَدَمِ وُجُوْدِ مَا يَقْتَضِيْهِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مُقْتَضَى لَفَعَلَهُ،

নবী করীম (স) পণ্য মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতে নিষেধ করেছিলেন এই কারণে যে, তখন তা করার কোন কারণ বা যৌক্তিকতা ছিল না। যদি সে কারণটি তাঁর সময় বর্তমান থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতেন।

এমনিভাবে সন্তানদের পক্ষে তাদের পিতাদের, ভাইয়ের সাক্ষ্য ভাইয়ের জন্যে ও স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য অপর জনের জন্যে গ্রহণ না করার ফতোয়া তাঁরা দিয়েছেন। অথচ পূর্বে এ ধরনের সাক্ষ্যদান ও গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। উত্তরকালে এরূপ মত গ্রহণের কারণ হল, এই ধরনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে মিথ্যা কথা বলার ও সত্য গোপন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।। অতএব এরূপ নিকটাত্মীয়দের পক্ষে পরস্পরের সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহণ করা চলতে পারে না।

এঁদের পর এসেছেন মুজ্‌তাহিদগণ। তাঁরাও মুসলিহাতের প্রতি গুরুত্ব দানে পূর্ববর্তীদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক ফতোয়া দিয়েছেন যে, বনু হাশিম বংশধরদেরও যাকাত দেয়া জায়েয।

www.amarboi.org

তাঁদের বক্তব্য হল, শরীয়াতের যে দলীলটি তাদের প্রতি যাকাত হারাম করে দিয়েছে, সে দলীলটি সাধারণ ও শর্তহীন নয়; বরং তা বায়তুলমাল থেকে তাদের অংশ গ্রহণের শর্তের অধীন ছিল। অর্থাৎ বায়তুলমাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয ছিল না। কিন্তু উত্তরকালে এই শর্ত দূর হয়ে গেছে। যখন বায়তুলমাল ছাড়াও যাকাত আদায় করা হতে লাগল, তখন পূর্বের হারাম হুকুমটিও বাতিল হয়ে গেল। কেননা لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ হাদীস অনুযায়ী বনু হাশিমের বংশধরদের প্রতি আরোপিত নিষেধাজ্ঞা-যার ফলে তাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল-প্রত্যাহার করা হল। কিন্তু এ কাজে শরীয়াতের অকাট্য দলীল বাদ দিয়ে মুসলিহাতকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা কিন্তু নয়; বরং যে দলীলটির ভিত্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল, সেই দলীলটিরই নবতর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র।

এর পর আসে ফিকাহ্‌র ইমামগণের ছাত্র বা শাগরিদদের যুগ। এ শাগরিদরা এসে তাঁদের ইমামদের সম্পূর্ণ বিপরীত মত দিয়েছেন বহু সংখ্যক ব্যাপারে। আর তার কারণ ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেছেন, এটা হচ্ছে কাল ও যুগের বিবর্তনের পরিণতি, দলীল-প্রমাণের পরিণতি নয়। অর্থাৎ কালের পরিবর্তনে ও জন-চরিত্রের বিপর্যয়ের কারণে এ কাজটি করতে হয়েছে। এ সব কারণে দেখা যায়, এই ফিকাহ্‌বিদগণ একটা মূলনীতি রচনা করে নিয়েছেনঃ

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

কাল ও যুগের পরিবর্তনের কারণে শরীয়াতের হুকুম ও আইন পরিবর্তিত হওয়ার অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না।

ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, اَلْإِكْرَاهُ জোর ও বল প্রয়োগ করতে পারে কে? ইমাম আবূ হানীফা (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, জোর ও বল প্রয়োগ করে, ভয় ভীতি দেখিয়ে লোকদেরে কোন কিছু মানতে বাধ্য করতে পারে কেবলমাত্র শাসক; কেবলমাত্র তারই অধিকার আছে ধমক দিয়ে কোন আইন জারী করার। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ মত দিয়েছেন, জোর প্রয়োগ করে কাউকে কিছু মানতে বাধ্য করার অধিকার শাসক ছাড়াও অন্যদেরও আছে। কেননা জোর প্রয়োগ সংক্রান্ত মতের মৌল ভিত্তি হল, ব্যক্তির অন্য একজনের ভয়-ভীতি ও ধমকের অধীন হওয়া, তার করায়ত্ত হওয়া–যতক্ষণ পর্যন্ত সে লোক তার ভয়-ভীতির অধীন হয়ে আছে।

এর পর ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, এই মত-বিরোধের মূল কথা হল, ইমাম আবূ হানীফার আমলে শাসক-জননেতা ছাড়াও অন্য একজনের জবরদস্তি

www.amarboi.org

চালানোর ও বল প্রয়োগের অধিকার থাকলে দেশ ও সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হওয়ার খুব তীব্র আশংকা ছিল। কিন্তু শেষোক্ত ইমামদ্বয়ের সময়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাই একালের লোকেরা এই ইমামদ্বয়ের মত গ্রহণ করে। আর তারা এ মত-বিরোধের ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে, ইমাম আবূ হানীফার আমলে ভিন্নতর অবস্থা ছিল বলে তিনি সেরূপ মত দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সহযোগী ফিকাহ্‌বিদদ্বয়ের মধ্যে সাক্ষের عَادِل নিরপেক্ষ-বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার শর্ত আরোপের ক্ষেত্রেও মত-বিরোধ রয়েছে। সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে তার গ্রহণযোগ্যতা বা عَدَالَت একটা শর্ত বিশেষ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এ শর্তটি সাধারণভাবে ও সকল বিচার্য বিষয়েই আরোপ করেননি। তার কারণ, তিনি যে যুগ-সমাজের লোক ছিলেন, তখনকার দিনে নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের সাধারণ গুণ ও পরিচয়ে পর্যবসিত ছিল। তখন আলাদাভাবে এটিকে একটি শর্ত হিসেবে আরোপ করার প্রয়োজন বোধ হত না। 'সাক্ষী' হওয়াই যথেষ্ট ছিল। সেকালে কোন সাক্ষী পক্ষপাত-দুষ্ট ও অবিশ্বাস্য হতে পারে, তা কল্পনাও করা যেত না। এই কারণে তিনি কেবল 'হদ্দ' (حد) ও 'কিসাস' (قصاص)-এর ব্যাপারেই সাক্ষীর নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত আরোপ করেছেন, সাধারণভাবে সব ব্যাপারে নয়। তার কারণ, এই দুটি ক্ষেত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল সন্দেহ-সংশয়ের ব্যাপার। কিন্তু তাঁর সহযোগী ইমামদ্বয় ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ যে-কোন সাক্ষ্যের ব্যাপারেই এবং সাধারণভাবেই এই عَدَالَت বা عَادِل নিরপেক্ষ-বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তার কারণ এ দু'জনের সময়ে সমাজে ও লোক-চরিত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তা লক্ষ্য করে এঁরা দু'জনই সম্পূর্ণ একমত হয়ে বললেন, সাক্ষীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

এ দু'জনের পরে অবস্থার আরও পতন ঘটে। এ কালের ফিকাহ্‌বিদগণ লক্ষ্য করলেন, 'পূর্ণমাত্রার নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসযোগ্যতা' اَلْعَادِلَةُ الْكَامِلَةُ অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ। তাঁরা এ-ও দেখলেন, বিচারক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে শরীয়াতী মান অনুযায়ী নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি করলে কারো পক্ষেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে বিচার পাওয়া সম্ভবপর হবে না। তার ফলে বাদী-বিবাদী উভয়েই নিজ নিজ দাবি প্রমাণ করতে অক্ষম হবে এবং তাতে তাদের অধিকার বিনষ্ট হবে। এই কারণে শেষ দিকের ফিকাহ্‌বিদগণ ফতোয়া দিলেনঃ

بِقَبُوْلِ شَهَادَةِ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَل

www.amarboi.org

অপেক্ষাকৃতভাবে, যতটা নিরপেক্ষ-বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা-ই গ্রহণ করতে হবে।

তার অর্থ দাঁড়ায়, এঁরা اَلْعَدَالَةُ الْمُطْلَقَةُ নিরংকুশ বা সর্বোচ্চ মানের নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে ও তুলনা-মূলকভাবে অধিক নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসযোগ্যতার اَلْعَدَالَةُ النِّسْبِيَّةُ শর্তটিকে মেনে নিয়েছেন।

শেষ দিকের প্রখ্যাত হানাফী ফিকাহ্‌বিদ ইবনে আবেদীন বলেছেনঃ

اِنَّ الْاَحْكَامَ الْمُبْنِيَّةَ عَلَى الْعُرْفِ يَجْرِىْ فِيْهَا التَّغْيِيْرُ بِتَغَيُّرِ الْعُرْفِ،

সমাজের সাধারণ প্রচলনের ভিত্তিতে যে আইন তৈরী করা হয়, সেই প্রচলন বদলে যাওয়ার কারণে সে আইনও বদলে যাবে অনিবার্যভাবে।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ ইমাম আবূ হানীফার আমলে লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দান এবং এ ধরণের অন্যান্য দ্বীনী কাজে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিদেরকে সাধারণভাবেই অনেক কিছু দান করা হত। ফলে তাদেরকে এরপর আর কিছু দেয়ার প্রয়োজন হত না। এ কারণে লোকদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে কোন মজুরী দেয়াকে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকালে এই সব দান বা হাদীয়া-তোহফা যখন স্বতঃই বন্ধ হয়ে গেল, তখন-এই শেষ কালের ফিকাহ্‌বিদগণ-ফতোয়া দিলেনঃ 'নামাযের ইমামতী, জুম্‌য়ার খোতবা দান, কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষাদান এবং জন-সমাজে দ্বীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করণ ও দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে জরুরী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি দ্বীনী কাজকর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েয।

মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ইবনে হুবাইব দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়ার পর্যায়ে বলেছেন, প্রয়োজন দেখা দিলে বাজারের লোকদের নিকট থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জেনে নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষকে সেখানে উপস্থিত করে তাদের কথার সত্যতা যাচাই করে ক্রয়-বিক্রয় ও দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ক্রেতা সাধারণের মত নিয়ে এমনভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য, যার ফলে এদের কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিশারদ আল্লামা ইবনে কুদামাহ্ উদ্ধৃত করেছেন, সন্তানদের মধ্য থেকে কারো কারো অত্যধিক প্রয়োজন ও অনটন লক্ষ্য করে অথবা কারো অন্ধত্ব, অকর্মন্যতা, পংগুতা বা ইল্‌ম চর্চায় ব্যস্ততা দেখে পিতা বিশেষভাবে কিছু 'হেবা' করতে পারে। অথচ সন্তানদের প্রতি সমান আচরণ গ্রহণ ও পরস্পরে পার্থক্য সৃষ্টি করে কাউকে অধিক সম্পদ বা সম্পত্তি দিতে নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে গাভীর গর্ভ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ষাঁড় ভাড়ায় খাটানো জায়েয বলে তিনি ঘোষণা করেছেন; অথচ নবী করীম (স) এরূপ করতে নিষেধ করেছেনঃ এরূপ মত প্রকাশের কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেনঃ

لِاَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُوْا اِلَيْهِ،

কেননা এরূপ করার প্রয়োজন রয়েছে, মানুষ তা করতে বাধ্য হয়।

ইমাম শাফেয়ী নিজেই নিজের দেয়া বহু ফিকহী রায় পরিত্যাগ করেছিলেন। পরিত্যাগ করেছিলেন এজন্যে নয় যে, তিনি নিজের মতের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন; বরং সর্ব-সাম্প্রতিক সামাজিক প্রচলন ও লোকদের বহু দিনের পাকা-পোক্ত অভ্যাস অনুযায়ী যে মতটি হওয়া উচিত, যা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেই মত প্রকাশ করতে গিয়েই তাঁকে নিজের পুরাতন মত ত্যাগ করতে হয়েছে। তিনি মিশরে ফিরে গিয়ে সেখানকার পরিবর্তিত অবস্থা ও সমাজ-পরিবেশ লক্ষ্য করে এরূপ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

যে-সব কারণে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে শরীয়াতের কোন কোন হুকুম পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা অনেক সময় জনগণের নৈতিক চরিত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং দ্বীন-প্রচারকের দুর্বলতার কারণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ এ অবস্থাকেই 'কালের বিপর্যয়' বলে থাকেন। অনেক সময় মানুষের জীবন ধারা ও সমাজ-সংগঠনের পরিবর্তনের ফলেও আইনের নব রূপায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, কোন বিদেশী নাগরিককে নিরাপত্তা দানের অধিকার শুরুতে এককভাবে দেশের প্রত্যেক নাগরিকেরই ছিল; কিন্তু উত্তরকালে এই অধিকার কেবলমাত্র সরকার বা প্রশাসনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং সাধারণ নাগরিকদের এই রূপ করার অধিকার নেই বলে সাব্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে হাদীস লিখন ও সংকলন ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক দিকে নিষিদ্ধ ছিল। রাসূলে করীম (স) নিজেই প্রথমে একাজ নিষেধ করেছিলেন এবং খলীফা ও সাহাবীগণও তা থেকে বিরত ছিলেন। অথচ সত্যি কথা হচ্ছে, প্রথম প্রথম যখন একদিকে 'অহী' অর্থাৎ কুরআন মজীদ লিখার কাজ শুরু হয়েছিল,

www.amarboi.org

তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও লিখে রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল। কেননা তখন কুরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে-একাকার হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা ছিল। কিন্তু এ আশংকা যখন থাকল না, তখন এ নিষেধও দূর হয়ে গেল।

এসব কারণেই ফিকাহ্-বিশারদ ইবনে আবেদীন বলেছেনঃ

كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ لِتَغَيُّرِ عُرْفِ أَهْلِهِ أَوْ لِحُدُوثِ ضَرُورَةٍ أَوْ لِفَسَادِ أَهْلِ الزَّمَانِ،

বহু সংখ্যক হুকুম-আহ্কাম কাল ও সময়ের বিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর কারণ হল যুগের লোকদের প্রচলন বদলে যাওয়া কিংবা নবতর কোন প্রয়োজন দেখা দেওয়া অথবা সময়ের লোকদের চরিত্রে বিপর্যয় সংঘটিত হওয়া।

www.amarboi.org

সময়ের পরিবর্তনে আইনের পরিবর্তন

পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বন্দেগীমূলক আইন-বিধান এবং শরীয়াতের সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হুকুম-আহ্‌কাম কোন অবস্থায়ই- স্থান ও কালের শত পরিবর্তনেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু এছাড়া আর যেসব হুকুম-আহ্‌কাম রয়েছে, যেগুলো জনগণের পারস্পরিক লেন-দেনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা তাদের নিতান্তই বৈষয়িক ব্যাপার, তন্মধ্যে যা কুরআন ও সহীহ্‌ সুন্নাত থেকে স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সুনিদিষ্ট, সকল ফকীহ-ইমামই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তাও কোনক্রমেই পরিবর্তিত হবে না। সেগুলো যথাযথভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

এতৎসত্ত্বেও প্রাচীনকালের কিংবা একালের কিছু সংখ্যক লেখক এসব হুকুম-আহকামেও পরিবর্তনের কিছু কিছু রূপ উদ্ধৃত করেছেন এবং তা শরীয়াতের দলীলের বিপরীত মত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সব ক্ষেত্রে সত্যি কথা হল, ক্ষেত্র ও লক্ষণের পার্থক্যের দরুণ শব্দের ভিন্নতর অর্থ গ্রহণের ফলে মূল দলীলেরই পরিবর্তিত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে বলে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ এমন রয়েছে, যার অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ। তার একটি অর্থ গ্রহণে কোন সময় এক ধরনের আইন তৈরী হয়ে থাকে, অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের ফলে তার ভিন্নতর ব্যাখ্যা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার অবকাশও থাকে সেই শব্দের বিশালতর অর্থের মধ্যেই। তখন মুজতাহিদ পূর্বে গৃহীত অর্থ ও তাৎপর্য বাদ দিয়ে নবতর অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করে তারই আলোকে নবতর আইন তৈরী করতে পারেন।

এ দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি, এ বিষয়ে যাঁরা ভিন্নতর মত পোষণ করেন, তাঁদের দৃষ্টি নিতান্তই স্থূল, অগভীর, অ-সূক্ষ্ম। কেননা আমরা আগেই স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে বার বার বলে এসেছি, অকাট্য দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত, তা কখনোই, কোন অবস্থায়ই পরিবর্তিত হয় না; পরিবর্তন করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। তবে সাহাবী, তাবেয়ীন ও কোন কোন ইমামের যে-সব মত বাহ্যতঃ অকাট্য দলীলের বিপরীত মনে হয়, আসলে ও প্রকৃতপক্ষে তা মূল দলীলের বিপরীত নয়। তাতে দলীলকে বদলে দেয়া হয়নি, তার সীমা-লংঘন করেও যাওয়া হয়নি। আসলে তাতে মূল দলীলেরই নবতর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র এবং সে ব্যাখ্যাও শরীয়াতের পরিপন্থী নয়।

www.amarboi.org

এখানে এ পর্যায়ের কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

(১) অলীদ ইবনে উকবা রোম অভিযানে সেনাধ্যক্ষ থাকাকালে মদ্য পান করেছিলেন। তাঁর এ অপরাধ প্রমাণিতও হয় এবং তাঁর উপর মদ্য পানের দণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। এ সময় হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) তাদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ পেশ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنَ الْعَدُوِّ فَيَطْمَعُوا فِيكُمْ؟

তোমরা তোমাদের সেনাধ্যক্ষের উপর এখন দণ্ড কার্যকর করবে, অথচ তোমরা শত্রু বাহিনীর সমীপবর্তী? ... এখন যদি তোমরা তা-ই কর, তাহলে তোমাদের শত্রুপক্ষ তোমাদের মুকাবিলায় অধিক সাহসী ও তোমাদেরকে পরাজিত করার আশায় আশান্বিত হয়ে পড়বে।

অতঃপর দণ্ডদান মুলতবী হয়ে যায়। অথচ মদ্য পানকারীর জন্যে দণ্ড শরীয়াতে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। কিন্তু এখানে একথা বলা যায় না যে, এক্ষেত্রে শরীয়াতের অকাট্য দলীলকে বদলে দেয়া হয়েছে। না, বদলে দেয়া হয়নি। অবস্থা ও পরিবেশের অনানুকূল্যের কারণে শুধু মুলতবী করা হয়েছিল মাত্র। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর দন্ড কার্যকর করা হয়নি এমন কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। কোন দন্ডকে বিলম্বে কার্যকর করা, অন্য কথায় কার্যকর করাকে সাময়িকভাবে মুলতবী রেখে পরবর্তী কোন সময় কার্যকর করার জন্যে তুলে রাখা শরীয়াতে সম্পূর্ণ জায়েয। এসময় অসুবিধা এই ছিল যে, আমীর বা সেনাধ্যক্ষ-দন্ড কার্যকর করা যার দায়িত্ব-তিনি নিজেই অপরাধ করে দন্ডনীয় হয়েছেন। তা ছাড়া এ মুসলিম সৈন্য বাহিনী অবস্থিত ছিল শত্রু দেশে। অথচ নবী করীম (স) নিজে শত্রু দেশে চুরির দন্ড হাতকাটা কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ

চুরির দন্ড হিসাবে হাত কাটার আইন শত্রু-পরিবেষ্টিত দেশে ও পরিবেশে কার্যকর করা যাবে না।

স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত অভিযানে বড় বড় সাহাবীরা শরীক ছিলেন। তাঁরাই সে দন্ড মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার কারণ, তাঁরা বিবেচনা করে দেখেছিলেন, দন্ত কার্যকর করা হলে একটা বিরাট ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তা হল, অপরাধী দণ্ডিত হওয়ার পর আত্মসম্মান বোধের প্রচণ্ডতায়

www.amarboi.org

ও ক্রোধে অন্ধ হয়ে শত্রু পক্ষের সাথে মিলে যেতে পারে। আর তা দন্ড মূলতবী রাখার ক্ষতি থেকে অনেক বেশী মারাত্মক। এই মুলতবী রাখার কাজটি যে চুরির দণ্ড মুলতবী রাখা সংক্রান্ত নবী করীম (স)-এর বাণীর ভিত্তিতে কিয়াস করে করা হয়েছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই একই কারণ বা علت রয়েছে। চোরের হাত কাটা ইসলামের একটা সাধারণ দন্ড, যা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু নবী করীম (স) শত্রুদেশে অনুষ্ঠিত চুরির ব্যাপারটিকে স্বতন্ত্র ধরনের ঘটনা ও বিশেষ বিবেচ্য ব্যাপার রূপে গণ্য করেছেন। কেননা যুদ্ধ তো শত্রু দেশে ও শত্রু পরিবেশেই হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। এ বিশেষ ধরনের ব্যাপার রূপে গণ্য করা যদিও চুরি সংক্রান্ত ঘটনার একটা বিশেষ অংশ, তবুও এর উপর 'কিয়াস' করে অনুরূপ ধরনের ঘটনায় অনুরূপ নীতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েয। বস্তুতঃ এ একটি বিশেষ ধরনের কিয়াস قِيَاسٌ مُخَصَّصٌ। মদ্যপায়ীকে নির্দিষ্ট দন্ডে দন্ডিত করার ব্যাপারে সাহাবীগণ সম্পূর্ণ একমত। সেই সঙ্গে অবস্থা ও ক্ষেত্রের অনানুকূল্যের কারণে তা মুলতবী রাখার ব্যাপারেও সাহাবীগণ সম্পূর্ণ একমত হয়ে ছিলেন। এ ছিল সুস্পষ্ট রূপে সাহাবীদের ইজমা। এ থেকে স্থায়ী নীতি প্রমাণিত হলঃ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

শরীয়াতের নির্দিষ্ট দন্ডসমূহ শত্রু দেশে কার্যকর করা যাবে না।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ

ইমাম আহমাদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ও আওজায়ী প্রমুখ মুসলিম ফিকাহ্‌বিদ মনীষীগণ এক মত হয়ে বলেছেনঃ শরীয়াতের নির্দিষ্ট দন্ডসমূহ শত্রুদেশে কার্যকার করা যাবেনা।

আবূ মুহাম্মাদ আল মাকদেসী বলেছেন, এ-ই হচ্ছে সাহাবীদের ইজমা। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) এই ফরমান লিখে সর্বত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেনঃ

أَلَّا يُقِيمَ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ حَدًّا وَهُوَ غَازٍ لِئَلَّا تَلْحِقَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَلْحَقُ بِالْكُفَّارِ

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ বা ক্ষুদ্র বাহিনীর কমাণ্ডার যেন যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় শরীয়াতের নির্দিষ্ট দন্ড কারো উপর কার্যকর না করে। কেননা তা করা হলে দণ্ডিত ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়তে ও কাফির শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে যেতে পারে।

www.amarboi.org

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ চলাকালে হযরত উমর (রা) চুরির দন্ডদান মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এ কাজটি ছিল প্রয়োজন, অভাব-অনটন ও দুর্যোগকালীন জরুরী ব্যবস্থা পর্যায়ের। সমস্ত মুসলমান এর গুরুত্ব একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এ নীতির ভিত্তিতে আরও অনেক আইন-বিধান তৈরী হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেনঃ

إِنَّ سُقُوطَ الْقَطْعِ فِي الْمُجَاعَةِ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ لِمَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَهٰذِهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ تَدْرَأُ الْقَطْعَ عَنِ الْمُحْتَاجِ،

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবজনিত অবস্থায় চোরের হাত কাটা দন্ড প্রত্যাহার করা যেমন বিবেক-বুদ্ধিসম্মত, তেমনি শরীয়াতের বিধান অনুরূপও। কেননা মানুষের প্রয়োজন ও অভাব যখন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তখন মানুষের দ্বারা এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরূপ অবস্থায় অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে চুরি করেছে এ সন্দেহই প্রবল হয় এবং এ সন্দেহই অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে চুরির দরুণ হাত কাটা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী।

আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, এরূপ অবস্থায় হাত কাটার দন্ড মওকুফ করে দেয়াটা রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ-ভিত্তিক কাজ। তাঁর নির্দেশ হলঃ

اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ،

শোবাহ্-সন্দেহের উদ্রেক হলে শরীয়াত-নির্দিষ্ট দন্ড মওকুফ কর।

ফিকাহ্‌বিদগণ রোযার ফিত্‌রা শরীয়াতের অকাট্য দলীলের বিপরীত কোন খাদ্য দিয়ে আদায় করাও জায়েয মনে করেছেন। শাফেয়ীদের মতে সমাজে চলতি প্রধান খাদ্য দিয়ে আর হানাফীদের মতে اَلْقِيَمُ বা স্থায়ী খাদ্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা জায়েয। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ কিয়াস (Analogical deduction) পর্যায়ের। এখানে মূল হুকুমের কিছুমাত্র পরিবর্তন করা হয়নি,তার বিরুদ্ধতা করা তো দূরের কথা। কেননা এক সা খেজুর, যব বা ময়দা দিতে বলার মূলে علت বা কারণ হচ্ছেঃ

اِغْنَاءُ الْفَقِيْرِ عَنِ السُّوَالِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ بِسَدِّ حَاجَتِهٖ

ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তির ঈদের দিনের প্রয়োজনটা পূর্ণ করে দিয়ে তাকে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা থেকে অভাবমুক্ত করে দেয়া।

www.amarboi.org

এই উদ্দেশ্য খাদ্যশস্য বা খাদ্যদ্রব্য না দিয়ে অন্য কিছু দিয়েও পূর্ণ করা যেতে পারে। সেরূপ সুযোগ থাকাও জরুরী। কেননা মানুষের খাদ্যবস্তু নিত্য-পরিবর্তনশীল। সর্বকালে ও সর্বদেশের মানুষ একই খাদ্য গ্রহণ করবে, এমন কথা জরুরী নয়। স্থান ও কাল ভেদে মানুষের খাদ্যও বিভিন্ন হতে পারে। যুগোপযোগী কোন জিনিস দিয়েও এ উদ্দেশ্য পূরণ করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টি বিভিন্ন। কোথাও তা বিস্তীর্ণ উদার আর কোথাও সংকীর্ণ।

ঋতুমতী স্ত্রী লোকদেরকে হজ্জের সময় আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। কিন্তু শেষ দিকের ফিকাহ্‌বিদগণ তা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফরয হজ্জ আদায় করার জন্যে এই অনুমতি একান্তই জরুরী ছিল। কেননা এবারে হজ্জ পূর্ণ করতে না পারলে পরে হয়ত এমন প্রতিবন্ধীকতার সৃষ্টি হবে, যার দরুণ আবার হজ্জ করতে আসা সম্ভবপর হবে না। যদিও নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ঋতুমতী স্ত্রী-লোকের কারণে লোকদের চলাচলে খুবই অসুবিধা হত বলে তাঁদের আমলে এটা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উত্তরকালে সাধারণ অবস্থার দৃষ্টিতে এটা কার্যকর মনে করে আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করতে তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যদিও এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে।

এ পর্যন্ত আমরা যে মতটি প্রকাশ করেছি, তার সার কথা হলঃ শরীয়াতের হুকুম কোন অকাট্য দলীল বা ইজমার বিপরীত পরিবর্তিত হয় না কখনও। প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ আল-ক্বিরাফী বলেছেনঃ

اِنَّ جَمِيْعَ اَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمَحْمُوْلَةِ عَلَى الْعَوَائِدِ اِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَادَةُ تَغَيَّرَتِ الْاَحْكَامُ فِىْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ

লোকদের সাধারণ আদত-অভ্যাসমূলক ফিকাহ্‌র সব ক'টি দিক সম্পর্কেই একথা চূড়ান্ত যে, সে অভ্যাস কখনও পরিবর্তিত হলে, সেই অভ্যাস-ভিত্তিক শরীয়াতী হুকুমও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, আদত-অভ্যাসমূলক হুকুম আদত-অভ্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় এবং তা যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেসব হুকুমের উৎস কুরআন-সুন্নাহ্‌র অকাট্য দলীল কিংবা ইজমা, লোকদের আদত-অভ্যাসের পরিবর্তনে সে সব হুকুম কখনও বদলে যায় না।

বস্তুতঃ ক্বিরাফী উপরোদ্ধৃত উক্তিতে তাঁর ইমামের 'মুসলিহাত' সংক্রান্ত নীতির প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। সে নীতি হল, 'মুসলিহাত' যদি কোন অকাট্য

www.amarboi.org

দলীল বা ইজমা'র কোন মূলনীতির সাথেই সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে অবশ্যই আইন রচনা করা যাবে এবং সে আইন শরীয়াত মুতাবিক বলে গণ্য হবে।

আল্লামা শাতেবী (মৃঃ ৭৯ হিঃ) তাঁর اَلْمُوَافَقَاتُ. গ্রন্থে লিখেছেনঃ

إِنَّ الْمُصْلِحَةَ الْمُرْسَلَةَ تُعْتَبَرُ إِذَا كَانَتْ مُلَائِمَةً لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِحَيْثُ لَا تُنَافِي اَصْلاً مِنْ اُصُوْلِهِ وَلَا دَلِيْلاً مِنْ دَلَائِلِهِ،

মুসলিহাত যদি শরীয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং তার কোন একটা মূলনীতির কিংবা কোন একটা দলীলেরও তা বিপরীত না হয়, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُصْلِحَةَ إِذَا عَارَضَهَا نَصٌّ تُلْغٰى،

শরীয়াতের কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীল যদি মুসলিহাতের বিপরীত হয়, তবে তা তাৎপর্যহীন ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়ে যাবে।

এ পর্যায়ে আমাদের সর্বশেষ কথা হল, শরীয়াতের এমন অনেক হুকুম রয়েছে, যা কাল ও যুগের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তা যতই পরিবর্তিত হোক-না-কেন, শরীয়াতের মূল উৎস ও ভাবধারা সর্বাবস্থায় এক ও অভিন্নই থাকবে। শরীয়াতের সে মৌল ভাবধারা হলঃ

اِحْقَاقُ الْحَقِّ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَتَحْقِيْقُ مَا فِيْهِ نَفْعُ الْمُجْتَمِعِ الْاِسْلَامِيْ فِيْ ضُوْءِ مَبَادِى الْاِسْلَامِ وَقَوَاعِدِهِ الْعَامَّةِ،

সত্যকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের পথ বন্ধ করা, যে কাজে ইসলামী সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিহিত, তা ইসলামের মৌলনীতির আলোকে সুসম্পন্ন করা।

www.amarboi.org

শরীয়াতের কতিপয় সামগ্রিক নীতি

শরীয়াতে মূলনীতি-বা সামগ্রিক মূলনীতি-বলতে বুঝায় এমন সব হুকুম মৌল নীতি, যা শরিয়াতের খুঁটিনাটি বিষয়াদির অধিকাংশের উপরই প্রযুক্ত হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়ঃ প্রতিটি সামগ্রিক নিয়ম বা মৌল নীতির অধীন বিপুল সংখ্যক খুঁটিনাটি মাসলা এসে যায়, যা ফিকাহ্‌র বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। কথার সংক্ষিপ্ততা, ভঙ্গির স্পষ্টতা-অকাট্যতা এবং খুঁটিনাটি মাসলার সামগ্রিক ব্যাপকতাই হচ্ছে এ সামগ্রিক মৌল নীতিগুলোর বৈশিষ্ট্য। তবে তাতেও যে ব্যতিক্রম (Exception) হয় না তা নয়। সে ব্যতিক্রম আবার অপর এক সামগ্রিক মৌল নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যতিক্রমের দরুণ এ সব সামগ্রিক মৌল নীতির গুরুত্ব কিছুমাত্র কম হয়ে যায়নি এবং সামগ্রিকতাও হয়নি কিছুমাত্র দুর্বল।

মুসলিম ফিকাহ্‌বিদগণ এই ধরনের মৌল নীতি রচনা ও ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এসব মৌল নীতির ফলে খুঁটিনাটি মাসলা বের করার কাজ খুবই সহজ হয়ে যায়। মুজতাহিদ ইমামগণ কর্তৃক ক্রমাগতভাবে এসব মৌল নীতি বিরচিত কিংবা সুনির্ধারিত হয়েছে। শরীয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ও আলোকেই এগুলো রচিত। শরীয়াতের হুকুমের বা সিদ্ধান্তের মৌল কারণ এর মাধ্যমে সহজেই জানতে পারা যায়।

এ মৌল নীতিসমূহের ইতিহাস সন্ধান করা এবং কোন্‌টি কখন বা কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে এবং কার দ্বারা তৈরী হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে যেসব মৌল নীতি রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসের ভিত্তিতে তৈরী তা রাসূলের সে সব উক্তির ভিত্তিতে তৈরী যার 'সাধারণ নিয়ম' হওয়ার বিশেষত্ব রয়েছে। অথবা তা অপর কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে। কোন কোন মুজতাহিদ ইমামের উক্তি থেকেও এ ধরনের অনেক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যা পরবর্তী কালে ফিকাহ্‌র মৌল নীতি হিসেবে প্রচলিত ও ফিকাহ্‌বিদগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

এ পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়ে যতটা ধারণা করা যায়, তার ভিত্তিতে বলা যায়, হানাফী মাযহাবের ফকীহ্‌গণই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রবর্তিতা লাভ করেছেন। তাঁরাই বেশী বেশী কায়দা-কানুন তৈরী করেছেন এবং তাঁর ভিত্তিতে অনেক খুঁটিনাটি মাসলা বের করেছেন। সেগুলোকে এমন মৌলনীতি রূপে তাঁরা গ্রহণ

www.amarboi.org

করেছেন। যার উপর ভিত্তি করে বহু খুঁটিনাটি ফিকহী মাসলার রায় প্রকাশ করা হয়েছেঃ

মালিক মাযহাব পন্থী আল-ক্বিরাফী বলেছেনঃ

أُصُولُ الشَّرِيْعَةِ قِسْمَانِ أُصُولُ الْفِقْهِ، وَالْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَةِ الْفِقْهِيَّةِ

শরীয়াতের মৌল নীতি দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগে রয়েছে ফিকাহ্‌র মৌলনীতি আর অন্য ভাগে ফিকহী সামগ্রিক নীতি।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ যে এই ব্যাপারে বেশী অগ্রবর্তিতা লাভ করেছেন, তার কারণ এই যে, তাঁদের ফিকাহ্‌র প্রকৃতি এবং তাঁদের লক্ষ্য ও ঝোঁক হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা ও মতের দিকে। কাল্পনিক মাসলা বানিয়ে তাতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়ার চেষ্টাও এই ফিকাহ্‌য় রয়েছে। এভাবে বহু অসংখ্য খুঁটিনাটি মাসলা বের করা হয়েছে। এমনকি তাঁদের অনেকগুলো ফিকহী মুলনীতিও এ থেকেই নিঃসৃত। এ সব কারণেই হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ এমন সব সামগ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছেন, যার ভিত্তিতে অনেক বিক্ষিপ্ত খুঁটিনাটি মাসলা বের করা সম্ভবপর হয়েছে।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদ আবূ তাহের দোবাস হানাফী মাযহাবের এ ধরনের বহু সংখ্যক সামগ্রিক নীতি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত সামগ্রিক নীতির (قَاعِدَةٌ كلية) সংখ্যা সতের। সম্ভবতঃ এটাই এ পর্যায়ের প্রথম কাজ। তাঁর পরে প্রখ্যাত হানাফী ফিকাহ্‌বিদ আল-কারখী দোবাস সংগৃহীত সামগ্রিক নীতির সাথে আরও কয়েকটি নীতি সংযোজিত করেছেন। তাতে এর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭ টি। তাঁর পরে হানাফী ফকীহ ইমাম আবূ জায়দ্ দবুসী এ জিনিসটিকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে গড়ে তোলেন এবং تَاسِيْسُ النَّظَر নামক একখানি কিতাব রচনা করেন। তাতে রয়েছে ৮৬টি সামগ্রিক নীতি। হিজরী সপ্তম শতকে শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِيْ مَصَالِحِ الْأَنَامِ নামের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মালিকী ফিকাহ্‌বিদ আহমাদ ইবনে ইদরীস আল-ক্বিরাফী এ পর্যায়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার নাম الفروق ।

আমরা এখানে এ পর্যায়ের কতিপয় সামগ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ মৌল নীতি উদ্ধৃত করছি এবং কোন্‌টির ভিত্তিতে ফিকাহ্‌র মাসলা বের করায় কিরূপ সহায়তা ও আনুকূল্য পাওয়া যায়, তা আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছিঃ

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

www.amarboi.org

সমস্ত ব্যাপার তার উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট

শরীয়াত পালনে দায়িত্বশীল লোকেরা যে সব 'আমল' করে, তা হয় ভাল, নয় মন্দ। তাতে হয় ভাল নিহিত, নয় মন্দ নিহিত। এখন এই ভাল বা মন্দ-যা-ই আছে তা পাওয়া যাবে ব্যক্তির নিয়্যাত ও মনোভাব অনুপাতে। ব্যক্তি কাজ থেকে যতটা প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সে তা থেকে ততটাই পেতে পারে। এ একটি সামগ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ মৌল নীতি। এ নীতিটি রচিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত এই প্রখ্যাত হাদীসটির ভিত্তিতেঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى،

সমস্ত আমলই নিয়্যাত আনুপাতিক। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আমল থেকে তা-ই পায়, যা সে নিয়্যাত করেছে।

এ হাদীস অনুযায়ী কাজের বিশুদ্ধতা, যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে নিয়্যাত। কেননা অনেক ভাল ভাল কাজ এমন আছে, যা করা হয় খারাপ নিয়্যাতে। ফলে তা নেক আমল থাকে না, বদ আমল হয়ে যায় এবং সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়, কোন রূপ ভাল ও শুভ ফল দেয়া হয় না। যেমন লোক-দেখানো নামায। যে তা পড়ে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত নয়-জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছেন। শুধু তা-ই নয়, সমস্ত আমলের মূল কথাই হল ঈমান। অর্থাৎ কাজটি করার সময় লোকটির ভিতরে লালিত মনোভাব। কাজের সঙ্গে মনোভাবের সঙ্গতি না থাকলে লোকটিকে বলা হবে মুনাফিক-বেঈমান।

এ সামগ্রিক কথাটি মানুষের কাজগুলোকে তার উদ্দেশ্যের সাথে সুসংবদ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে ইবাদাতে এ জিনিসটি খুবই প্রকট। কেননা ইবাদাতসমূহ একান্তভাবে আল্লাহ্র হক। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্র অংশীদার কেউ নয়। আর এর ফলাফল হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট থেকে বান্দাহর সওয়াব পাওয়া কিংবা তাঁর ক্রোধ ও অসন্তোষ ডেকে আনা। কিন্তু 'মুয়ামিলাতে'র ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের অধিকার কার সাথে কতটা সংশ্লিষ্ট এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা কি, তা জানা সম্ভবপর নয়। এই কারণে তার জন্যে একটা নিদর্শনের প্রয়োজন। এই নিদর্শন থেকেই অধিকার সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এ ইচ্ছারই নাম হচ্ছে 'প্রকাশ্য ইরাদা'।

এই নিয়মের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, কাজের বাহ্যিক রূপ ও মনোভাব যখন ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী হবে, তখন নিয়্যাত অনুসারেই কাজ সম্পর্কে

www.amarboi.org

ফয়সালা করা হবে, অবশ্য যদি নিয়্যাত সম্পর্কে জানা যায়। এমতাবস্থায় নিয়্যাত যদি বাহ্যিক প্রকাশের বিপরীত হয়, তাহলে নিয়্যাতই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে। একথা বুঝাবার জন্য একটি সামগ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ মৌল নীতি তৈরী হয়েছে। তাহলঃ

إِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

পারস্পরিক চুক্তির ব্যাপারে মৌলিক উদ্দেশ্য ও হৃদয়-নিহিত ভাবধারাই গুরুত্বপূর্ণ, বাহ্যিক শব্দ ও প্রকাশটার কোন গুরুত্ব নেই।

তাই যদি কেউ বিনিময়ের ভিত্তিতে ধার নেয়, তাহলে বাহ্যত তা ধারের চুক্তি হলেও কার্যত তা হবে ইজারা চুক্তি। আর যদি কেউ বিনিময়ের ভিত্তিতে কিছু দান করে, তবে তা হবে বিক্রী। আর এ কারণেই 'হেবা' শব্দ দ্বারা যে বিবাহ হয়, তা হানাফী মাযহাব মতে সহীহ্ বিবাহ।

এ মৌল নিয়মটির ভিত্তিতে ফিকাহ্র বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও খুঁটিনাটি মাসলা গড়ে উঠেছে। এ দৃষ্টিতেই যদি কেউ আংগুর ক্রয় করে সুরা বানাবার উদ্দেশ্যে, সে গুনাহগার হবে। আর যে লোক বিদ্রোহীদের বা ডাকাতদের নিকট অস্ত্র বিক্রী করবে তাদের সাথে সাহায্য ও সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সেও অপরাধী হবে। যদি কেউ রোযার নিয়্যাত না করেই পানাহার থেকে বিরত থাকে, তা হলে সে রোযা রেখেছে বলে মনে করা যাবেনা-তা রমযান মাসের হলেও নয়। এরই ভিত্তিতে বহু সংখ্যক ফিকাহ্বিদ বলেছেনঃ কোন পাপ কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করলে সে শরীয়াতের দেয়া সুযোগ-সুবিধা কিছু পাবে না। সে বিদেশযাত্রী নামাযে কসর করার দুই ওয়াক্তের নামায এক সময়ে পড়ার এবং রমযান মাসের রোযা না রাখার সুবিধাও পাবে না।

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

নিয়্যাত না হলে সওয়াব হয় না।

এ একটা মৌল নীতিমূলক বাক্য। তাৎপর্যের দিক দিয়ে পূর্বোল্লোখিত কথাটিরই শাখা হচ্ছে এই কথাটি। কেননা প্রথমে যে মৌল নীতিটির কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হল, 'সমস্ত কাজ তার উদ্দেশ্য-অনুপাতে হয়ে থাকে।' এর অর্থ হল কাজের স্বীকৃতির ভিত্তি হল নিয়্যাত। আর নিয়্যাত না হলে সওয়াব না হওয়ার কথাটিও এরই মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কেননা কাজের স্বীকৃতির আর এক অর্থ হল কাজের সওয়াব পাওয়া।

www.amarboi.org

আর 'নিয়্যাত' বলতে বুঝায় কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং সওয়াব ও সন্তোষ লাভের ইচ্ছা ও মানসিকতা। বস্তুতঃ এর ফলেই কাজের সওয়াব পাওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে একটা জরুরী শর্ত হচ্ছে, কাজটির মূলতঃই শরীয়াতসম্মত-বৈধ হতে হবে, নিষিদ্ধ ও হারাম হলে চলবে না। এই শরীয়াতসম্মত ও জায়েয কাজটি সম্পন্ন করেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তোষ লাভ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। কেননা কাজটি যদি মূলতঃই হারাম বা নিষিদ্ধ হয়, তাহলে সে কাজটি সম্পন্ন করায় কোন সওয়াব হতে পারে না, তার নিয়্যাত করলেও নয়। শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নয় এমন কাজ করে সওয়াব পাওয়ার একটা মনোভাব মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত দেখা যায়।

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

ক্ষতি দূর করতে হবে

এই মৌল নীতিমূলক কথাটি রাসূলে করীম (স)-এর একটি বাণীর ভিত্তিতে রচিত। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত সে হাদীসটির ভাষা হলঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ক্ষতি স্বীকার করা এবং অন্য কারো ক্ষতি করা-দুটোই নিষিদ্ধি।

হাদীসটির বক্তব্য উপরোক্ত কথাটির তুলনায় অনেক বেশী ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা হাদীসটির প্রথমাংশ . لَاضَرَرَ. 'ক্ষতি নেই বা নয়'-এর অর্থ ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার পথ বন্ধ করতে হবে-যেন ক্ষতি সাধিত না হতে পারে। আর সেই সঙ্গে যদি ক্ষতি হতে থাকে, তবে তাও বন্ধ করতে হবে। আর হাদীসের দ্বিতীয় অংশ وَلَا ضِرَارَ. 'ক্ষতি করা যাবেনা'-এর অর্থ, কেউ কারো ক্ষতি করলে সেই ক্ষতির প্রতিকার রূপেও ক্ষতির কাজ করা যাবে না। মিথ্যা দোষারোপের বদলে মিথ্যা দোষারোপ করা যাবেনা, মিথ্যা কথার প্রতিবাদে বলা যাবে না মিথ্যা কথা। যে লোক সীমা-লংঘনকারী-অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী, তারও হক নষ্ট করা যাবে না।

তবে কুরআন মজীদের আয়াতঃ

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

কেউ খারাপ কাজ করলে তার শাস্তি সেই খারাপ কাজ পরিমাণে করা যাবে।

এও একটা মৌল নীতিমূলক কথা। এর ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বহু সংখ্যক ফৌজদারী আইন রচনা করেছেন। কিসাস্ ও সীমা-লংঘন রদ করার ক্ষেত্রে

www.amarboi.org

অনুপাতিক সমতা একটা বড় শর্ত। অনুরূপভাবে তা মুসলিহাতেরও ভিত্তি। তবে এ নিয়মটির বাস্তবতার ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিধি যথাসম্ভব সংকীর্ণ রাখা বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই যদি কোন লোক অন্য কারো মাল-সামান নষ্ট করে, তা হলে শরীয়াতের হুকুম হল সে মালের ক্ষতি পূরণ দেয়া, নষ্টকারীর মাল ধ্বংস বা নষ্ট করা নয়। কেননা এই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করায়ই সীমা-লংঘনকারীর ক্ষতির প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। মালের বিনিময়ে মাল নষ্ট বা ধ্বংস করে নয়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হলেই মালের হিফাজতের উদ্দেশ্য রক্ষা পায়। এই কারণে এবং অনুরূপ ধরনের পরিস্থিতিতে ফিকাহ্‌বিদগণ এই মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেনঃ

اَلضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ

ক্ষতি রোধ করা যায় না অনুরূপ ক্ষতির কাজ দ্বারা।

এ নিয়মটির ভিত্তিতে বহু খুঁটিনাটি মাসলা তৈরী হতে পারে। যেমন, কৃষি জমির ইজারার মিয়াদ যদি ফসল কাটা বা ফসল পাকার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তখন সে জমি ইজারাদারের দখলেই থাকবে; কিন্তু ফসল কাটা বা ফল পাড়া পর্যন্তকার মিয়াদের জন্যে জমির ভাড়া দিতে হবে। তা দিলেই জমি-মালিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে কোন নৌকা ভাড়া করে সমুদ্র যাত্রা করে আর সে মিয়াদ শেষ হয়ে যায় এমন অবস্থায় যে ভাড়াকারী তখন মধ্য সমুদ্রে, তাহলে তীরে পৌঁছার জন্যে যতটা সময় লাগবে, ততটা মিয়াদের ভাড়া পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে আদায় করতে হবে। 'হকে শোফ্‌য়া' এই মৌল নীতির ভিত্তিতেই শরীয়াতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত মূলনীতিটির ভিত্তিতে আরও বহু সংখ্যক মূলনীতি স্থিরকৃত হয়েছে। তবে তা ততটা ব্যাপক নয়। যেমন ফিকাহ্‌বিদগণ বলেনঃ

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ

ক্ষতি প্রতিরোধ করা হবে যতটা সম্ভব ও যতটা সাধ্যে কুলায়।

শত্রু পক্ষের ক্ষতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করাকে এ কারণেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যে সব কারণ কঠিন বিপর্যয়ের উৎস, তা বন্ধ করে দেয়া একারণেই ওয়াজিব। অনুরূপ আর একটি মূলনীতি হলঃ

اَلضَّرَرُ الاَكْبَرُ وَيُدْفَعُ بِالضَّرَرِ الاَخَفِّ

বড় মাত্রার ক্ষতি হালকা মাত্রার ক্ষতি দ্বারা প্রতিরোধ করা হবে।

www.amarboi.org

এই নীতির ভিত্তিতেই ধনী লোকদের ধন-মাল থেকে তাদের গরীব নিকটাত্মীয়দের ব্যয় নির্বাহ করায় জোর প্রয়োগ করা ফরয করে দেয়া হয়েছে।

অজ্ঞ চিকিৎসক, হাসি-তামাসাকারী, নির্লজ্জ মুফতি ও দরিদ্র ভাড়াকারীর উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করাও এই পর্যায়েরই কাজ। ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারাদারীতে জনকল্যাণের দৃষ্টিতে বল প্রয়োগ করা একারণেই জায়েয হয়ে যায়।

অনুরূপ আর একটি মৌল নীতি হলঃ

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

কল্যাণ লাভের তুলনায় বিপর্যয় বন্ধ করার কাজ অগ্রাধিকারী

এরই ভিত্তিতে সূদ, খারাপ লেন-দেন ও মদের ব্যবসায় হারাম করে দেয়া হয়েছে, যদিও একাজে যথেষ্ট ফায়দা লক্ষ করা যায়।

আর একটি মৌল নীতিঃ

اِنَّ الْمَانِعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ

কোন কাজের নিষেধ ও আদেশের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে নিষেধকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

একজন লোক যার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, সেই লোক যদি তাকে ইচ্ছা করে ও অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তা হলে এখানে এমন একটি কারণ পাওয়া গেল যার দরুণ হত্যাকারীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে হবে। কেননা হত্যাকাণ্ড একটা প্রকাণ্ড ক্ষতির কারণ। এই রূপ ক্ষতিকর হত্যা কান্ড থেকে লোকদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই মীরাস থেকে বঞ্চিত করার এই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। মীরাস থেকে বঞ্চিত করাও একটা ক্ষতি। কিন্তু তা হত্যার তুলনায় সহজ ও হালকা। এই হালকা ক্ষতি দিয়ে বড় ক্ষতির পথ বন্ধ করার ব্যবস্থাও এটা। মীরাসী বিধান মত একজন লোক অন্যের সম্পত্তিতে অংশ পায়। এ বিধান সে অংশ দিতে বলে, কিন্তু হত্যা কান্ড মীরাস দিতে নিষেধ করে। এক্ষেত্রে এ দু'টি পরস্পর-বিরোধী বিধানের মধ্যে অগ্রাধিকার পাচ্ছে নিষেধ—আদেশ নয়।

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

আদত-অভ্যাস একটা সুদৃঢ় ভিত্তি।

www.amarboi.org

'আদত-অভ্যাস' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়ম-প্রথা। মানব সমাজে পারস্পরিক কাজ-কর্ম, লেন-দেন তথা মুয়ামিলাতের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-প্রথা প্রচলিত, ইসলামী শরীয়াতে তার গুরুত্ব স্বীকৃত। এই কারণে প্রতিযোগিতা করে ক্রয়-বিক্রয় করা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলী আরোপ করাকে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ জায়েয বলেছেন-শর্ত আরোপ চুক্তির মূল লক্ষ্যের বিপরীত হলেও এবং এ পর্যায়ে শরীয়াতের কোন দলীল না থাকলেও।

ইমাম আবূ হানীফা কোন বিষয়ে 'কসম' করা হলে তা ভঙ্গ حنث হল কি হল না বা গুনাহ্ হল কি হল না, সে বিষয়ে রায় ঠিক করার ব্যাপারে এই নীতিটিকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। হানাফী ফকীহ্‌গণ বলেছেন, কেউ যদি 'কসম' বা 'হলপ' করে যে, সে গোশ্‌ত খাবেনা, অতঃপর সে যদি মাছ খায়, তবে সে 'হলপ' ভঙ্গ করেনি- এতে তার কোন গুনাহ্ হয়নি; যেহেতু কুরআনে মাছকে لَحْمًا طَرِيًّا 'টাটকা গোশত' বলা হয়েছে। তেমনি, কেউ যদি 'হলপ' করে সে বিছানায় বসবে না, তারপর সে মাটির উপর বসে, তা হলে সে হলপ ভঙ্গ করেনি এবং তাতে তার গুনাহ্ হবে না; যেহেতু কুরআনে মাটিকেও বিছানা (فِرَاش) বলা হয়েছে। এর কারণ হল এভাবেই মানুষকে অসুবিধা থেকে বাঁচানো যায় আর লোকদের সাথে ঠিক উদ্দেশ্যানুপাতে ব্যবহার করা সম্ভব।

ইমাম আবূ ইউসুফ ফিকাহ্‌র মাসলা বের করার ক্ষেত্রে এ মূলনীতিটি অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কোন সুদৃঢ় প্রচলনের উপর ভিত্তি করে যদি কোন দলীল এসে থাকে, পরে যদি সেই প্রচলনটি বদলে যায়, তাহলে এই বদল হওয়ার কারণে তার উপর ভিত্তি করে দেয়া হুকুমও বদলে যাবে। এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার বিষয় হল, সে সুদৃঢ় প্রচলনটি শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। তা হারামকে হালাল করবে না এবং হালালকে হারাম করবে না। যেমন ফুলশয্যার মিলনের পূর্বেই স্ত্রীকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা পাঠানোর একটা ব্যাপক প্রচলন সমাজে রয়েছে। মহরানার অর্ধেক বিবাহকালে দেয়া ও বাকী অর্ধেক পরবর্তী সময়ের জন্য অবশিষ্ট রাখারও ব্যাপক রেওয়াজ আছে। এগুলো এ প্রচলনের কারণেই জায়েয।

তবে কোন হারাম কাজকে হালাল করার কিংবা হালাল কাজকে হারাম করার যে-সব প্রচলন রয়েছে, তা খুবই খারাপ ও নিন্দার্হ। শরীয়াতে তা কোনক্রমেই গণ্য হতে পারে না এবং তার ভিত্তিতে শরীয়াতের কোন হুকুমও জারী হতে পারে না। যেমন কোন সমাজে যদি সূদকে হালাল করার প্রচলন থাকে কিংবা ক্রয়-

www.amarboi.org

বিক্রয়ে হারাম প্রথার প্রচলন হয় অথবা মানুষের সম্মান নষ্ট করার বা ধন-মাল লুটে নেয়ার রেওয়াজ চালু থাকে, বা স্ত্রীলোককেও পুরুষের সমান পরিমাণে মীরাসের অংশ দেয়ার প্রচলন হয়, তাহলে এর কোনটিই জায়েয প্রচলন রূপে শরীয়াতে গৃহীত হবে না। কেননা শরীয়াতের হুকুম এর প্রতিটিরই বিরুদ্ধে রয়েছে।

اَلْيَقِينُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস সন্দেহের কারণে দূর হয়ে যেতে পারে না।

এর তাৎপর্য হল, যখন একটা ব্যাপারে শরীয়াত অনুযায়ী চূড়ান্ত রূপে ফয়সালা হয়ে যায় এবং পরে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলে এ সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কাজ করা যাবে না। পূর্ব থেকে শরীয়াত অনুযায়ী যা সুস্পষ্ট, চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট, সে অনুযায়ীই আমল হতে থাকবে। হাদীসের কতকগুলো ঘোষণা থেকে এ মূলনীতিটির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, একজন লোক অযু থাকার প্রত্যয় নিয়ে নামায পড়তে শুরু করে দিল। তখন শয়তান তার মনে এই অস্অসা ও সন্দেহ জাগাল যে, তার অযু নেই। এরূপ সন্দেহকে নবী করীম (স) অযূ নষ্টকারী রূপে গণ্য করেন নি, যতক্ষণ না অযূ না থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় হবে বা তার মনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। ফিকাহ্‌বিদ আল-আজীজী তার اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ গ্রন্থে লিখেছেনঃ

إِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ دَلِيْلٌ عَلٰى هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ الْأَسَاسِيَّةِ

উপরোক্ত হাদীসটি এ মৌল নীতিটির সত্যতা ও যথার্থতার অকাট্য দলীল।

এরই ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ দৃঢ় প্রত্যয় ও ইয়াক্বীন সহকারে যদি কোন চুক্তি সংঘটিত হয়, এবং তারপরে সে চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার কোন সন্দেহ জাগে, তাহলে চুক্তিটি অবিচল থাকবে, তা ভেঙ্গে যাবে না। কারো নিকট রক্ষিত আমানত যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, অতঃপর সন্দেহ হয় যে, আমানত নষ্ট হওয়ার কারণ আমানতকারীরই সৃষ্ট, তা হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে আমানতদারকে বাধ্য করা যাবে না।

বহু ফিকাহ্‌বিদ ও ফিকাহ্‌র মূলনীতি-বিশারদগণ এ নীতির ভিত্তিতেই 'ইস্তিসহাব' নীতি উদ্ভাবন করেছেন। অনেক এর-ই দৃষ্টিতে বলেছেনঃ

اَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ

www.amarboi.org

যা যেরকম ছিল,তার সেরকম থাকাই হচ্ছে আসল ও প্রকৃত অবস্থা।

এ মূলনীতির আলোকেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ

اَلْاَصْلُ بَرَاْءَةُ الذِّمَّةِ

দায়িত্বমুক্ত হওয়াটাই আসল অবস্থা।

কেননা মানব সন্তান কোনরূপ বাধ্যবাধকতার বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তার উপর যে-সব বাধ্যবাধকতা চাপে এবং যে সবের জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তা সবই আনুসঙ্গিক ও পরে আরোপিত জিনিস। মৌল অবস্থা হচ্ছে কোনরূপ দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা না থাকা। এই কারণে এ মূলনীতিটিও চালু হয়েছেঃ

اَلْاَصْلُ فِيمَا يَعْرِضُ مِنَ الْاُمُوْرِ الْعَدَمُ

যে-সব বিষয়াদি অর্পিত বা আরোহিত হয়, তার মূল হল না-হওয়া।

যেমন ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ

اَلْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْاِنْكَارِ عَلَى الْمُدَّعِيْ

বিবাদী অস্বীকৃত হলে বাদী প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য হবে।

কেননা অস্বীকৃতির ফলে তার আসল অবস্থা-দায়িত্বশীল না হওয়া-অবশিষ্ট থাকবে। রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ

বিবাদী অস্বীকার করলে বাদী দলীল-প্রমাণ পেশ করতে কসম করতে বাধ্য।

এই পর্যায়ে আর একটি মৌল নীতি হলঃ

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ،

যেখানে প্রত্যক্ষ-সুস্পষ্ট কথা বর্তমান, সেখানে ইশারা-ইঙ্গিত ও পরোক্ষ কথার কোন গুরুত্ব নেই।

এর আলোকে মাসলা হলঃ বিক্রেতার সামনে তার দ্রব্যের মূল্য গ্রহণের পূর্বেই যদি ক্রেতা পণ্যদ্রব্যটি হাতে নিয়ে নেয়-নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং সেমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি চুপ থাকে, তাহলে মুখে তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া-না-দেয়ার কোনই গুরুত্ব নেই।

এ পর্যায়ের আর একটি মৌল নীতি হলঃ

www.amarboi.org

إِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ

যেখানে স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন, সেখানে যদি চুপ থাকা হয়, তা হলে তা-ই স্পষ্ট কথা বলে গণ্য হবে।

যে চুপচাপ-নির্বাক, তার ব্যাপারে তো এটা মনে করা যাবে না যে, সে কথা বলছে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে তার চুপচাপ থাকাটাই কথা বলার স্থলাভিষিক্ত হবে। এ থেকে একটা বড় মৌল নীতি বের হয়ঃ

أَنَّ الْكَلَامَ يَقِينٌ وَالسُّكُوتَ شَكٌّ

কথা স্পষ্ট প্রত্যয় উদ্রেককারী আর চুপচাপ থাকা সন্দেহ উদ্রেককারী।

এ দৃষ্টিতে বলা যায়, স্ত্রী যদি জানতে পারে যে, তার স্বামীর যৌন দোষ ও ত্রুটি রয়েছে এবং তারপরেও সে চুপচাপ থাকে, তাতে তার প্রাপ্য অধিকার প্রত্যাহৃত হতে পারে না। কেননা চুপচাপ থাকায় যদিও বুঝা যায় যে, এ অবস্থায়ও সে তার স্বামীর সাথে থাকতে রাযী, কিন্তু এরূপ অবস্থায় যৌন প্রয়োজন অপূর্ণ থাকলে তাতে অরাযী থাকাটাই স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট। আর এই সুস্পষ্টতাই ইশারা-ইঙ্গিতের চেয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ ও জোরদার। কেননা তা থেকেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, সে অবস্থায় সে রাযী হতে পারে না।

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

যেখানে কঠোরতা ও কষ্ট, সেখানে সহজতা অবশ্যম্ভাবী।

এই মৌল নীতি কুরআন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াত থেকেই জানা যায়। সে সবক'টি আয়াত থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যেখানে লোকদের উপর অতিরিক্ত কষ্ট ও অসুবিধা আসবে, সেখানে তা দূর করা কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের প্রতি সহজতা বিধান করতে ইচ্ছুক, তিনি তাদের উপর কোন অসুবিধা ও কঠোরতা চাপাতে চান না-এই সংক্রান্ত আয়াত কুরআন মজীদের বহু স্থানে রয়েছে।

'কষ্ট' ও 'অসুবিধা' বলতে ফিকাহ্‌বিদদের ভাষায় নিছক কষ্ট ও অসুবিধাই বুঝায় না। কেননা শরীয়াতের কোন কাজই কষ্ট ছাড়া হয় না। বিনা কষ্টে কোন কাজই সম্পন্ন হয় না দুনিয়ায়। এখানে ইশারা হচ্ছে সেই অতিরিক্ত ও বাইরে থেকে চাপান কষ্ট ও অসুবিধা, যা লোকদের মনোবল সংকীর্ণ করে দেয়, চেষ্টা-সাধনা চালানোর পথকে করে অবরুদ্ধ। এ কারণেই শরীয়াতদাতা সেই অতিরিক্ত ও বাইরে থেকে চাপান কষ্ট ও অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং যাতে করে সহজতা বিধান হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে

www.amarboi.org

মানব মন বাড়তি অসুবিধার মধ্যেও কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না; বরং হয় উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত। বিদেশ যাত্রীর কসর নামাযের ও রোগীর জন্যে দুই নামায এক সময়ে পড়া ও ওযর দূর না হওয়া পর্যন্ত রোযা পালন বিলম্বিত করার ব্যবস্থা এই ধরনেরই সুবিধা দান বিশেষ। কোন কোন হারাম কাজ অ-হারাম বা মুবাহ্ করে দেয়া এবং প্রয়োজন ও অসুবিধার কালে তাতে রুখ্সত দেয়াও এ ধরনেরই ব্যবস্থা।

এই নিয়মমূলক বিধানের ভিত্তিতে ফিকাহ্র বহু সংখ্যক মাস্লা বের করা হয়েছে। এ পর্যায়ে যে কথাটি সচরাচর বলা হয়, তা হচ্ছেঃ

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও বৈধ করে দেয়।

عُمُوْمُ الْبَلْوٰى مَيْسَرَةٌ

অসুবিধা সাধারণ ও সর্বাত্মক হলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব নাপাকি থেকে দূরে থাকা সম্ভবই নয়, সেসব নাপাকি মাফ করে দেয়া এ মৌল নীতির ভিত্তিতেই হয়েছে। কোন কোন অষুধে হারাম জিনিস মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয় না এ কারণেই। কেননা তা সেবন না করলে রোগ সারে না বলে তা সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব নয়। গায়র-মুহাররম মেয়ে লোকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় না। কেননা এ মেয়েরা পথে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, বিভিন্ন স্থানে ও গৃহে এদের সমাবেশ হয়েই থাকে। তাই তাদের উপর উড়ো দৃষ্টি পড়লে গুনাহ হবে না বলে এরই ভিত্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আর একটি মূলনীতি হলঃ

اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

প্রয়োজন তার পরিমাণ অনুযায়ী পরিমিত হয়।

অর্থাৎ যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই করা যেতে পারে, তার বেশী নয়। যেমন রোগীর দেহের সে অংশ চিকিৎসককে দেখতে দেয়া, যা না দেখলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব নয়-জায়েয বলা হয়েছে। আর সাধারণ ও ব্যাপক বিপদ হিসেবে যে সব মেয়ে লোক না দেখে কোন উপায় থাকে না, তাদের দেখা জায়েয মনে করা হয়েছে। লালসা উদ্রেককারী মেলা-মেশা ও ঢলাঢলি বন্ধ করার জন্যে এই রূপ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র।

www.amarboi.org

এ পর্যায়ের আর একটি মৌল নীতি হচ্ছেঃ

اَلْاِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

একজনের অসুবিধা ও বাধ্যবাধকতা অন্য জনের অধিকার রহিত করে না।

এ ভিত্তিতে বলা হয়েছেঃ অন্য একজনের খাবার খেতে যদি কেউ বাধ্য হয়, তাহলে সে মূল্য দিতে সক্ষম হলে তাকে তা অবশ্যই দিতে হবে।

...এ সবই হচ্ছে ফিকাহ্‌শাস্ত্রে শরীয়াতের ফয়সালা গ্রহণের জন্যে ব্যবহৃত মৌলনীতি قَوَاعِد شَرْعِيَة । এগুলো বিচার-বিবেচনা করে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, এর কতকগুলো অন্য কতকগুলোর মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

www.amarboi.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়্যেবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'খেলাফতে রাশেদা', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)', 'আল্লাহর হক বান্দার হক' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও ইসলামে হালাল হারামের বিধান', 'মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গৃহীত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সুধীজন কর্তৃক প্রসংশিত এবং বহুল পঠিত।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)